অগ্নিসূত্র
দুলাল ঘোষ

অক্ষর পাবলিকেশনস্
কৃষ্ণনগর আগরতলা

agnisutra
a novel by dulal ghosh
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০০

প্রচ্ছদ ☐ ইমানুল হক
ISBN-81-86802-24-X
অক্ষর বিন্যাস ☐ কম্পিউট
অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে
কৃষ্ণনগর প্রধান সড়ক আগরতলা থেকে শুভব্রত দেব কর্তৃক প্রকাশিত এবং
অনিল লিথোগ্রাফিং কোং, কলকাতা – ১২ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত
মূল্য ☐ নব্বুই টাকা

উৎসর্গ

সহধর্মিণী পূরবী সহোদরা নিবেদিতা
আত্মজা দেবলীনা এবং
নন্দন দেবাঞ্জনকে

রচনাকাল ১৯৯২—১৯৯৬

জ্যোৎস্না নয়, রাতটা অন্ধকারই, তবু দু'একটা তাবা পড়ছিল। সাধারণত আগরতলা শহরের গাছেরা রাতেরবেলা উলঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার পাশে। একসময় শহর খুব ছোট ছিল, রাজবাড়ি আর বড়বড় রাস্তাঘাট। এখন মানুষ ও শহর উভয়েরই ইলাসটিসিটি বেড়েছে, রাতের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, ঘুমের জোর নেই। যারা জেগে আছে সবাই চোরকারবারি এমনও নয়, বাউল গাইতে গাইতে রিক্সাওয়ালা ফিরে যায়। আসলে রাতের রাস্তায় একলা দোকলা মানুষ—হাসি পায়। ভোস্ ভোস্ করে যায় যে গাড়িগুলি—ওদের ফলো করতে হবে।

সন্তোষবাবুদের পাশের বাড়িটা পাকাপোক্ত। দোতলাবাড়ি খালি পড়েছিল দীর্ঘ এগারো-বার বছর। জি বি বাজারমুখী রাস্তা থেকে স্পষ্ট কটা জানালা ভাঙা। মাঝখানে কেউ এসে চিড়ধরা বাকি কাঁচগুলিতে ফালি ফালি কাগজ জুড়ে দিয়েছিল। আরো একবার যাদের কাঁচের জানালা ছিল, আশির দাঙ্গারও প্রায় দশবছর আগের কথা, যুদ্ধের সময় বোমারু বিমানের ভয়ে। মানুষ বৃক্ষটি আসলে ঔষধি—তার জীবনগুণ আছে। মানুষ ঘরে থাকলে লোহায় জং ধরে না, ঝুল জমে না, চুন চামড়া খসে পড়ে না বাতাসে।

জগৎপুরের অনন্ত দেববর্মাদের বাড়িতে নতুন করে চুনকাম শুরু হয়েছে, প্রায় একযুগ পরে আবার ভাঙা জানালা সারাই। মান্দাই হত্যাকাণ্ডেরও অনেক পরে, এমনকি গ্রাম-পাহাড় ছেড়ে যে চাকুরিজীবীরা পালিয়ে গিয়েছিল—ওরা সবাই ফিরে গেলেও, অনন্তবাবু জগৎপুরের বাড়িতে আর আসেননি। একেবারে পড়োবাড়ি, জলজংলা, ঝোপঝাড় আর বাড়ি রাখালেরা বারো মাস ব্যাঙের চাষ করত।

আজ সবই পরিষ্কার হচ্ছে। বাঁশের মাচা লেগেছে চারদিকে, তোড়জোড়। মনে হয় কাঁচা চুনের গন্ধে প্যাঁচা চামচিকা আর বাদুর ভূতেরা—ঘরে ঢুকতে পারছে না কিছুতেই, বাড়িটার মাথার উপরেই ঘুরঘুর করছিল, উগ্রগন্ধ, ছোঁ মেরে নিচে নেমে এসেও ফিরে যেতে হচ্ছিল। এমন সময় একটা কমবয়সী প্যাঁচাই হবে,চক্রাকারে উড়ে উড়ে দূরে সরে সরে হঠাৎ-ই সন্তোষবাবুদের বাড়ি পার হয়ে—কোন্ অন্ধকার ডালিমের ডালে গিয়ে বসল? ওটা কার বাড়ি?

এক

দিব্যেন্দুবাবু অনেকদিন ধরেই ভাবেন—রাতের শব্দ কেন শুনতে পাই না ! আসলে একটা প্যাঁচা ডাকছিল । আজ ভাবছেন কানগুলি নিশ্চয়ই কমজোরী । যে পাশে শুয়েছিলেন আরো কিছুক্ষণ সেভাবে পড়ে থাকেন । অন্ধকার ঘর, একইঘরে তিনটে বিছানা । অতসী নাক ডাকায় । জুঁইয়ের সাড়াশব্দ নেই—মনে হয় ঝিম মেরে পড়ে রয়েছে । দিব্যেন্দুর চকির নিচে ঘরোয়া ব্যাঙ ডেকে ওঠে । অতসীর নাক ডাকা একবার বন্ধ হয়—জুঁই আগের মতই নাই । দিব্যেন্দু আস্তে আস্তে পাশ ফিরে—জোরে ফেরার উপায় আছে নাকি ! কোমরটা নড়তেই চায় না, তার উপর কোনরকমে কব্জি শুইয়ে রাখলেন তিনি । ডান হাতের চেটো রাখলেন গালের নিচে । আরেকটা কান খাড়া করে রাখলেন। রাতের শব্দ বলতে তিনি কি কথা কইতে চান ?

তার চারপাশে ধু-ধু মাঠ ও একটি নাবালক কাকতাড়ুয়া । অমাবস্যার অন্ধকারে একটার পর একটা ঢেউ এসে লাগে দিব্যার গায়ে । ক্ষেতের মাঝখানে আগে পিছে পুকুর—দুই পুকুরের মধ্যিখানে বাড়ি । পায়ে পায়ে আল ভেঙে গ্রামের রাস্তা পার হয়ে যায় । রাতের বিছানায় একটা হাত বা পা দিয়ে মায়ের শরীর ছুঁয়ে থাকতে পারলেই হলো । ঘুমিয়ে না থাকলে বা অন্যমনস্ক না হলে—ঠিকই শোনা যাবে ঝিঁঝিঁ, টিনের চালে টুপটুপ গোলাচি ফুল পড়ার শব্দ, পাতা পড়লে একটু গড়িয়ে খস শব্দ । গরমে কুত্তার জিহ্বার মত গাছের পাতা থেকেও টপটপ জল পড়ে । তক্ষকটা নিশি ডেকে উঠলে, মায়ের অভ্যস্ত হাত এসে পড়ে তার পিঠের উপর, বুকের খুব কাছে টেনে নেয় মা । ছাতে জালালি কবুতরের বাচ্চাগুলি কিচিরমিচির করে ওঠে, ডানা ঝাপটায় । ঘুমের মধ্যেও মা বিড়বিড় করে—শী পাইছে নাকি তোর ?

কোন শব্দ করে না দিব্য, উঠোনে তখন কাঁঠাল গাছের শুকনো পাতাগুলির ওপর দিয়ে কি যেন সর্ সর্ শব্দ করে — থেমে থেমে যাচ্ছিল । দিব্য মাকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়।

রাতের বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিব্যেন্দুবাবুর মনে হল—তিনি যে ইদানিং শুনতে পান না তার একটা প্রধান কারণ অঘুমা আর স্মৃতি । বুড়ো হলে ঘুম হয় না জানা কথা । কিন্তু স্মৃতিরা ইদানিং বিদেশী পাখির মত সাদা কালো আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, মনে হয়—আমার মাথাতেই সবকটা একসঙ্গে বসতে চাইছে । দিব্যেন্দুবাবু শিয়রের বালিশে মাথা বদল করেন । বর্ষার সময় আমাদের গ্রাম, দ্বীপান্তর । নৌকা এসে ডাঙায় লাগলে কি হবে—আবার একটু পিছিয়েও যায়, ছোট্ট দিব্যা নামি—নাবছি-করেও নামতে পারে না । সরাল্যা লালুর কথা মনে পড়ে—কিভাবে জলে ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকতো । রান্না ঘরের দাওয়ায় ডালিমগাছ, মটকায় জিওল মাছ আর উঠোনের শেষে শিয়ালের গর্ত ছিল, দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়তে দেখেছিল দিব্য ।

দিব্যেন্দুবাবুর মনে হয় এটা শারীরিক পরিবর্তনেরই লক্ষণ । ইদানিং বেশী শরীর খারাপ হয়েছে । রীতিমত চলাফেরা করতে পারেন না । সপ্তাহদিন নন্দীবাবুর বাড়িতেও বুড়োদের আড্ডায় যান না । অতসী এখন দুপুরের তরকারি জ্বাল দিয়ে রাতের ভাত বসিয়ে দিলে, তিনিও গিয়ে বসেন সন্ধ্যার পাকঘরে । অন্য ওভেনে চায়ের জল চাপিয়ে দেন অতসী । কথাবার্তা বল্লে বলেন, না বল্লে নাই । চুপচাপ বসে থাকেন দিব্যেন্দুবাবু, কুকার সিটি দেয়, ধোঁয়া উড়ে । ইদানিং সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় সব শেষ করে বিছানায় উঠে যান অতসী । জুঁই টিউশনি-ইন্সিওরেন্স সেরে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয় । নিজে সারা দিন-রাত জেগে বসে থাকলেও অতসীর ঘুম ভাঙাতে চান না দিব্যেন্দু, আসলে ঘুম তো নয়, ঘুমঘুম অষুধে ক্রিয়া । অনেকদিন ধরেই এপিলেপটিকের লক্ষণ, প্রথমে দুইবেলা দুইটা গার্ডিনেল দিয়েছিল, এখন মেজিটল ।

দিব্যেন্দু আস্তে আস্তে চিৎ হন । এতক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিলেন, এখন চেয়ে দেখেন এক চিলতে রাস্তার আলো ঘুলঘুলি দিয়ে এসে পড়েছে জুঁইয়ের বিছানায়, তার পায়ের কাছে । বেশী রাতে সব চুপচাপ হয়ে গেলে, কিছু সময় চোখ বুজে আবার চোখ খুললে বোঝা যায় এটুকু আলোরও কত মূল্য । এতদিন আলো ছিল না রাস্তায়, দিলেই ভেঙে ফেলে । চোর চোট্টায় ভরে

গেছে দেশটা, কিছু পথুয়া পোলাপানও। সেদিন পাড়ার সুকুমার একটাকে ধরে কষিয়ে দিয়েছিল, বেশ কাজও হয়েছে, কদিন ধরে দিব্যেন্দুবাবুদের ঘরে ডিমলাইট লাগে না। এতক্ষণ পরে মেয়েটা একবার পাশ ফিরলো, দিব্যেন্দু ডাকলেও, জুঁই কোনো উত্তর করল না। এই মাত্র কদিনে দেখতে দেখতে মেয়েটার চোয়াল কনুইয়ের হাড়গোড সব বেরিয়ে গেল। তবু শুধু শুধু মেজাজ খিটখিটে করে না, কথা বলে কম। ইদানিং একটা ড্যামকেয়ার ভাব লক্ষ্য করেন তিনি। বলার মত কিছু নয় অবশ্য। টিউশনি করে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। তিনি দু-একদিন এগিয়েও ছিলেন। দু-এক কথায় নিষেধ করেছে জুঁই। আস্তে আস্তেই বলে, তবু মনে হবে ঝামানুড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। সবচে' বড় কথা হল আজকাল ওর চোখে কোনো মানুষ লাগে না। বাস, টেম্পো ট্যাক্সিতে যেভাবে চলাফেরা করে, মনে হবে শরীর নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নাই। অর্থাৎ বিপজ্জনকভাবে জুঁইকে তিনি বাসে ট্যাক্সিতে দাঁড়িয়ে বসে থাকতে দেখেছেন। অতসীকেও বলেছেন। আজকাল আগরতলায় নারী নির্যাতনের ঘটনা আকছার ঘটে। ভয় ভয় করে দিব্যেন্দুবাবুর—পত্রিকা খুলে কোন্‌দিন কোন্ মুখ দেখবেন কে জানে! অতসীর কথার উত্তরে জুঁই যতবড় হাই তুলে, চুটকি মারতে মারতে বলেছে—দালালি করতে গেলে এমন কিছু হবেই। আরো অনেক কিছুই করতে হয়—শুধু ব্যবহারের খেলা—কে কাকে কিভাবে কতটুকু ব্যবহার করতে পারলো।

ঠিক তা নয়, দিব্যেন্দুবাবুর চিন্তার কারণ হল অন্য। মেয়েটা দিনকে দিন কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। মানুষ চোখে লাগে না। মাঝঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সব করে। কোনদিকে নজর নেই।

এখন ঘুলঘুলি দিয়ে তেরচা ত্রিশূল এসে পড়েছে জুঁইয়ের পায়ের কাছে, সেও চিৎ, এবার দুই পায়ের ফাঁকে। উরু পর্যন্ত এলোমেলো জুঁই। দিব্যেন্দুবাবুর গলাটা তারপর কে যেন দুইহাতে চেপে ধরল। তার এক জাতীয় অসুখের কথা তিনি কাউকে বলেননি। পরে শুনেছেন এরকম অনেকেরই হয়। মেয়েটিকে বেশী ভালবাসেন। ছেলেবেলায় চান-খাওয়া সবই তার হাতে ছিল। খুবই সতর্ক থাকতেন তিনি। অসতর্ক হাত ও চোখ ছুঁয়ে গেলে—আড়ালে নিজেকে কাটাচেরা করতেন খুব, মিথ্যে বলব না—কোনোদিনই দোষী মনে হয়নি। তবু কেন অকারণ সতর্ক সবসময়, আত্মবিশ্বাস বড় কম ভদ্রলোকের। এখনও দম বন্ধ হয়ে আসছে, তড়িঘড়ি উঠে বসেন, অঝোরে ঘামতে থাকেন।

এই প্রথম পাখার শব্দ তার কানে গেল। বিছানা লুঙ্গি সবই ভেজা। বার দুই গলা পরিষ্কারের চেষ্টা। অতসী ঘুমের সময় বেডপ্যান চকির নিচে রেখে দিয়ে যান। প্রস্রাবও পেয়েছে ঠিকই, নামতে সাহস পান না, মনে হল পা কাঁপবে, পা ভেঙেও পড়ে যেতে পারেন দিব্যেন্দু। তিনি বালিশ হাতড়ে কিছু বুঝে নিলেন, উল্টে দিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থাকার ফলে এখন ঘামের মধ্যে আলগা বাতাস ভালই লাগছিল তার, আবার আস্তে আস্তে মাথাটা—

এমন সময় হঠাৎ ভূ-ভূ চিৎকারে ঘরময় যেন ভূমিকম্প, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস—কি জানি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না দিব্যেন্দু, তারও বুক ধরফড়, সামলে রাখতে পারছেন না। সবকটা চকি খটাখট নড়ছে, ভূ-ভূ, ছাতে কবুতরগুলির কিচির মিচির, উঠোনে কাপড় শুকোনোর তার থেকে প্যাঁচা বা চামচিকা, হঠাৎ উড়ে গেলে ঘটাং ঘটাং, টাং টাং, ভূ-ভূ শানু শানু...।

অতসীকে গায়ের জোরেই ধাক্কা দিল জুঁই—কতদিন বলেছি বুকে হাত রেখে ঘুমোবে না! আর শোন—তোমার শানু পানু সবই মরে ভূত হয়ে গেছে।

মিনিটখানেক আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। লাগোয়া সন্তোষ বাবুদের পেণ্ডুলাম ঘড়ি তিনবার শব্দ করে উঠল। আলো জ্বেলে দিল জুঁই।

—কেউ কি বিশ্বাস করবে? সময় নেই গময় নেই এইভাবে, মুহূর্তে দক্ষযজ্ঞ ঘটে যায় আমাদের ঘরে। বুড়ি এই তো ক'দিনই আগে উনুনের মধ্যে পড়ে মাথার চুলগুলি পুড়ে ফেলল। মাছ কাটতে কাটতে বাসন মাজতে মাজতে মুখ থুবড়ে পড়ে, মরেও না, ডাক্তার বদ্যি করে দিব্যি

দাঁড়িয়ে যায়।

কী যে ধকল যায় মাঝে মাঝে ! তখন এই মরা মরা নৈঃশব্দ—গায়ে জ্বালা ধরে যায়। সে নামতে গেলেই আবার মশারি স্ট্যাণ্ড মট করে, সারা শরীরে শব্দ করতে থাকে—ঘটি বাটি ঝন্‌ঝন্‌ আছড়ে পড়ার শব্দ। রাতটাকে খানখান করেই চিৎকার করে উঠল—মরার জাত, মরেও না। দিনরাত হাড়মাস বিক্রি করি আমি, ঘরগুষ্টির পিণ্ডির জন্যেই তো! আবারো যে তৈরী হব — সে সুযোগটা পর্যন্ত দিতে চায় না ! এখন এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল—বুইড়ার মুখে কোনো শব্দ আছে নাকি দেখ !

হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত—শানু, শানুরে বাবা

—চুপ মার বুইড়া !

ব্যাস ! ঘরে এখন আর কারো নাক ডাকছে না, তেমন কষ্টও নেই মনে হয়। একসময় রাগ কমে গেলে তারও শরীর ঝুলে যায়—কতসময় আর ক্যাটক্যাট সম্ভব ! এখন ক্লান্তিতে ভাঙা মশারি স্ট্যাণ্ডটা দেখে, গা-ঝাড়া দিয়ে আবার স্ট্যাণ্ডের দড়িটা খোলে একটানেই, পেটিকোটের রশিও খুলে নেয়, গিট দেয় একটা, উপরের শাড়িটা তার ঠিকই রইল শুধু সায়া ভেঙে পড়ে গেল ঝুরঝুর করে। তারপর ক্যালেণ্ডার খুঁজে খুঁজে মশারির রশি বেধে দিল এক জায়গায়। হাই তুললো জুঁই। দড়ি থেকে গামছা টান দিয়ে পিঠে ফেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

দুটো ঘর। ডাইনিং স্পেস, সঙ্গে লেট্রিন বাথরুম কিচেন। দাদা না থাকলে সামনের ঘরটাতেই জুঁই থাকে। কদিন ধরে মায়ের অসুখ বেড়ে গেলে বিছানা বদল করেছে। বাথরুম সেরে এসে শাওয়ারের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কি ভেবে !

—আমাদের পরিবারে যতসব অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। দাদা বাবা দুজনেই একরকম— যতখুশি ভালোবাসো, আর স্বাধীনতা নয়। বাবা বলতো—দিনকাল ভাল হলে তোকে শানুর মত ছেড়ে দেব, চড়ে খাস। আর দাদা হল গিয়ে রীতিমত পেতি। নলিনী উকিলের নাতি আমাদের সঙ্গেই পড়ত, একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে একটা চুমু খেল আমাকে। মজা করে দুই টাকার চানাচুরও খেলাম আমরা। কিন্তু কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে দাদা আচমকা আড়াল থেকে ছেলেটার একটা হাত কামড়ে দিয়েছিল, আমার সঙ্গেও কথা বলেনি অনেকদিন, তখনই কাঁদতে শিখলাম।

একটু আগে কোমরের ল্যাগাম ছাড়া অন্তর্বাস যেভাবে ঘনতরল ভাঁজ ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল, ঠিক সেভাবে এখন বুকের আঁচল সেফ্‌টিপিন ইত্যাদি পটাপট খুলে গেল নিমেষে। আর একবার আড়মোড়া ভাঙলো জুঁই—হাতের কাছে চলে এলো সবই, দুই আঙুলে চিমটে ধরে নিচে ফেলে দিল। চিন্তাগুলিকে আরো একবার টুকরো টুকরো করে ভাঙলো। শাওয়ারের জলকুচি উড়তে লাগলো ঘরময়। দিনের বেলা এরকম হলে রামধনু রঙ খুঁজতাম। রোদ পড়ে বৃষ্টিও, হাততালি দিয়ে নাচতাম—শিয়াল মামার বিয়া—

একটা জিনিস খুবই মজা ল্যাগে তার— ছেলেরাও মানুষ, মেয়েরাও, তবু বাঘ আর বাঘের মাসি তো এক নয়। আরেকদল পাগল নাকি মিসিং লিংক খুঁজে খুঁজে মরছে, মরুক গিয়ে।

প্রথম যে পৌষসংক্রান্তির ভেড়াভেড়ি ঘরে রতুদার সঙ্গে সঙ্গম করল জুঁই, পিঠাগুলিকে খুবই মিষ্টি মনে হয়েছিল তার। মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে এমন, ভাল মনেই নিয়েছিল সে। পরে শুনেছিল খারাপ মেয়েরা এরকম করে আর টাকাপয়সার জন্যে নষ্ট মেয়েরা। একটু ভয়ও পেয়েছিল।

হঠাৎ মনে হল আমি কি ডুবে যাচ্ছি এখন ? পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত জলে ভার। জল যাওয়ার প্যাসেজটা নোংরা জমে জমে বন্ধ। সে নুয়ে, শলার ঝাড়ু একটা ভাঙতে ভাঙতে আর নাই, হাতলটাই আছে শুধু, খুঁচিয়ে দিলেও জল সরে না, তার পিঠের ওপর তিরতির করে পড়ছিল।

আরেকদিন বর্ষার কুশিয়ারা, আমি আর দাদা পায়ের পাতা-পানি জলে-ডাঙায় দাঁড়িয়ে ছিলাম

হাত ধরাধরি করে। করিমগঞ্জের স্টিমারঘাট নাম করা। বড় বড় জাহাজ, অনবরত মাল খালাস চলছে, ক্যাপ্টেন সাহেব মেমরাও মাঝে মাঝে নেমে আসতো ডাঙায়। বর্ষার কুশিয়ারা নদী—এপার থেকে ওপার তিরিমিরি করে। আর একটা শুশুক খেলা করছিল—ডুবছিল, ভাসছিল, সঙ্গে নাবিকদের পোষা উদ্—একটা না একটা মাছ মুখে করে—ভুস্। জলের পিঠে—পিঠে রাজহাঁস, উপরে গাঙচিলের ওড়াওড়ি। সূর্যাস্তবেলা। আর আমাদের বড় আকর্ষণ ছিল—গুদামঘর থেকে ক্রমশ ঠেলাগাড়িতে বোঝাই বস্তাগুলি। একটা না একটা ছেঁড়া থাকতই—খেজুর, বাদাম আর একরকমের চর্বি—দুই হাতে নারকেল নাড়ুর মত গোল করে নিলেই হল। তারপর ছুঁড়ে দাও, রবারের বলের চেয়েও বেশী—স্বর্গের কাছাকাছি লাফায়, হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, দেখতে দেখতে আকাশে ওঠে রামধনু। আমি আর দাদা হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছিলাম—শিয়ালমামার বিয়া-রে, শিয়ালমামার বিয়া। কুলিদের সর্দার রাম ইকবাল কোন্ ফাঁকে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—উ দেখ বেটিয়া,সাহেব তুমাদের ডাকছে। আমরা যাইনি, সাহেবের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম, দাদাই প্রথমে দৌড় দিল, হাতে চর্বির বল।

এক দুই করে পর পর পাঁচবার হাঁচি দিলে তার জ্ঞান ফিরল—জ্বর আসবে। শাওয়ারের নিচ থেকে সরে আসে সে, ট্যাপ্‌টা বন্ধ করে দেয়, জল বন্ধ হয়ে তখনও ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। গামছা দিয়ে চুল মুছতে মুছতে জুঁই খেদ করে—এখানে রেলগাড়ি স্টিমার কিচ্ছু নেই। এই বাঙ্গালী আর সেই বাঙ্গালী এক নয়—একদল বসত করেছে অনেকদিন হয়, আরেকদল এখনও উদ্বাস্তু।

শীত-শীত করে তার, গায়ে কাঁটা, এবং একটা গামছা ছাড়া শুকনো কিছু নেই, ভেজা কাপড়-চোপড়গুলি আর জড়াতে ইচ্ছে করছে না। বুকদুটো এখনও যথেষ্ট টান-টান। পাছায় হাত দিলে টোল পড়ে। শশাঙ্কের সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালই লাগে তার। শশাঙ্ক এল আই সির ডেভেলপমেন্ট অফিসার। ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছে তার সঙ্গে —প্রতি দশটা কেস এনে দিলে একবার, জুঁই হাসে, শশাঙ্কের বড় দুঃখ তার বউয়ের শরীরে নাকি ভাঁজ পড়ে না!

আবার নাক ডাকার শব্দ শুনে নড়েচড়ে ওঠে জুঁই। পাঁচ-হাতি গামছাটাই এখন কোমরে প্যাঁচ দেয়। বাথরুমের বাতি নেবায়, জলপাতা পায়ে লক্ষ্মীর মত ঘরে ঢোকে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তার পেছনে এখন কোন পুরুষমানুষ নেই। মা-বাবা দুজনেরই নাক ডাকছিল। জুঁই প্রথমে গামছাটা খোলে, আলনা থেকে ব্লাউজ পেটিকোট খোঁজে। ভেজা চুলের জংলায় জড়িয়ে কিছু জল এখন পিঠ বেয়ে নীচে নেমে যায়।

আবার কোমর থেকে নেমে যাচ্ছিল যে ধারাগুলি—ওরা কি করল—জুঁইয়ের পায়ের মাপে জলছাপ দিল মেঝেতে।

একবার একটি জলপ্রপাত থেকে নীচে শুধু কুয়াশা দেখছিল জুঁই। বেশ ভারি ভারি সাদা মেঘের দল। আকাশের দেয়াল ধরে ক্রমশ উপরে উঠে গেলে বলতে হবে কুয়াশা। তার নীচে কোন নদী কী তখন জিওলমাছের মত কুরুৎ কুরুৎ শব্দ করেছিল? — কিছুইতো মনে নেই।

সেই প্রথম সেই শেষ তাদের ভারতদর্শন। সমুদ্রের চেয়ে আকাশ আর হিমালয় বেশি ভাল লেগেছিল তার। দাদার সমুদ্র। বড়ই দার্শনিক হয়ে পড়েছিল দাদা—মনে হয়েছিল চোখে চশমা আছে যেন গোল গোল। মাকে বলেছিল—দেখ, আমরা কত ছোট। অথচ দাদাটাকে তখন মস্ত মনে হয়েছিল আমার। কান্নাও পেয়েছিল কেন জানি। তাই শূন্যতা ভাল লাগেনা, স্যরি—সমুদ্র ভাল লাগেনা আমার।

পাহাড়ই তাকে টানে বেশি। চূড়ায় উঠতে ইচ্ছে করে খুব। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের মাঝখানে ডিসটেন্ট ভিউ দেখে। সেবার গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখও যেতে চেয়েছিল জুঁই, জেদ ধরেছিল, বাবা রাজি হয়নি—মেয়েদের অত সাহস ভাল না।

সত্যিই অবশ্য, ধস নেমেছিল। তাই সেও আর পীড়াপিড়ি করেনি, তবে মুসড়ে পড়েছিল

ভিতরে ভিতরে। জুঁইয়ের একটা যুক্তি আছে এমন যে — আমাদের আছেটা কি? পাকিস্তানী রিফিউজি, জমিজমা ইত্যাদি বসতবাটীর গল্প, বংশ ধোয়া তুলসিপাতা, সরাইল্যা লালু আর ডরাইল্যা বাপ্‌ঠাকুরদা ছাড়া—আর কি আছে ? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও এদের কোন ভূমিকা, বিশ্বাস করে না জুঁই । আবার গান্ধীবাদী খদ্দর টুপি পরে, হাসি পায়। যাই হউক ওরা কিন্তু বাবার টাকায় বেড়াতে বেরিয়েছিল। ফ্রিডম ফাইটার পেনসনের এরিয়ার ।

আমাদের বাবা কোনদিনও চাকরি বাকরি করেননি। পরাধীনতার প্রতি ঘৃণা তীব্র।রিফিউজি ক্যাম্প থেকেও পালিয়ে আসতে আসতে মাকে বলেছিল—তোমরা কোনো চিন্তা করো না, দেখবে গ্রামেগঞ্জে গিয়ে, না হয় পাটাপুতা খোদাই করে কত রোজগার করি! যদিও কিছুই করেননি তিনি । শুনেছি মাঝে মাঝে পাকিস্তানে চলে যেতো বাবা। ওখানে বাড়িঘর জায়গা-জমি, কিসব জানি বিক্রি করে উদয় হতো হঠাৎ হঠাৎ। আর ইণ্ডিয়াতে স্বাধীন ব্যবসার নামে শুধু রাজনীতি করুয়াদের সাথেই সারাদিন আড্ডা দিত।

জুঁই, তুমি বল, সেবার গঙ্গোত্রী থেকে হঠাৎ গোমুখ যেতে চেয়েছিল কেন?

—সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সাফ্ কথা ভাই —আমি দেখতে বিশ্রী তাই। গরীবের মেয়ে। শুধু শরীরটাই সম্বল মনে হলে—মাথা দপ্ দপ্ করত।

তবে ইদানিং আর কথায় কথায় কান্না পায় না। বরং আগের কথা মনে হলে বিদ্রূপ করে জুঁই — তখন কত বোকা ছিলাম ! কাবেরীর দাদা একদিন একটা ফাঁকা রাস্তায়—তার হাতে হাত ছুঁইয়ে দিয়েছিল, বলেছিল—জুঁই, তুমি বড় সুন্দর দেখতে ! সেদিনও কেঁদেছিলাম আমি, বোকামি ছাড়া আর কি —ভালো হলেও কাঁদো, বুরা হলেও কাঁদো।

অবশ্য এখন আর তেমন নেই । এইবার সে চুলের ডগাগুলিকে মুঠো করে চিপে গামছা দিয়ে মোছে। তারপর নিজেই পেছন দিকে ধনুকের মত বেঁকে যায়, যেন মাকু বাঁশ চুলে গামছায় ফটাস ফটাস শব্দ করে। মিহিদানার চেয়েও মিহি জল কণা ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়। ম ম গন্ধ করে কেয়োকার্পিনের।

ইদানিং অনেকেই দেখেছে—জুঁই আপন মনে কথা বলে বা ভাবে। আসলে এখন সে তাব দিদির সঙ্গে কথা বলছিল । প্রায় তারই মত লম্বা চওড়া মেয়ে,তারই পাশে বিছানায় শুয়েছিল কোলবালিশের মত—ঠিক তারই মত । দিদি অবশ্য মাঝে মাঝে চুলগুলিকে কাঁচি কেটে বাট্রি কবে ফেলে না, হাতকাটা ব্লাউজ পরে না , আর পূজা করার সময় চাবির আঁচল গলায় পেঁচিয়ে রাখে সবসময়। দিদির কথা প্রায়ই ভুলে যায় সবাই।

—এ্যাই দিদি, তোর আমার চাকরীর কথা কেউ ভাবে না—দেখেছিস?

—না ভাবলে নাই, মেয়েদের অত কিরে?

—ওরে আমার হলদে বুক শিউলি, এজন্যেই তো ঝরে গেলিরে!

—জুঁই, তুই তো জানিস বোন, আমি কোনদিন পড়াশুনা করিনি, তুই চাকরি কর, আমি বরং ইয়ে—

প্রায় একই সঙ্গে হেসে উঠল দুইজনে। এখন তো বামফ্রন্ট সরকার—বুঝলি? সংগ্রামের হাতিয়ার। দাদাকে বলনা—পঙ্কজদা না কি যেন নাম, তোর আমার দুইয়েরই কিছু একটা হতে পারে, আলাদা আলাদাভাবে।

আর হাসে না জুঁই। তাকে খুবই চিন্তিত দেখায় এখন, গামছার খুঁট কাটে এমনভাবে, কুট্ কুট্ শব্দ করে—

—জানিস না তো রে দিদি, আজকাল দুই নম্বরি না করলে আর চাকরি বাকরি পায় না কেউ।

—করাকরি জিনিসটা কি?

—সমিতি টমিতি আর কি !

আরো একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। শিউলি আসলে কেউ নয়। জুঁই মায়ের কাছে শুনেছে — তারা দুইবোন জন্মেছিল একসাথে। দিদি আগে মরা পরে সে জিতা। ধাইমা মাকে বলেছিল— দিদি একেবারেই খেতে পায়নি। তাহলে কি প্রমাণ হলো—জুঁই কি রাক্ষুসী নয়? ক্রমে ক্রমে সবই শুষে নিতে পারে সে— আরেকটি জীবনও।

সেদিন থেকে শিউলীর সাথে ফাঁক পেলেই কথা বলে জুঁই। শিউলী নামটাও তার দেয়া। মা এসবের কিছু জানে না।

আমাদের পরিবারটাও যে একদিন এভাবে ডেজারটেড হবে—ভাবতেই পারেনি আদরী- জুঁইয়েরই আরেক নাম, ছোটমামা রেখেছিল। বাবার-ই বা তেমন কি বয়েস হল—তাই নারে দিদি? একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। আসলে শরীর ও মন—দুইখানেই বাবার বড় আলস্য, নেই কাজ তো দুঃশ্চিন্তা ভাজো।

তবে মা ঠিক ছিল। এখন মৃগীরোগটাই কেবল বাদ সাধলো আমাদের। প্রকোপ খুব বেড়ে গেছে। আরো একটা কারণ আছে অবশ্য—মায়ের কথা হল—ঘর নষ্ট, ডট ডট ডট।

তারপর দাঙ্গায় দাঙ্গায় আমরা উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরা যেন কচুরিপানার মত—শিকড় আছে অথচ মাটি ছুঁতে পারি না। তার কিছু উল্টোপাল্টা ধারণাও আছে-কচুরিপানারা নাকি অন্ধকার পুকুরে হাঁটাহাঁটি করে যেভাবে অভুক্ত অতৃপ্ত কিছু আত্মা আগরতলার ডাষ্টবিনগুলি খুটে খুটে খায়!

ত্রিপুরায় নদীনালা বলতে উল্লেখ করার কিছু নেই। এখানে না আছে শস্যশ্যামলা পলিভূমি না আছে ভাঙাগড়ার খেলা।যদিও আজকের ত্রিপুরা খণ্ডিত — একদিন সবই ছিল তার — সমতল পাহাড় সবই। আর এখন পাহাড় থেকে ক্রমাগত নেমে আসে যে বৃষ্টির ঢল, মাঝে মাঝে রক্তলাল বৃষ্টির কথাও আমরা শুনেছি।

আদিবাসীরা কিন্তু জল ধরে রাখতে পারেনি শরীরে। জুমের চল এখন প্রায় উঠে গেছে। জঙ্গল ফাঁকা করে দিয়েছে চোরাকারবারিরা।

সমতল বলতে আমরা নদী-নালা জমি-জমা আর মেঘবৃষ্টি বুঝি। তারপর উদ্বাস্তুরা এসে ত্রিপুরার যৎসামান্য সমতল দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু মজার কথা হল - কোনদিন কারো মুখ দেখে কোথাও বিরোধের ভূত ধরতে পারেনি জুঁই। শুধুই পোড়া বারুদের গন্ধ পায় ইদানিং রাস্তায় ঘাটে হাঁটলে।

বাবা বলে — পাপ করেছি, প্রায়শ্চিত্ত তোদেরও ভুগতে হবে।

—আমি জুঁই সেনগুপ্ত, আমি এই কথাগুলো মানিনা। আমরা মৃত্যুভয়ে উদ্বাস্তু হয়েছি- কি পাপ করেছি? — দুষ্ট রাজনীতির শিকার। উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরা যেখানে যেখানে গেছে, পাপও করেছে, অন্যের অনিষ্ট, এজন্য যতটুকু প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত — ব্যাস ততটুকুই। তবে অস্তিত্ব নিয়ে কোন কথাই শুনতে চায়না জুঁই।

এখানে যেকোন কাজেই সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট লাগে। তুই তো বেঁচে গেছিসরে দিদি- আমাদের আসাম কাছাড়ে এসবের চল্ ছিল না — মনে আছে? দাদা আর আমি বাই-বার্থ ভারতীয় নাগরিক। আমাদের পরিবারও প্রায় পঞ্চাশ বছর ইণ্ডিয়ায় এসেছে। মা বাবারা আবার জন্ম নিয়েছিল অখণ্ড ভারতবর্ষে। আমরা কি এই দেশটিকে ভাগ করেছি নাকি? আমাদেরে দাঙ্গাপীড়িত জাতি বললেই বোধহয় ঠিক হবে। পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে আসাম মণিপুর মেঘালয় মিজোরাম থেকে—

—কি ?

—বিতাড়িত হয়েছি।

—তাহলে ?

— ভয়ের কিছু নেই। এখন এখানেই থাকব।

দূর ছাই, কই থেকে কই চলে এসেছি আমি! সেই এল-আই-সির শশাঙ্ক থেকে এই পোড়ামুখ

ভারতবর্ষে ! একটু জোরেই শব্দ করে হেসে ফেলে, সঙ্গে ফেৎ করে কিছু সর্দিও এসে পড়ে ঠোঁটের কাছে। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে জুঁই। ভিজা গামছায় প্রায় চামড়া তুলে ফেলে ঘলছে এখন।

শরীরে কাপড়চোপড় জড়িয়ে নেয়ার আগে কি যেন সে দেখলো — কি দেখলো ? চামচিকা না ? বাবার মশারীর ছাদ, পাখা, মা'র মশারী হয়ে জানালা খুলতে খুলতে — এখন আর কে দেখতে আসবে, তবু সুইচ অফ করে দিল সে। অন্ধকার রঙের একটুকরো তুলতুলে বাতাস চলে গেল কানের পাশ দিয়ে। সুইচ অন করল, আবার অফ করল, জানালা বন্ধ করল, ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই।

আলো জ্বেলে দিল আবার । কলপ দেয়া শাড়ি প্যাচ দিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। এখন আর জড়ুলটা দেখা যাচ্ছে না। টুল টেনে বসল। পিঠে পিলপিলে, বুকের মাঝে, বগলতলায় নাইসিল দিল থপথপ করে। কিন্তু নাইসিলের সঙ্গে অন্য পাউডার না মিশালে চামড়া পুড়ে যায় !

নাঃ, এবার সে উঠে গিয়ে, ঘুমের মধ্যেই ভেজা গামছা দিয়ে মায়ের চোখমুখ ঘাড় গলা ঘসে দিল।

—ইস্ ইস্‌রে।

— না ওঠো, অত আরাম না, সবার ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে নিজে নাক ডাকাচ্ছ !

— এখন কটা বাজলো লো জুঁই ? দুইচোখ বন্ধ রেখেই, যেন বহুদূর থেকে কথা বললেন দিব্যেন্দুবাবু।

জুঁই নু'য়ে, বালিশের তলাতেই হাতটা রেখে রিস্টওয়াচ দেখলো — সোনালী আরেক শশাঙ্ক, — প্রায় চারটে বাজে গো বাবা। আবার আয়নায় ফিরে যায়, তার খুব কাছে মুখ, টিপ্পনি কাটার মত সে ঠোঁটে ক্রিম লাগিয়ে দিল, একটু খসখসে। শয়তান এতগুলো জানলা দিয়েছে ঘরে, অথচ পর্দা কিনতে পারেনি ! মা পুরনো শাড়ি কেটে কেটে বিচিত্র ছবি ধরিয়েছে ঘরের ।

পূবমুখী দরজা। তিনটা মশারী টাঙ্গানো অবস্থায় এই ঘরের আর কোন চিত্রকল্প নাই। দুই চকির চিপায় পড়েছে আলনা। ড্রেসিং-টেবিলটা দিব্যেন্দুর করা।এখন তিনটা চকির নীচই একেকটি পূর্ব পাকিস্তান। হবিগঞ্জের হাট থেকে শাশুড়ির পিঁড়ি, সাস্তাগঞ্জের বেলুনচাকি ইত্যাদি। জুঁই আরেকটা কথা খুব শুনেছে —বাইন্যাচঙের কচু ।

দাঙ্গার মুখে নাকি বাবা — সবই ছেড়ে ছুড়ে আসতে চেয়েছিল, মা রাজি হয়নি। বলতে গেলে মা'ইতো কুলিগিরি করে মাথায় বগলে করে, খানে খানে, অবশেষে আগরতলায়— বিষয়সম্পত্তি যা কিছু আছে — সবই দাদার কাছে নিয়ে এসেছে মা, তার বংশের ডেটু।

পায়ের নীচে এখন দুই দানা বালুও টের পেল জুঁই । শোবার আগে রোজই পাপোষে ভালো করে পা মোছে। এবার বিছানায় বসে বসেই সে হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রথমে গিট্টু গিট্টু রশিতে গামছা রেখে—টেনে টেনে কষ্ট করে মেলে দিল । তারপর সুইচ বোর্ডের দিকে যেতে চাইলেই গলা খেকাড়ি দিলেন দিব্যেন্দু — দাঁড়া, আমি বাইরে যাবো।

নামতে নামতেও দুবার ঢেঁকুর দিলেন তিনি — সবই অম্বল হয়ে যায় — বুঝলি, ডাক্তার বিশ্বাস বড় বেশী কথা বলে, অষুধ দেয় না ব্যাঙ। কত রাত যে ঘুমান না দিব্যেন্দু ! এই রাত জাগা বন্ধ না হলে- বুঝতে পারছেন তিনি, উপসর্গগুলি শুরু হয়ে গেছে নাকি?

তাই আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে ধরে বাথরুমে ঢুকে গেলেন —ঢুকেই বমির মত ঢেঁকুর দিলেন আরো কয়েকটা, সবই ফাঁকা, মনে করেছিলেন—আস্ত ভাত দু'একটা আসবে, কিন্তু কিছুই না, কার্মোজাইমেও কোন কাজ হচ্ছে না, দয়াল দীনবন্ধু হে !

—মা ওমা !

—কি ? চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ?

— না ওঠো বাথরুম করে এসোগে যাও। ততক্ষণে দিব্যেন্দু এসে বিছানায় বসেছেন, হাঁপাচ্ছেন ছোট ছোট করে। আস্তে আস্তে ভেজা পা মুছলেন গামছা দিয়ে।

বাবার গামছা সবসময়ই ভেজা থাকে। কিন্তু চিপলেও জল পড়ে না, কেমন জানি একটা শুকনো শুকনো ভেজা।

— আচ্ছা বাবা, মাছের রান্না ভাজাটা আজ কেমন লেগেছিল ?

— ভালইতো মা।

— বলো না কার রান্না ভালো ?

দিব্যেন্দুবাবু হাসলেন, মিনিমাছের রসাভাজা !

— বাঃ। সামান্য লবণ বেশী হয়েছিল—মাখা মাখা তো !

— তুমি ভীষণ মায়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলো বাবা !

দিব্যেন্দুবাবুও হা হা করে হেসে উঠলেন।

তিনি শব্দ করে হাসতে থাকলে এখন অন্যরা তার প্রতি লক্ষ্য রাখে। বাথরুমে অতসীর হাত থেকে মগ পড়ার শব্দ হয়। ফলে আরো জোরে জোরে হাসতে লাগলেন তিনি। —আমার অভিমানী মেয়েটা কি বলে রে — হ্যাঁ —

— এ্যাই কি হচ্ছে এসব? বাপ মেয়ে মিলে কি পাড়া এক করবি নাকি তোরা ? ক'টা বাজে?

তারপর মা চকির নিচ থেকে পানের বাটা নিয়ে বসল। তার হাতে শর্তার কুট্‌কুট্‌ শুনতে খুব ভাললাগে—আমাকেও এক টুকরো সুপুরী দিও মা।

— আচ্ছা। এবার একটা আস্ত সুপারী আধখান করার শব্দ হল। তারপর উল্টেপাল্টে সেগুলোকে কয়েক টুকরো করলেন অতসী, এক টুকরো দিলেন জুঁইকে, বাকীটা বাটায় রেখে দিলেন। — বুঝলি জুঁই, বুড়া পক্ষটক্ষ নেয় না করো। হদ্দ নিন্দুক ।

অতসী বিড়ালের মতই এখন পাপোষে পা ঘষটে ঘষটে বিছানায় উঠে গেলেন। হাত বাড়িয়ে নিবিয়ে দিলেন আলোটা।

আবার আগের মতই অন্ধকার। ঘুলঘুলির আলো এসে পড়েছে সময়মত, জায়গামত। এখনও শব্দ করে দাঁতে দাঁতে সুপারী ভাঙতে পারেন তিনি।

— সেবার কি হয়েছিল শোন্। আমরা তো ভিটেমাটি পালিয়ে লাতু বর্ডার দিয়েই ইণ্ডিয়ায় ঢুকেছি। তার আগে সোনা গয়নাগুলি নেকড়া পেচিয়ে ঐরকম করে বেঁধে রেখেছিলাম। বর্ডারে আমাকে চেক করার নামে আরেক ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল । আর বুইড়া বেটার তখন কান্দা দেখে কে। শানুটাও পেটে। আমি মরি আমার দুঃখে, হাসি না কাঁদি বল !

— তারপর একটা ধাঁধাঁ, বুড়া বেটা কেন কেঁদেছিল—বলতে পারো আমার বাপ-সোহাগী মেয়ে ?

— কেন আবার, কে না কে কি না কি ?

— ছাই বুঝেছিস! নে নে ঘুমা। তোরা সবকটা বেইমান।

অতসী দুচোখ বন্ধ করেই বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখলেন — দেশলাই।আজ দুবারই শোবার সময় চকির নিচ ভালো করে দেখা হয়নি। হঠাৎ হঠাৎ কেন জানি দেশ বাড়ির কথা, দ্বিতীয়বার বিয়ে করা বাবার মতই তারে দন্ধায়। জ্বালা জ্বালা করে বুকের ভিতর। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মনতলা আর বীরপাসা। বড়বাড়ির মেজো অতসী। কেন হু হু করে উঠে, অবনী মাষ্টারের ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী চোখগুলি বুঝি বা নদীর জলও হতে পারে, টল টল। কয়টা পানসি ঢেউয়ের পিঠে ভর করে কেউ কি গান করতে পারে বানভাসি? গাছতলায় পাকা আম কাঁঠালের গন্ধ, ডুবি লুকিলুকি পড়ে থাকে এমনি এমনি। এমনকি সাদা বকও উড়ে এসে একটি মৃত্তিঙগা বাঁশের মাথায় বসলে তার রঙ গুড়ের মত লাল হয়। আর আমাদের গ্রাম পাহারাওয়ালা ছিল মধ্যিখানে একটি পাঠশালার কঙ্কাল। বর্ষায় আবার পয় পুরুষের মত সতর্ক থাকতে হতো সবসময়। নদীর জল দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। রাতেই ডাকাডাকি করে বেশী। মাঝে মাঝে ঝুপ করে শব্দ হয় বা মনে হয় কেউ ঝাঁপ দিল। কনক দিদি এই বানের জলেই ডুবে মরেছিল।

তখন আমার বিদেশ বলতে প্রথমবার শ্বশুড়বাড়ি। ওরা সিলেটি। ভিন্ন ভাষা, ভাব ভঙ্গি আচার বিচার। ভিন্ন ভিন্ন রুচির তরকারি। তবু কোনো অসুবিধে হয়নি। শ্বশুড় ভাসুর গোষ্ঠীগাড়া তখন কেউ ছিল না গ্রামে। এক এক করে সবাই ইণ্ডিয়ায় চলে গেছে। মুসলমানদের কথা বাদ দিলে — আরো ছিল নিম্নর প্রজা। অনেকদিন ধরেই কোন কথা শোনে না — এমন কি আমার বিয়ার পালকি পর্যন্ত বইতে চায়নি ওরা।

তখনই তো বোঝা উচিত ছিল — দিনকাল ভালো না — বদলে গেছে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। কিন্তু ঘরের লোক কেন জানি মন স্থির করে উঠতে পারেনি। বাউণ্ডুলে স্বভাবের । সকাল সকাল সখের পান্তা খেয়ে সেই যে বাইরম বাইরম—আর কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। এদিকে বাড়িটা ভাঙছে, দাসদাসীও এখন প্রায় নাই বল্লেই চলে । আর আছে তিনটে পুকুর। আমি মাঝেরটায় নাইতাম -আহা, কি মজা ! সেমিজ সায়া ব্লাউজ খুলে ডুবে ডুবে সাতার। একদিন পাড়ে এসে শরীর শুকাচ্ছি হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার গরম শ্বাস পড়ল—হে কৃষ্ণ! বগবগা রসুনের গন্ধ । আর আমি পেছন ফিরে তাকাইনি। পরেরদিনই ভোরে ইণ্ডিয়ায় চলে এসেছি।

তখন থেকেই বেগু আর বেন্দার কথা ভুলে গেছেন তিনি। এখন সব ছিটকিনি । তবু শুয়ে পড়ার আগে ঘুমরাতে চকির নীচগুলি ভালো করে দেখে যান। আজকাল চোরেরাও শুনেছি - পাশ করা থাকে।

হঠাৎ পেট পোড়ায় অতসীর । আলগা লবণ, লঙ্কাপোড়া ইত্যাদি সবই ছাড়তে হবে তার। কোনো কোনো সময় মনে হয় — তিনি কি কেবলি দুঃখ ভুলে থাকার জন্য এত কষ্ট করেন? বেলায় বেলায় একই হাতাবাটি উল্টে কার উপরে জিদ মিটান অতসী? আবার কেঁদে ফেলেন। না না এসবই তো আমার —

আসলে ইদানিং তার অল্লেতেই বায়ু চড়ে যায়। বুড়ার সঙ্গে কথায় কথায় , চুপচাপ থাকলেও এমন হয়। তখন শুধু ভুলের পরে ভুল হতে থাকে।

অতসী সবে শুয়েছেন, এখন আর তার একদমই নামতে ইচ্ছে করছে না। সারাদিনের টানা হেচড়ার পরে শোয়া। কাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আলগা হয়ে পড়ে। সবাই ঘুমায়। আর নিজেকে জড়ো করতে পারেন না, ইচ্ছার জন্ম হয় না কোন, তাছাড়া কদিন ধরে বড় দুর্বল।

ঘুমের মধ্যেও এখন কি জানি হাতড়ে হাতড়ে আঁচল খুঁজে বের করে আনলেন অতসী। মেয়েরা সত্যি সত্যি কি চায়—স্বস্তি, স্বীকৃতি আর সম্মান।

আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন — তিনি জানেন না। আবার শাড়ির আঁচল সূচের মত করে প্যাচাতে প্যাচাতে, আবার নাকের ভেতর রোমশ দেয়াল ছুঁয়ে দিলে—এক দুই করে কম করেও দশটা হাঁচি দিলেন তিনি—বাঃ বেশ হালকা লাগছে এখন। শানুর জন্মের সময় প্রথম ফিটের অসুখ করেছিল তার এক্লেমশিয়া, আরে আরে ! এখন আবার স্মিথ সাহেবের কথা মনে পড়ছে কেন ! তার হুবহু সেই কোমরে হাত, আর পালের বর্গা ধরে জুরিন্দায়, থাক্ বাবা পরে ভাবা যাবে! তবু উঁচু কপালের মত টুপির নীচে কুতকুতে চোখগুলি একবার দেখে নিলেন অতসী। তখন বাপের বাড়িতে তিনি নাইওর করেন। কোমরে বেল্ট, গোড়ালির কাছে পেন্টে দুটি ক্লিপ মারা। প্রতি বুধবার এইপথ দিয়া এমন সময় সদরে যাওয়া আসা ছিল সাহেবের। থাক্ আর না। ছেলে মেয়েগুলিও যথেষ্ট বড় হয়েছে।

তো যা বলছিলাম — এক্লেমশিয়া। আর স্বভাবে তেমন সাবধানী নন তিনি। নাহলে কিন্তু কিছু একটা ঠিকই বোঝা যায়—প্রথমে মাথা ঝিমঝিম, তারপর শূন্য লাগে। হাই উঠতে থাকে বারবার তখনই যদি জায়গামত শুয়ে পড়া যায়—তাহলে ডুবাপুড়ার ভয় থাকে না। কিন্তু মজার ব্যাবার হল-ঠিক সময় মত বুদ্ধি লোপ পায় — সত্যি খেয়াল করে দেখেছেন অতসী।

পায় যদি পাক। আর কত ! বুড়ি হয়েছি। এবার বসুন্ধরার নামে কিছু সময় হাতজোড় করে

থাকেন — শাঁখা সিঁদুর নিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি গো মা !

— জুঁইরে, ঘুমিয়ে গেছিস নাকি?
— না, ঘুম আসছে না মা। আমি কি ভাবছি জানো?
— কি ?
— মেয়েরা কী চায় ?
— কি চায়! — স্বস্তি, স্বীকৃতি আর সম্মান বুঝি !
— না কিছুই চায় না। চাইতে গেলেই দিতে আসবে।
— কে ?
—পুরুষ। পুরুষের কাছ থেকে নেয়া বন্ধ করে দিতে হবে মা।
— ওরা জোর করে দিতে চাইলে ?
— জোর করে ফিরিয়ে দিতে হবে।
— তারপর কি হবে ?
—নিজেদের অসম্পূর্ণতা একে একে উপলব্ধি করতে পারবে ওরা,
—তখন ?
—পরিপূর্ণতা চাইবে।
— চাইতে গেলে তো দেবার প্রশ্ন উঠে, কে দিতে আসবে ওদের—মেয়েরা ?
— হ্যাঁ, তবে সর্ত সাপেক্ষে।
— তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রে ? দেশে কি কোনো আইন কানুন নাই ? পুলিশ মিলিটারী ? ওরা কার হয়ে কাজ করবে ?
— যার জোর আছে।
— জোর তো ওদের বেশী থাকে ?
— না মা না। এ জোর সে জোর নয়। পুরুষে পুরুষে জোরাজুরি হলেও তো কেউ হারে কেউ জিতে। সেটা বড় কথা নয়। তাছাড়া তিনের সঙ্গে এক যে কোনদিনই পারে না সে তো জানা কথা। মা সত্যি করে বলতো — মেয়েরা না চাইলে কি পুরুষেরা কোনদিন পেরে উঠেছে ?

অতসী ঘুমের মধ্যেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। মাত্র দু'মুঠো ভাতের জন্যে আমি মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলাম।

— মা বসুন্ধরা দ্বিধা হও !

এখন টিনের চালে টুপটাপ জল পড়ার শব্দ থেমে গেছে। একটা দুইটা দীর্ঘশ্বাস পড়ছে এদিক ওদিক। তারপর হাই উঠলেই তার শান্তি হবে।

তখন লাতু মইশাসন দিয়ে ইণ্ডিয়ায় ঢুকে আমরা কি দেখলাম ? রিফিউজী ক্যাম্পে কদিন থেকেই বুঝে গেলাম—ভারতবর্ষখান কেমন হবে !

এবং করিমগঞ্জ ছোট্ট শহর। আসামের আরো একটি শহর সুন্দর দেখতে — নাম তেজপুর। একটি কাছাড় জেলায় আরেকটি দরং-এ। কাছাড়ের সঙ্গে আসামের খুব বিরোধ — ভাষা আর সংস্কৃতি নিয়ে।

যাই হউক আসামে এসে-আমরা পড়েছিলাম খুব মুশকিলে। একবার উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি-আবার জানি কি হবে! তাছাড়া এখানেও দেখলাম হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবার রাজনীতি আছে। কাছাড়ে থেকে আসাম সরকারের চাকরি নাকি কেউ পায়না। আমার মতে শানুর বাবাও তখন বেকার, উনি অবশ্য বলতেন— স্বাধীন ব্যবসা করি — যখন যা ইচ্ছা।

মাঝে মাঝে ক্ষুধা তৃষ্ণা চেপে যেতাম, তবু মান বাঁচাতে পারতাম না । ঐরকম সময়

একদিন কি হলো — খুব ভোরে দত্তবাবুর বাড়িতে হেলেঞ্চা, ঢেঁকি আর ঠুনিমানকুনি তুলে আনতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম। এ বাড়ির ছেলেটা যে রোজ মর্নিং ওয়াক করে আমি জানতাম না। এখন চোর ধরা পড়ে গেছি কিছু বলারও নেই। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমনিতে ছেলেটা কাকিমা কাকিমা ডাকতো আমাকে। হঠাৎ, নাকে টিপ দিলে বুকের দুধ বেরিয়ে আসবে এখনও, বলে কি না! ঠাস্ করে ডানগালে একটা থাপ্পর বসিয়ে হনহন করে চলে এসেছিলেন অতসী। পরে দুঃখ হয়েছিল।

লোকে যে বলে স্মৃতি সুখের হয় — মিথ্যে কথা। অতসীর শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এমনকি আগরতলায় যে ছেলের কাছে চলে আসবো—তখন তো অবস্থা আরো খারাপ। বুড়া দেশের বাড়িতে আর যেতে পারে না— মারামারি কাটাকাটি চলছে। তাছাড়া বিক্রিবাট্টার কিছু কি বাকি ছিল? বাদবাকি সবই শত্রু সম্পত্তি হয়ে গেছে শুনলাম— সত্যি মিথ্যা জানি না, তবে বুড়া যে আর যেতে চাইতো না — এটা ঠিক।

ব্যবসা না ছাই, আসলে সবই বিক্রি করে করে খাওয়া। শেষমেষ অতসীর হাড়মাসই শুধু বাকি ছিল। একেবারেই নিঃস্ব বলতে যা বোঝায় আর কি! তারপর আগরতলায় আমাদের ছেলের কাছেই চলে যাবো —স্থির করলাম।

এখনও মাঝে মাঝে মনে হলে—আঁতকে উঠেন অতসী। কী রাস্তারে বাবা! আসামেও পাহাড় লাইন আছে-ছোট বড় তেত্রিশটা সুরঙ্গ, দমবন্ধ অবস্থা আর কি! তবু কিন্তু এই আসাম—আগরতলা রাস্তার চেয়ে ভালো, মাগ্গো! আমি আর কখনও যাবো না। দুইবার দুইখানে নেমে পড়তে হয়েছিলো, পাইরা প্যাচ আর প্যাচ, বমি কি বমি, নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসে।

এখনও মনে হলে তিনি ওয়াক্ ওয়াক্ করেন।

— মা কি হয়েছে?

কিছু না। আমি না মরলে তোরা ঐ আসাম আগরতলা রাস্তা দিয়ে আমাকে আর নিয়ে যেতে পারবি না। তাছাড়া এখন তো বুলে—একেবারে প্যাক কাদায় ডুবে আছি। পেটের শত্রুটাই যা করল— আর কার কাছে কি চাইতে যাবো আমি?

— মাগো বসুন্ধরা দ্বিধা হও!

উত্তেজনায় কাঁপছিলেন অতসী। আজকাল মাঝে মাঝে আত্মঘাতি হতে ইচ্ছে করে। বিছানায় শুয়ে থেকে এখন টের পান— ঘেমে চুবা চুবা।

— তোমার কি হয়েছে মা— বলোতো?

— কিছু নারে মেয়ে—কিছু না। ঠাকুরকে আজ নিদ্রা দেয়া হয়েছে নাকি?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল—হয়েছে। সন্ধ্যার রান্নাঘর থেকে উনি চা খেয়ে যাওয়ার পরই, আর দেরী করেননি অতসী, হলদে জলের হাত আঁচলে মুছে, আলো নিবিয়ে চলে এসেছিলেন।

এখন কুট্ করে একটা শব্দ হল।

এমনি মাছ কাটতে কাটতে, পান চিবোতে চিবোতে—কান খাড়া করে রাখার একটা অভ্যাস আছে তার। সঙ্গে চোখ দুটিও খুলে রাখলেন অতসী—ঘরে তো যথেষ্ট আলো আছে দেখি। স্বপ্নের বিকিরণ নয় — সত্যি সত্যি আলো, ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকেছে।

তিনি আস্তে আস্তে পা রাখলেন মেঝেতে, ভুরুতে বিরক্তি। চটি জোড়া গলিয়ে নিতে সময় লাগে। দুই পা টেনে টেনে — কিছুটা গিয়ে পায়ে-চটিয়ে এক হয়। তিনি দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকে যান।

ফিরে এসে সোজা রান্নাঘর, আলো জ্বেলে ফিলটার থেকে, একটু সময় তার মগজ কোন কাজ করল না আশ্চর্য, উপর থেকে আলগা জল বুক ভিজিয়ে বেশ অর্ধেকটা খেলেন তিনি, একটু

নু'য়ে গ্যাস সিলিণ্ডারটি ভালো করে দেখলেন — অফ্ করাই আছে। কোনসময় যদি মগজ কাজ নাও করে— অভ্যাসের মার নেই। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে সবকটা চকির নীচ ভালো করে দেখে নিলেন। শেষে নিভিয়ে দিলেন আলো।

—রক্ষা কর মা বসুন্ধরা!

তারপর ভালো করে পা মুছে—আবার বিছানায় উঠতে উঠতে সন্তোষবাবুদের পেণ্ডুলাম ঘড়ি—এক দুই তিন চার পাঁচ। অ! এজন্যেই আসলে ফর্সা ফর্সা লাগছে। হঠাৎ করে পাখীরা কিচির মিচির শুরু করে দিয়েছে। ভোরের ঠাণ্ডা তার ভাল লাগে— এখন কি শরৎকাল? জুঁইয়ের ডায়রীতে দেখেছি — শিউলি শিউলি বারবারই লিখে রেখেছে। কে মেয়েটা ?

আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল, স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। তবু কি যে করা এখন ভেবে ভেবে—আরো কিছু সময় শুয়ে রইলেন। একা একা দরজা খুলে দেয়া কি ঠিক হবে? কে কতোটা ঘুমে—তাও তো জানি না। অনুমান করে প্রথমে জুঁইকে দেখলেন—ঠিকই, মুখটা হা হয়ে আছে— মেয়েটার নাক বন্ধ থাকে সবসময়।

আরো একটা শব্দ হচ্ছিল, সূত্র দিব্যেন্দুবাবুর বুক। তবু বুড়া লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি খায়। বললেও উত্তর করে না। বেশী বলাবলি করলে দমকা কাশি উঠে, তারপর খুবই কষ্টে কথা কয়— জায়গা খালি করা দরকার।

— কেন গো, স্বার্থপর, আমারও কি কম দুঃখ— আমি মা না!

এইবার ধুম করে একটা লাথি বা আধলা ইট যেন এসে পড়ল দরজায়। এবং এক নাগাড়ে কড়া নাড়ার শব্দ হতে থাকল।

— আমার শানু নয়ত রে ? হঠাৎই বজ্রবিদ্যুৎ কিরণে একেবারে শূন্য হয়ে পড়েন অতসী— প্রথমে শরীর শূন্য, তারপর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। কতদিন ছেলেটার মুখ দেখি না! একইসঙ্গে তার মনে হল—আমার পেটের ভিতর কাটানাভি ও অজস্র দাঁতের কামড়।

আর হাত থেকে যেভাবে বাসন-কোসন পড়ে যায়, সেভাবেই দৌড়ে গিয়ে এখন সামনের ঘরের দরজা, ছিটকিনি কিছুতেই খুলতে পারছেন না অতসী। পায়ের পাতা থেকে মাথা ঝিমঝিম। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। তার বুক চিরে দেখানোর মত হঠাৎই দরজার কপাট একটান মেরে খুলে ফেলে দিলেন তিনি।

ফলে হুড়মুড় করে কিছু বাতাস ঢুকে এখন অন্ধ অতসীকেও উড়িয়ে নিয়ে যায় যেন। জুঁইয়ের শাড়ি কাটা পর্দায় ঢাকে তার চোখ মুখ। কে বা কারা তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে মনে হল!—কে তোমরা ?

দুই

বাতাসে পর্দায় প্যাঁচ খেয়ে যায় অতসীর বোধবুদ্ধি। তাছাড়া কাঁচা পাকা চুলগুলিও ঝালর করে চোখের সামনে। তখন ঝড়ের বেগে দরজা খুলেই কাটা কবুতরের মত ঝলসে গিয়েছিলেন তিনি। এক একটা ভোর যে কত অদ্ভুত হয়! যথারীতি শানু আসেনি।

বুকের নিচ, চুলের গোড়া ঘামছে। আসলে সারাজীবন হারতে হারতে আর ভিতর বলতে তার কিছু নেই। সবই ঝুরঝুরা। এখন যে বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অতসীকে ধরে বসিয়ে দিলে হয়, ঠেস দিয়ে।

তোরা কে জ্বালাতন করতে এসেছিস রে! আমাকে একা থাকতে দে। এ সংসার যেমন চলে চলুক —চরায় আটকে যাক বা জলদৈত্যের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে গুঁড়াগুঁড়া।

— আমরা কোতোয়ালি থেকে এসেছি। আমি নিরঞ্জন বৈদ্য আর ইনি শমাই লস্কর।

এখন এক দুই করে যদিও দরজা জানালাগুলি খুলে যাচ্ছে, তবু তুমি ছলনায় পড়েছ গো অতসী!

আমি আর পারছি না মা বসুন্ধরা — দ্বিধা হও। একটা জিনিষ দেখেছি—ঘোর বিপদের সময়ও আমার কিছু আবোল তাবোল কথা মনে পড়ে। যেমন আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা, কনকদিদির বর মধুরবাবু একজন কৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন। ফিনফিনা ধুতি পাঞ্জাবী পড়তেন। চিকন হাসি হাসি মোছ ছিল তার, বাবরি চুল, আর মধুরবাবুর গলায় নমস্কার প্রতি-নমস্কার—যেন মিষ্টিপানও তত মিষ্টি না। কিন্তু আমার মত অন্য মেয়েদেরও কি এমনই হত? তখন তো পছন্দ পুরুষের গলা শুনেই উতলা হয়ে পড়তাম আমরা। কোনদিন হয়ত পূর্ণ সমর্পিত হয়েই সামনে দাঁড়িয়ে আছি—পুরুষ মানুষটি তার বিন্দু বিসর্গ জানে না।

—মাসীমা ?

—ও

—আমরা পূর্ব কোতোয়ালী থেকে এসেছি। আমি নিরঞ্জন বৈদ্য আর উনি কনেষ্টবল শমাই লস্কর।

আগে তো পুলিশের মাথায় ঝালর টুপি ছিল। দারোগাবাবুর লাঠিতে পিতলের বাট আর নিচের দিকটা ছাতার মত মেঝেতে ঠক্ ঠক্ করে। সবচে হাসির মনে হত তাদের জুতো—ইংরেজদের মুখ ভোঁতা কুত্তার মতই চ্যাপ্টা চকচক করে আর অসম্ভব ভারি। ছোটবেলায় অতসীর মনে হত—যুদ্ধে মরা মিলিটারিদের জুতোই পুলিশকে দিয়ে দেয়া হয়।

—মাসীমা ?

আমরা ছিয়াত্তর সালে আসামের করিমগঞ্জ থেকে আগরতলায় ছেলের কাছে এসেছি। কাজের মেয়ে বরুণের মার কাছে শুনেছি সত্তর একাত্তরে এখানেও একদল তরতাজা ছেলেমেয়ের খুব উৎপাৎ ছিল। তারপর যুদ্ধ। আমরা তখন করিমগঞ্জে। কুশিয়ারার ওপারে বাঙ্কার আর বাঙ্কার--কত কুকীর্তির কথা শুনেছি, জকিগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তান, চাঁন-তারার দেশ। ঈদের ঠিক আগের দিন রাতে আমরা ভাত টাত খেয়ে ঘুমিয়েছি মাত্র, আর টেঁ টেঁ টেঁ টেঁ। কর্তাবাবু প্রায় তামাকাঁসার বস্তার মতই আমাদের চকির নিচে ঠেলে গুঁজে দিল। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ, ঘরের ভেতর থেকে মনে হচ্ছিল যেন শিল পড়ছে, এমনকি চকির উপরেও দু'একটা গুলির শব্দ হয়েছিল মনে হয়। এবং নানারকমের শব্দ হতে থাকলে সেদিনের রাতটা হঠাৎ থেমে গেল!

তারপর আমরা যখন আগরতলায় রওয়ানা হয়েছি—তখন সবাই বলল—ইমারজেন্সি, সাবধানে থাকবেন, ছেলেটাকে সাবধান করে দেবেন, চুলটুল যেন লম্বা না রাখে। এখন পুলিশের রাজত্ব।

কিন্তু অতসীরা ইমারজেন্সি পেলেন অন্যভাবে, তাদের একমাত্র ছেলের চাকরি চলে গেল।

তখনও কিন্তু পুলিশ কিছু করেনি। মানুষই মানুষের বেশী ক্ষতি করেছে। তার কিছুদিন পরই এল উগ্রপন্থী, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল ত্রিপুরায়। আমার কর্তাবাবুও একটা বিষয় পেল— রাতদিন মুখ গম্ভীর করে ভাবার—রিফিউজি বাঙ্গালী জাতি একদিন ভ্যানিশ হয়ে যাবে! গোপীনাথ বড়দলই বসন্ত দাস আর জওহরলালের নাম শুনে শুনে আমাদের কান বহু আগেই ঝালাপালা। আরেকটা কথা তখনও কিন্তু পুলিশ আমাদের ভয় দেখায়নি, রাত বেরাতে এসে ঘরে ঢোকা দেয়নি, দরজা ভেঙে ফেলতে চায়নি বর্গীদের মত।

—এটা কি শাণিত সেনগুপ্তের বাড়ি?

অতসী স্বীকার করে নিলেন। পালাবার পথ নেই। তাই হাতরে হাতরে একটা সোফা পেয়ে গেলেন এবার। একটু বিশ্রাম লাগে তার। তারপর হাঁড়িকাঠ বা খাড়া যা হোক দেখা যাবে।

কিন্তু পুলিশ তার নাম পুলিশ! এই মুহূর্তগুলি ওরা ভালভাবেই ট্যাকেল করতে পারে। আর উদ্ধত হতে থাকে ক্রমশ।

যদিও এসব ভাল পুলিশের কথা। খারাপ পুলিশেরা আগেই জানে তারা কি করবে না করবে। কার সাথে কেমন কথা বলতে হবে, কোন্ পথে কতদূর যেতে হবে, কতদূর গেলেই কাজ সারা হবে। আম দিয়ে কাম বড়া দিয়ে কিচ্ছু না। তাছাড়া হাতে একটা জালিবেত, মনে মনে বুট জুতার স্পাইক, কোমরের বেল্টটাও শালা মানুষ মারার কল করে বানানো হয়েছে। আর পিস্তলের খাপে বন্ধ বোতাম ঘরটার দিকেই লক্ষ্য রাখে সবাই।

যদিও এখন এখানে অন্যরকম ব্যাপার। কেউ কারো অনুমতির অপেক্ষা না করেই সোফাগুলিতে গিয়ে বসল। মাথার টুপি খুলতে খুলতে কনেস্টবলকে কি যেন ইশারা করল ইনিস্পেক্টর, শমাই বন্ধ জানালা খোলার দায়িত্ব নিয়ে উঠে দাঁড়াল এমনভাবে! অথচ তার চোখ অতসীর চোখের আড়ালে রাখল, খড়কুটো যেমন ঘূর্ণির জলে সুরুৎ করে হারিয়ে যায়, তেমনি হঠাৎ ডুব দিয়ে অতসীদের ভিতরঘরে গিয়েই এবার উঠল শমাই।

এতসব প্যাঁচ পাইচ্যার কি কোন দরকার ছিল? একা অতসী তো বোকার সমান। তারে আবার লজ্জা ভয় কি? তিনি কি তার ছেলেটাকে ধরে রাখতে পেরেছেন? তোমাদেরও আমি বাধা দিতে পারব না বাবারা। ভারতীয় মা মেয়েরা এমনই হয়—বাইরে ভিতরে শূন্য, এদের বয়েসের কোন বালাই নেই, ছোট বড় এক সমস্যা—নিরাপত্তা। প্রকৃত বিপন্ন বলতে আমি মেয়েদেরই বুঝি। এক একটা পলিথিনের থলি, কাগজকুচির মত যত নিপাত্তা দুঃখ সবই গুঁজে গুঁজে রাখ, মরার সময় বালিশের মত পেট ফেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে।

আর আশ্রিতের প্রতি বেটামানুষেরা যে সবসময় তুচ্ছতাছ করে এমনও নয়, শুধু বেটায় বেটায় আড্ডা হলে ওরা কি কথা বলাবলি করে আমরা জানি। মাকাল মাকাল! একেক সময় মনে হয় কোনো সেনা ছাউনিতে—শূকর মুরগীদের সঙ্গে আমরা কিছু মেয়েমানুষও আছি।

ফলে পুলিশ এখন চোরের মত নয়, আমি বলব ডাকাতের মতই, তার চোখের সামনে গট গট করে ভিতর ঘরে গিয়ে ঢুকল। কেন ঢুকল? না তার গায়ে খাকি পোষাক আছে। খাকি শার্ট প্যান্টের প্রতি এখন আর ছেলে মেয়েদের তত ভয় নেই, যত আমাদের আছে। আইনের মানুষ ওরা সবই পারে। জুঁই বলে—মা, যুদ্ধ কথাটাকে ওরা কোনখানে এনে দাঁড় করিয়েছে দেখেছ! উগ্রপন্থী কাণ্ডকারখানাও নাকি যুদ্ধ, পুলিশ—এসবের মোকাবেলা করতে পারে না —মিলিটারি লাগে। কোন্ দিন শুনব—চুরি ডাকাতিও যুদ্ধের পর্যায়ে পড়ে।

যাই হউক, এখন ওরা আমাকে নড়াচড়ার সুযোগ দিচ্ছে না। কি যেন নাম বলল—নিরঞ্জন বৈদ্য। একটুকরো কাগজ এমন কায়দা করে আমার মুখের সামনে ছেড়ে দিল, হাতগুলি তো নিরুপায়, অনেকক্ষণ ধরেই আমি সোফার রেকসিন খামচে ধরে আছি। চোখে কি দেখছি না দেখছি কিছুই স্পষ্ট নয়। এরকম সময় বোধহয় মনই দেখাশুনা করে সব। সেই কাগজ ভোকাট্টা ঘুড়ির মত এদিক ওদিক উড়ে উড়ে ঠিকই কোলে এসে পড়ল, আমার স্কুল পাশ বিদ্যাও খুব কাজে

লাগল। দেখছি, দেখছি না, চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে না তবু দেখলাম 'ওয়ারেন্ট'। আর শানিত সেনগুপ্ত তো আমারই ছেলে। আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ক্রমে ক্রমে সবই মনে করতে পারছি এখন, সবই দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।—এরা কেন এসেছে? ছুঁচোটা গেল কই?

আমি নিরঞ্জনের সামনে বসে আছি ঠিকই, কিন্তু এরকম সময় আগে বল্লাম না—মনই দেখাশুনা করে সব। সেই মন শমাই-এর পিছে পিছে গিয়ে ঢুকলো ঘরের ভেতর। আর পানখাওয়া পুলিশটার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, থরথর করে কাঁপছি, আমার শরীর থলথল করে দুলছে। আসলে শ্বাস-প্রশ্বাসটাই প্রধান হয়ে পড়েছে। এরকম সময় সব বয়সের মেয়েরাই জুঁই হয়ে যায়—আঁচল খসে বুক ধরফর করে, নাভির মধ্যে ঘূর্ণি। শমাই এতক্ষণ আমাদের টু-ইন-ওয়ানটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। মিনা করা নারী মূর্তিটাও বেশী বেশী চকচক করেছ। আমি কীভাবে আটকাতে পারি শমাইকে—কীভাবে? মূর্তিটার বুক, তলপেট পাছা স্পষ্টতই অন্যরকম, এখনও এতটুকু ঢিলে পড়েনি। আমি বুড়ি থুড়থুড়ি, আমার কোন ঢাল তরোয়াল নাই। মেয়েরা যখন রজঃস্বলা হয় তখন প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেলে—কী খুশি— সাপিনীর সুখ ও সতর্কতা। কিন্তু যে মহিলা হঠাৎ মরানদী হয়ে পড়ে—তারে প্রশ্ন কর জুঁই, চলার পথ সোজা হবে!

এই যে কনেষ্টবল শমাই লস্কর, আমার ছেলের থেকে আর কত বড় হবে তুমি? তবে পোষাক-পরা পুলিশের চেহারা কোনদিনই নিজের ছেলের সঙ্গে মেলে না। শমাই আর এক পা এগোলেই এখন জুঁইদের ঘর। ঘুলঘুলি দিয়ে রাস্তার আলো এসে তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। ওঘর থেকে আসার সময় আমি সবই ঠিকঠাক দেখে এসেছি। জুঁইয়ের মুখটা একটু হা, মাঝে মাঝে তার লোল গড়িয়ে পড়ে। শানু বলত —কারো মুখের লোল বড় ঘেন্নার।

নিরঞ্জন লক্ষ্য করল—অতসী বার বার পেছন ফিরে দেখছেন, তার পা দুটি উসখুস্ করছে। এমন সময় শমাই ফিরে এল। নিরঞ্জনের দিকে বলল—না। তারপর আরো বেশী শব্দ করে সোফায় বসল। কটমট করে তাকাল অতসীর দিকে—যেন তিনিই আসামী। দারোগাও হাতের লাঠি ঠুকল টি-টেবিলে।

—আপনার নাম?

আরে আরে তোমরা কর কি? একটু আগেও তো মাসী ডাকছিলে, ছেলেমেয়ের বন্ধুবান্ধবীদের মতই মধুর!

—আমি অতসী সেনগুপ্ত।

আমি যেন আবার সেই চেকপোষ্টে দাঁড়িয়ে আছি। শাড়ির আঁচল বুকে টানেন অতসী। তোমরা বেটা মানুষেরা বড় বেশী ভান কর। পুলিশেরাও ভদ্র ব্যবহার করতে আপত্তি কি?

—তাহলে উনি এভাবেই যাওয়া আসা করেন?

—কে? তোমরা কার কথা বলছ?

মুহূর্তে আরেকটা লাঠির বাড়ি পড়ল টি টেবিলে। জোয়ান থাকতে শানুর বাবারও একই বাতিক ছিল। নিছক সন্দেহের উপর কথা ছুঁড়ে দিত, লাগলে লাগল না লাগলে নাই। ভুল বুঝতে পারলে পরে তোষামোদ করার চেষ্টা করত। তখন আমি বেঁকে বসতাম বা অপমানে কেঁদে ফেলতাম যখন—দূরে দাঁড়িয়ে বসে বিড়ি টানতো শুধু, ভাল লাগতো আমার—তাই এখন আরো স্পষ্ট করে বল হে তোমাদের কি চাই বল?

—শানিত সেনগুপ্ত কখন আসে যায়?

শানুর কথা বলছ? এক ছেদে হঠাৎ যেন কাটা মুণ্ড হয়ে পড়েন অতসী। জানি তো তার কথাই বলবে তোমরা, কিন্তু কি উত্তর দেব আমি, কিছুই জানি না। কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকেন। আমার তো শুধু চোখের জল সম্বল। একদিন তো রীতিমত পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরেছিলাম — আজ দেখি কি করে যাস্? রোজ রোজ রাতের বেলা কাগজের অপিসে কামের নামে কই যাছ তুই? তোর মুখে সবসময় বিদঘুটে গন্ধ করে কেনেরে বদমাইস? আর শানুটা শুধু মা মা করছিল,
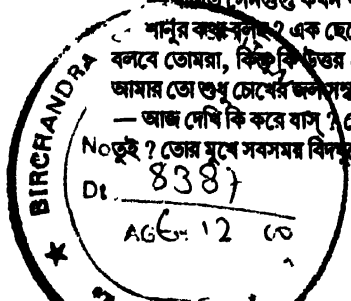
টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত—মা ছাড়, মাইনসে কিতা কইব কও, পত্রিকা অপিসে বেশী রাত্রেই কাম গো মা, বিশ্বাস করো। তাছাড়া আমার আঁচলটাও বড় অসুবিধা দিচ্ছিল, যন্ত্রণাটা জড়িয়ে যাচ্ছিল পায়ে পায়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম আমি, আরো বেশি আঁকড়ে ধরেছিলাম শানুকে—বাবানা ভালা, যাইস না, মার কথা লো। শেষমেষ বড় রাস্তার কাছে এসে আর টানতে পারছিল না সে। মনে হয় পরিত্রাণের আকাঙ্খায় একেবারেই ঝেড়ে ফেলতে চাইল, তার ডান হাতের কনুই এসে লাগল আমার নাকে। আঃ, হৃদপিণ্ডটাকে তখন নাকের কাছেই টের পেলাম আমি বা সাপের মত কিছু। মনে হয় লুটিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়। তখন আমার পা ধরে কি কেউ কেঁদে উঠেছিল ? মনে নেই। ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম যখন — আমি বুড়ি শনলুড়ি, একরকমের অদ্ভুত কান্না পেয়েছিল আমার—নিজেকে একজন ধর্ষিতা মনে হয়েছিল কেন জানি, তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল—মনে হয় প্রতিশোধস্পৃহা, গর্ভের প্রতি ঘৃণা—এ আমার সন্তান নয় গো মা,—স্বপ্নের ছাই ! অতসী এবার নড়েচড়ে বসলেন। শুরু শুরুতে পুলিশের চেহারা যেমন সমঝোতাপ্রিয় ছিল, এখন তেমন নয়, অনেকটাই হিংস্র হয়ে উঠেছে, কড়া রোদ এসে পড়ছে দরজা জানালা দিয়ে। কোথা থেকে রাতের বেলা এসে এঁটোকাটা খেয়ে যায় যে জকি কুত্তা—তারও পাত্তা শুনি না !

—না গো বাবারা, শানু অনেকদিন হয় আর এবাড়িতে আসে না। টাকা পয়সাও পাঠায় না।

—সত্যি তো মাসীমা ?

সঙ্গে সঙ্গে এই ঘরটাকেই মনে হল গারদ। চোখে মুখেও বিরক্তি ফুটে উঠেছে নিশ্চয়। তবু তলে তলে অন্যমনস্ক হয়ে যান অতসী ? শানুটার আবার কী করার ক্ষমতা আছে ! চুরিটুরি ? মনে তো হয় না। যদিও স্বভাবে বাপের মতই—থাকলে রাজা না থাকলে নাই। তাছাড়া যে ছেলে গরম ভাতে জল, ডালের বড়া আর নুন লংকা দিয়ে খেতে ভালবাসে ! অংকটা কিছুতেই মিলছে না তার। তাহলে কী হতে পারে ? কোন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ? অসম্ভব। যা নোংরা থাকে আমার ছেলে, আর মুখচোরা। হঠাৎই আঁতকে ওঠেন অতসী—রাজনীতি-টিতি নয় তো ? আমার সেজকাকাকে দেখেছি স্বাধীনতার আগে সন্ত্রাসবাদী করতে। রাত হলেই বিভীষিকা নেমে আসতো। চারপাশে বুটজুতার শব্দ। এমনকি আমাদের উঠোনেও পুলিশের সিটি শুনেছি আমরা। ঘরের ভেতরে তখন ইঁদুর আরশোলা আর ছুঁচোর তাফাল। অনেকক্ষণ বাইরে চোখ রাখলে তবে দু-একটা কুপির আলো দেখা যেত জ্বলে নিবে। আসলে বাতাসের মধ্যেই বুটজুতার শব্দ, থেকে থেকে বাজে। ঘুলঘুলিতে হঠাৎ এসে পড়ে টর্চের আলো। আমরা ঝিম মেরে পড়ে থাকি। শুধু আরশোলা ইঁদুর আর ছুঁচো। এবং অন্ধকারে আমরা কোনদিনই বুঝতে পারতাম না —সেজকাকা ঠিক কোনখানে লুকিয়ে আছে—সবখানেই তার শ্বাসের শব্দ কেন ?

— বাবা নিরঞ্জন শুনো, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আমি যাই।

— না—না, আপনি শান্ত হোন মাসীমা, আমরা বুঝি।

আজ কদিন ধরেই কিছু একটা আশংকা করা যাচ্ছিল। থেকে থেকে বুক ধরফড় করে। অথচ ফিটের ব্যারাম নয়। সেতো মাথা ঝিম ঝিম। ফলে এখন তিনি সোফায় এলিয়ে পড়েছেন। মাথা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। আর কান্না অনেকক্ষণ ধরেই নাকে খোঁচা দিচ্ছিল।

—আমার একটি মাত্র ছেলে আর একটা মেয়ে। তোমরা জান তো, লোকে যে বলে— ঘর নষ্ট বড় ভাই পাগল !

—মাসীমা, আপনার স্বামী দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত তো একজন ফ্রিডম ফাইটার ?

অতসী বুঝতে পারলেন—ওরা ছাড়ার পাত্র নয়, বারবার উপরে তুলে আছাড় মারবে। মারুক। শানুটাই পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে গেছে। একটু নড়াচড়া করে বসলেন অতসী। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। মোকাবিলা করতে হবে। আবার ভাবলেন—লোকগুলো কি সত্যি সব জানে নাকি ? নাকি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে মারছে ?

—তোমরা শানুর কথা কিছু বলছ না যে ? কি হয়েছে ?

—কিছু নয় । ওকে তো মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ।

—তাহলে ফিরছে না কেন ?

—সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন মাসীমা ?

একে অন্যের দিকে ওরা শব্দ করে হাসল । তারপর নিরঞ্জন দৃষ্টি দিল এই ঘরের দিকে ।

বারো বাই বারো । দশ ইঞ্চি ব্রিক পিলার আর পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের খাঁজে খাঁজে খাট, সোফাসেট আর একটা খুব সুন্দর বুকশেলফ্ আছে । হাঁটাচলা করতে হলে সত্যি—এর বেশী আর কিছু রাখা যাবে না । জায়গা নেই, তবু আরেকটা টি টেবিল রাখা হয়েছে জোর করে, লাগে অবশ্য ।

—দেয়ালে এই ছবিটা কার ? মালা চন্দনেও দেখি ঝুল জমে গেছে । খুবই ক্লান্ত লাগছে নাকি মাসীমা ? তাহলে আপনি যেতে পারেন, দিব্যেন্দুবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন একটু ।

—কেন ? থাক্ না ! অঘুমার রোগী মাত্র ঘুমিয়েছে । আমি ঠিক আছি । আর তুমি দেয়ালে যে ছবিটা দেখছো—ওটা আমার শ্বশুরমশায়ের ।

—আচ্ছা আচ্ছা । কিন্তু দিব্যেন্দু কবে কোথায় জেল খেটেছেন—আপনি জানেন কি মাসীমা ?

সাবইন্সপেক্টর বৈদ্য এতক্ষণ ভদ্রই ব্যবহার করছিল । যদিও অনবরত নড়তে থাকা তার চোখের পুতলিগুলিকে ভয় করছে । বিচ্ছুরা আমাকে বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে । তারপর ওরা কি চায় ? শানু প্রসঙ্গ যেন কোন ব্যাপারই নয় ! ততক্ষণে কিছু শব্দমালা অতসীও জড়ো করে ফেলেছেন ।

—পুরোটা আমার জানার কথা নয় । সবই তো বিয়ের আগের ঘটনা । তবু যা যা শুনেছি—তোমরাও শুনো । সদর সিলেট জেলেই নাকি ইনাদের বারবার নিয়ে যাওয়া হত । তোমাদের মেসো তো সন্ত্রাসবাদী করেননি কখনও । সবই অহিংস ছিল ।

তারপর সেজকাকার গুলিবিদ্ধ মুখ মনে হলে মুচড়ে মুচড়ে উঠেন অতসী । এত মিছা কথা আর পারি না । ভক্ করে কিছু কান্নাও বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে লোল । ওরা মুচকি মুখ দেখাদেখি করল । ঢোক গিললেন অতসী । ছেলেবেলায় কিছু তোতলামি ছিল তার । সাবধানের মার নেই । সেজকাকার সংগ্রামী জীবনের কথা এখন সবই দিব্যেন্দুবাবুর নামে চালিয়ে দিচ্ছেন তিনি । সেবার এনকোয়ারির সময়ও বুড়াকে তোতা পড়িয়ে দিয়েছিলেন অতসী । লোকটা বড় তাতুভাতু, সন তারিখ সবসময় প্যাঁচ লাগিয়ে ফেলে । এখন জেলসুপার ইব্রাহিম আর রবিদাস ওয়ার্ডেনের নাম বেশ জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করলেন তিনি । রক্ষা করো বিপদভঞ্জন—

—মধুসূদন মধুসূদন । শমাই লস্করটাই বেশী ফাজিল । শরীর খারাপ লাগছে নাকি গো মাসী ?

— না । এবার নিজেই উঠে পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিলেন অতসী । তোমরা একটু বস, আমি চা করে আনি ।

—না ইচ্ছে করছে না । সিগারেট খেলে কোন আপত্তি নেই তো ?

—আছে । হঠাৎই যেন মাথার মধ্যে, অনেকক্ষণ ধরেই ধিকিধিকি জ্বলছিল, স্বাভাবিক আগুন ধরে গেল এবার । কী ভেবেছে ওরা ? শানুর কথা কিছুই বলছে না শুয়োরগুলা । পুরো পরিবার জড়িয়ে ফেলতে চাইছে । বুড়াকে একবার ডাকব নাকি ? আবার কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকেন । মনে হয় থপথপ করে মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছেন এখন । ভগবানের সঙ্গে কে পারে, ভুল শুধরে আবার মাটি হয়ে যাবার চেষ্টা করেন অতসী—তোমরা আমার ছেলের মত, সিগারেট খাওয়াও খুব খারাপ শুনেছি—

—ঠিকই শুনেছেন, বলতে বলতেও ঠোঁটে আরেকটি ঝুলিয়ে দিল নিরঞ্জন । শমাই লস্কর ফস্ করে আগুন ধরিয়ে দিল । তারপর একমুখ বিদ্রূপরূপী ধোঁয়া তার দিকে তেড়ে আসতে আসতেও হাওয়ায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ।

কেবল অতসী নন, পুরো পরিবেশটাই এখন অসহায়। রাগারাগি করে আর লাভ নেই। তাই থেবরা মেরে বসে ক্ষণ গুণতে থাকেন তিনি। তোমরার যা খুশি কর। কালরাত থেকে আর ফাঁক পাননি। মাঝখানে একবার নাকি বোবায় ধরেছিল। তারপর বাপমেয়ের কাইজ্যা শুনলাম কতসময়। এখন হাই তুললেন। আমি দেখলাম শমাই আকুপাকু করছে—কিছু একটা বলবে মনে হয়। এই দুষ্টটাই একবার ভিতর ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছিল। আমি তো মা, তবু অসভ্যটার মুখ দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। ঘৃণায় হলেও এখন ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন অতসী। তার চোখের পুতলি, ভুরু আর ঠোঁটের কোন্ দেখছিলেন—যেখানে লালামিশ্রিত হাসি থাকে সবসময়। অথচ কখন যে কথাগুলো বলল ফক্করটা। আমি আগে পিছে দেখলাম। নিরঞ্জনের ঠোঁটে সিগারেট, মুখের সামনে মেঘ কাটেনি। তাহলে তোরই গলা হবেরে শুয়োর!

—জুঁই সেনগুপ্ত কি কাজ করেন গো মাসী?

অতসীর মনে হল—একটু পরে তিনি আবারও আক্রান্ত হবেন। আচ্ছা, পুলিশকে ঘুষ কথাটা কতবার শুনেছি জীবনে—কেমনে জানি দেয়? জুঁই নিশ্চয় পারে। এজন্যেই তিনি এখন চুপচাপ বসে আছেন এঘরে। যতই হউক জুঁই তো বাচ্চা মেয়ে।

— তলে তলে আমার আর শিকড় ধরে রাখতে চায় না কোন জাতের মাটি। হাতের সামনে খড়কুটো পর্যন্ত নাই। শানুটাও সম্পর্ক কমিয়ে আনতে আনতে একেবারে শূন্যের কোঠায়। আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমরা। তখন হঠাৎই হাল ধরল আমার মেয়ে—মা তোমরা কোন চিন্তা করো না—আমি তো আছি। দেখি কি করা যায়!

আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে অতসীর। বড় অভিমান হয়—মানুষগুলো এখন সবই কুকুর হয়ে গেছে। আগে তো যা হোক আড়াল আবডালটুকু ছিল। এখন রাস্তার মাঝখানে তোমাকে লেংটা করে দিতে না পারলে আর কইলজা ঠাণ্ডা হয় না ওদের। কিছুটা কান্না যেন গিলেই ফেল্লেন অতসী।

—ইন্সিওরেন্স কোম্পানির দালালি করে আমার মেয়ে। কেন—কি হয়েছে?

—কিছু না। মেয়ে দালাল। শমাই একবার টিপ্পনি কাটার চেষ্টা করতে না করতেই ধমকে ওঠে দারোগা। সুযোগ বুঝে অতসীও লাফ মেরে উঠে দাঁড়ান—আর কোন প্রশ্ন আছে আপনাদের?

নিরঞ্জন ছুটে আসে, হাতজোড় করে, ভুল বুঝবেন না মাসীমা, বসুন।

অতসী তবু দেয়াল দরজা ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকেন, বাগরঙ্গ নয়, দেখতে অপরাধী মনে হয় অতসীকে। আমি তো সবই জানি—বিপদের দিনে আত্মীয়-বন্ধু সবাই পালায়। সংবাদ পায় শিয়াল শকুনেরা। শেষমেষ খাতা কলমের ব্যবসা একেবারে লাটে উঠে গেলে, করিমগঞ্জ শহরে নির্বান্ধব হয়ে পড়েছিলাম আমরা। এমনকি করুণা করেও কেউ দেখতে আসেনি আমাদের। একদিন হঠাৎ ননাসের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। মাগী মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিল—মুখপোড়া বানর! এমন জ্বালা আমার সাতজন্মেও জুড়াবে না।

আর এতক্ষণ ধরে তিনি যে শব্দ করে কাঁদছিলেন অতসী নিজেই জানেন না। এবার দিব্যেন্দুবাবুর কাঁপা কাঁপা হাত তার কাঁধে ঠেকলে হুস হল। তড়িঘড়ি চিহ্ন মুছে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি, ততই সারা মুখে লেপটে যেতে লাগল দুঃখ, হার মানবেন না অতসী।

—তুমি কেন এসেছ এখানে, দরজা জানালাগুলি খুলে দাও গে যাও। আর ওকে ডেকো না।

তবু যেন বাঁশে বালুতে কড়কড় শব্দ করে উঠলো—ও কে?

—তোর মা, কুত্তার বাচ্চা! কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না অতসী। মুখের কথা আর ঢিল একবার ছুঁড়ে দিলেই মুশকিল—ফেরানো যায় না।

ও না থাকলে আমাদের যে কী হত আজ আর ভাবতে পারেন না অতসী। কথায় কথায় যে চাবুক চালায় এখন, সবই সহ্য হয়, পেটে খেলে পিঠে সয়।

অতসী থেমে গেলেন। নিরঞ্জন কি সব মহাভারত লিখে নিচ্ছে ডায়রিতে। শমাইও উঠে দাঁড়িয়েছে, টুক করে তার পেছনের জানালাটা খুলে দিল। একরাশ সকাল এসে ভরে গেল ঘরটা। তিনকাপ চা চামচ নিয়ে ঢুকল জুঁই। ট্রে-টা হলুদ। ধোঁয়া উড়ছে। মনে হচ্ছে যেন কিনারে বিস্কুটগুলো নরম হয়ে যাবে ধোঁয়ায়। —আরে নিরুদা ?

— তুমি জুঁইলতা ! তারপর কিছুটা সময় নিল নিরঞ্জন। আসলে তো সবই ছককাটা ব্যাপার। কিন্তু জুঁই জানল কি করে ?

পুতুর পুতুর আমার কর্তাবাবুর কাজ হবে এসব। বুড়া-ই নিশ্চয় ওকে ডেকে দিয়েছে। তিনি ঠিক জানেন। ঘাটের মরা। আর বুদ্ধি সুদ্ধি হবে না। তবু ঘোর বিপদের মধ্যেও যেমন প্রসঙ্গান্তরে গেলে হাঁড়িকাঠ একটু দূরে সরে যায়, তেমনি জুঁইয়ের উপস্থিতি এখন স্বস্তি দিল অতসীরে।

জুঁই তার হাত থেকে ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে অজস্র টুকরো কথা একসঙ্গে ভাবতে পারল না, একটু বেসামাল হল। নিরঞ্জন আমার প্রিয় বান্ধবী কাবেরীর দাদা, বয়স বেশী না, ফলে স্মৃতি এবং লজ্জার সঙ্গে অতিরিক্ত রক্ত এসে জমল। এতদিন পরে আবার নিরুদার স্বর কি করে চিনতে পারল সে ? ভাল লাগছে। সেই হ্যাংলা পাতলা ছেলেটা এখন কত নাদুসনুদুস হয়েছে। তার টুপি, খাকি পোষাক, ব্রাসো করা বেল্ট ও বুটজুতাগুলিও বেয়নেটের মতই চক্‌চক্ করছে। ডান হাতের তর্জনি আর মধ্যমায় সোনার আংটি আছে দুইটা, অন্যগুলি রূপার প্রবাল গোমেদ। রিভলবারের খাপ দেখলে মনে হয় যেন নিরঞ্জন সবসময় ছুঁয়ে থাকে সেটা। এরকমই একটা খারাপ লোকের খুব দরকার ছিল তার। রাতে নিশায় রাস্তায় ঘাটে মদুয়া, হঠাৎ জটলা আর স্পিডব্রেকারগুলিকে ভয় করে। অনেকক্ষণ পর আবার সন্তোষ কাকাদের পেণ্ডুলাম ঘড়িতে শব্দ হচ্ছে—কি হল নিরুদা ?

নিরঞ্জন বৈদ্য অনেকক্ষণ ধরেই একটা সাঁকো পার হতে পারছে না। তখন সন্ধ্যা। খালের পারে বনমালীপুর আর আমরা থাকি অভয়নগরে। জুঁই কাবেরীর বান্ধবী। রোজই কোন না কোন বইখাতা নিয়ে আসতো আমাদের বাড়ি। আমার কাজ ছিল প্রতি সন্ধ্যায় হাত-পা ধুয়ে যখন পড়তে বসব—রোজ রোজ ঠিক তখনই ওকে সাঁকো পার করে দিয়ে আসতে হবে। মনে হত সেও যেন এজন্যেই তৈরী হয়ে আছে। মা কাবেরীদের মুচকি হাসির সামনে, ওর চোখের মণিগুলি শুধু লক্ষ্য করতাম আমি। ঠোঁটের কোন্ বা চোখের কোন্—কোনখানে নিশ্চয়ই সেও হাসি ঠাট্টা করতো ! যেদিন সামনে সামনে হাঁটত, আমার কী মজা ! আমি যা খুশি করতাম, কোনদিন তার খুব কাছে, এমন কাছে যে গরম শ্বাসে কেমন সুরসুরি লাগে ? তার পিঠকাটা পিঠে আঁচড়ানো খুদে লোমকূপগুলিও স্পষ্ট দেখতে পেতাম আমি, যদি না আলো ডুবে যায়। পাকা মনগুটার গন্ধ অন্ধকারেও করে বা কয়েক কদম দূরে দূরে যখন আমরা। একটু হলেও আলো থাকে, স্পষ্ট দেখতে পেতাম আমি—তার দুই হাঁটুর পেছন দিকটা বেশ চওড়া ; ভাঁজগুলো নতুন নাকি পুরনো, চিকন নাকি মোটা—এ নিয়ে কিছুটা সন্দেহ আমার থাকতই। আর পায়ের তলা যতটা নৌকার মত উঠে এসেছে তার সবটাই গোলাপি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি—ওর পা দুটোকে আলতায় রাঙানো সাজে না, তার চেয়েও অনেক সুন্দর পা। আবার আমি যদি ওর সামনে সামনে থাকি তো অন্য ব্যাপার। আস্তেই হাঁটি বা জোরে জোরে, কিছুতেই জুঁইয়ের কাছাকাছি থাকতে পারতাম না আমি, দূরত্ব সবসময় সমান মনে হত কেন জানি !

আরেকদিন সকাল থেকেই মেঘলা। তারপর একপশলা বৃষ্টি। মাঝে মাঝে কিছুটা থম ধরে, আবার ঝরে। এক কথায় বিতিকিচ্ছিরি দিন। সন্ধ্যা সন্ধ্যা। এমনিতেই তেমন লোক চলাচল করে না এদিকে। শুধু আমরা হাটছিলাম সেদিন। কোনো কথা বলছিলাম না। এরকম সময় হাতছাতা করেও যে অনেক দূর যাওয়া যায় জানি, কিন্তু কার মাথায় হাত রাখব—বুঝতে পারছিলাম না আমি। কেমন জানি একটা তোলপাড় চলছিল আমার মনের মধ্যে—কি ভাবছে জুঁই ? যদি না না করে উঠে। যদি বলে—ইস্ কি বিশ্রি ! যদি কাল থেকে আর কোন দিন না আসে ! ততক্ষণে

জোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে আবার।

যেন কাগজের নৌকা ভাসান, ডুবতে ডুবতে আবার ডাঙার দিকেই ফিরে আসে নিরু। এই হল শাণিত সেনগুপ্তের বাড়ি। তার বসার ঘর। সোফায় এলানো অতসীর গালে মরা নদীর রেখা। শমাই লস্করের চোখগুলিকে যে শকুনের মত মনে হয়—তা কিন্তু ভুল। মানুষেরা সাধারণত: নিরীহ প্রাণীর পর্যায়েই পড়ে। জীবিকার প্রয়োজনে শকুনি হয়েছে শমাই। আমিও যে লম্বা লম্বা কথা বলি—সাজে না কিন্তু! ড্রাগের নেশার মত আমার আরো আরো টাকা চাই। তোলা পাওয়া পুলিশের মন পাওয়া মুশকিল। যখন তখন হাতের রুলার আপনাআপনি গর্জে ওঠে। ইদানিং বি সি লোকটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। শালা খুঁৎ ধরে খালি। কংগ্রেস আমল থেকে সদরে আছি বলে ঘুঘুটাও কংগ্রেসী মনে করে আমাকে।

যাই হউক এই মুহূর্তে বি সি রায়ের কবলে নেই সে। এটা শানিত সেনগুপ্তের ঘর এবং এখন কিছুই নির্ণয় করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। মনে হয় অনন্তকাল ধরে জুঁইকে দেখছি আমি। এ কোন্ জুঁই?

বৃষ্টিতে ভিজে যে আমার আগে আগে হাঁটছিল সেদিন। দ্রুতই খালপাড়ে নেমে এসেছিলাম আমরা। প্রথমে সে হাতবাঁশটা ধরে, ডান পা রাখে একটা নড়বড়ে সাঁকোতে। সময় তখন কালো হয়ে গেছে, জলেও তার ঢেউ। সাঁকোর ওপার বলতে তখন আর কিছু নেই। আমাদের চিন্তাশক্তিগুলি ক্রমশই নষ্ট করে দিচ্ছিল বৃষ্টি। আমরা একলা মানুষ। একটু একটু করে এগিয়েই যাচ্ছিলাম মনে হয়। বাঁশে বাঁশে গিঁটুগুলি জলের নীচে সন্ধি করে খুলে যাচ্ছিল—তার বিন্দুবিসর্গও টের পাইনি আমরা। পেছন ফিরে দেখি আরো বৃষ্টি, আরো অন্ধকার, অর্থাৎ দুই কূলই হারিয়ে ফেলেছি। তবু মেয়েটা একবারও বলল না—নিরুদা কি হবে? আমিও বলিনি—জুঁই সাবধানে। কারণ আমি তো জানি একদিন আমাদের নিশ্চিৎ সহমরণ হবে। অন্তত জলের নিচে দুইজনে প্রাণভরে জড়িয়ে ধরতে পারব। হঠাৎই বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেল। তবু কিন্তু আমার মনে হল—আমরা গন্তব্যের দিকেই যাচ্ছি। পাটাতন নেমে যাচ্ছে একটু একটু করে, জুঁইয়ের পায়ের পাতা, গোড়ালি। তারপর একি হলো? হঠাৎই একটা ঝাকুনি লাগল আমার গায়ে আর পার পেয়ে গেল জুঁই! আমি বোকা বনে গেলাম। তখনও সাঁকোতেই দাঁড়িয়ে আছি—মানে ডুবছি ক্রমশ। মেয়েটার যে বিড়াল চোখ—সবই আমি জানতাম।

সেই জুঁইফুল এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহু ব্যবহারেও রূপ ফুটে উঠে দেখলাম। জগদীশদাকে একবার অফার করে দেখা যায়। তিনি তুষ্ট হলে বি সি ফি সি কোন ব্যাপারই নয়। তার ঘরে সবসময় মন্ত্রী মিনিষ্টারের ভিড় লেগে থাকে। তবু নিরঞ্জনের কেন জানি এখনও ভাবতে ভাল লাগছে—জুঁই তার নিজস্বতা ধরে রাখতে পেরেছে এখনও। একবার উন্মুক্ত করে দেখব নাকি? না পেলে কি আপত্তি আছে! আমাদের জগদীশদা তো আছেনই—কোন কিছুতেই অরুচি নেই তার।

একই হাসি হাসি মুখ করে প্রশ্ন করে নিরঞ্জন—তোমরা তো একসময় বনমালীপুরে ছিলে, তারপর?

—সে তো অনেকদিন আগের কথা নিরুদা। তারপর দাদার টারমিনেশন। আমি এম বি বি কলেজে ভর্তি হয়েছি।

এক একদিন গভীর রাতে দাদা যখন ঘরে ফিরে তার লেখার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতো, বুকপকেট থেকে কলম আর একতাড়া কাগজ বের করে ভাঁজে ভাঁজে কি যেন খুঁজতো দাদা, চেয়ারে বসত দুই কনুই টেবিলে রেখে এনাসিনের বিজ্ঞাপনের মতো।

—তারপর সুখের বনমালীপুর ছেড়ে একদিন আমরা জি বি জগৎপুরে চলে আসি।

নিরঞ্জন একটা প্রশ্ন করেছিল ঠিকই কিন্তু তারপর থেকে অন্যমনস্ক। জুঁইকে দেখছিল টুকরো টুকরো। তার বুক কোমর। অর্থাৎ আগের দুর্বলতাগুলিকে এতক্ষণে সে ঝেড়ে ফেলতে

পেয়েছে। বি সি, ও সি লোকগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে। অনেকদিন ধরেই তার প্রমোশন ডিউ। জগদীশদাও জানে কথাটা। ফলে—

জুঁই কোন মাকাল ফল নয়, সেও সব বোঝে। ফলে বুকের আঁচল বীণার মত করেই দাঁড়িয়ে থাকে এখন, যেন বাসস্টপ। নাভি আগ্নেয়গিরির মুখ—ভিতর থেকে ঠেলছিল শুধু।

মেয়েটা যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে—এই প্রথম খেয়াল হল অতসীর। তিনি উঠে দাঁড়ালেন—তুই বস। তারপর যেতে যেতে লক্ষ্য করলেন—শমাই লস্করও এখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

— তোমাদের জি বি থেকে যাতায়াতের খুব সুবিধে—তাই না জুঁই? টেম্পো বাস মিনি বাস। আসছে শনিবারের পরের শনিবার এসো না আমাদের বাড়িতে! বন্ধ আছে। আমার অন্ধ মা আছেন।

—কখন যাবো নিরঞ্জন?

ইন্সপেক্টর বৈদ্যের দুই কান এখন এক ঝটকায় লাল হয়ে গেল। পতিত হল সে। আর কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না। প্রায় জোর করে, হাত কাঁপছে তবু, একটা সিগারেট গুঁজে দিল ঠোঁটে।

— শাণিতের বিষয়ে তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। বাড়ি যেও।

— না, যা বলার এখানেই বলতে হবে। কোথাও গিয়ে শুধু কথা বলে সময় নষ্ট করলে আমার ক্ষতি।

—চুপ কর মাগী, চুপ কর। তোর ভাই একটা অস্ত্র চোরাচালানকারী, ওকে ধরতেই হবে।

—এই কী চেহারা নিরঞ্জনদা?

—তুই তো একটা পুরোদস্তুর মাগী!

—ওরে দাদারে, শিয়াল কুত্তাগুলিরে দেইখ্যা যা—তোর কী অস্ত্রশস্ত্র আছে—সব লইয়া আয়—কোন্ শালায় আমরারে কিতা করে দেখি—

নিরঞ্জনের হাতের লাঠি এবার চাবুক হয়ে সাঁই সাঁই শব্দ তুলতে লাগল। আরো অবাক হল জুঁই। সত্যিই মেয়েমানুষ ছাড়াও পুরুষের আরো অনেক কিছু চাওয়া পাওয়া থাকতেই পারে। আর এটাও তো ঠিক যে হাজার বছর ধরে হাতে পায়ের নখ কেটে চলেছে মানুষ, তবু বিবর্তনের কোন লক্ষণই নেই।

জুঁই কাঁদতে থাকলে নাকের চেয়ে মুখে শব্দ হয় বেশী, আর হাত মুখ সবই ভরে যায়—দাদারে—

—স্টপ ইট। সেদিন বিকেলেই যাচ্ছ তাহলে! মনে থাকে যেনো। নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়, হাতঘড়ি দেখে—আটটা বাজে।

এখন ঘরময় শুধু সিগারেট কুচি আর সন্দেহের ধোঁয়া। আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী ঘরের ভিতর থেকে অতসীর পিছু পিছু দিব্যেন্দুবাবুও পড়িমরি করে ছুটে আসেন। আর কোন কথাই শুনবেন না অতসী, তোর আত্মসম্মানের নিকুচি করেছে—ফাজিল মেয়ে। 'বাবারে' আর্তনাদ করেই নিরঞ্জনের দুই পা জড়িয়ে ধরলেন দুইজনে। আমাদের অন্তত একটি কথা বলে যাও গো বাবা—শানুটারে তোমরা কবে কোনখানে দেখেছিলে বল?

আর এই পৃথিবী যে কত বিচিত্র জায়গা দেখা গেল নিরঞ্জন বৈদ্যের মত পশুও বিব্রত হয়ে পড়ে। প্রায় জোর করেই সে হাতগুলি সরিয়ে দিল — এ কী! একী করেন মাসীমা! তারপর জুঁইকে দেখল—যেন নিরঞ্জনই বন্দী হয়ে পড়েছে এখন, কিছু সাহায্য চাইছে না কোনো, তার মুখ নেই।

তাই হাতের ডাইরী খুলতে খুলতে একবার সে আফসোস করল—বেআইনী কাজ তবুও বলছি—২৭শে জুন গভীর রাতে পঙ্কজ তলাপাত্রের কোয়ার্টারে শেষবার শাণিত সেনগুপ্তকে দেখা গিয়েছিল।

তারপর ওদের নিষ্ক্রমণ আর কেউ লক্ষ্য করেনি। এমনকি শমাই লস্করও টিপ্পনি কাটেনি কোনো।

তিন

একরাতে খুব জ্যোৎস্না ছিল। কোন কোন পূর্ণিমাতেও এত প্রকট পরের আলো থাকে না। আজ এতই স্বচ্ছ যে কিছুটা শুভ্রও হবে। তারাগুলো পড়তে পড়তে মিলিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, তবু তারাবাতি অনুভব করা যাচ্ছিল আপন শরীরে।

ঊনসত্তর সাল। শিলচর শহরের একরাত জ্যোৎস্না। আমি তখন কাকার বাসায় থেকে জি সি কলেজে পড়াশুনা করি। গ্রীষ্ম বর্ষাগুলি শেষ হয়েছে সবে। তখনও শরৎ পড়েনি। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে যাবতীয় দৃশ্য জ্যোৎস্না রাত্রিতে লীন। সমস্ত শব্দ গন্ধ স্পর্শ বাতাসে আশ্রয় করে আসে। আমি তার কিছুই গ্রহণ করতে পারিনা।আমার হাত পা শেকলে বাধা। আশ্রয়দাতা ও আমি। প্রতি রাতেই সদরে তালা দিয়ে ঘুমাতে যেতে হবে কাঠের দোতলায়। আমার পদশব্দ যে নীচের তলায় অন্নদাতাদের স্বস্তি যোগায় আমি জানি।

তবু গড়িমসি করছিলাম। জ্যোৎস্না দেখছি আর ভাবছি—এই চোখগুলি কেবল সত্য। বড় বড় দুইটা পাতা আকাশে আর জ্যোৎস্না, আমরা কত কাছাকাছি আছি। কত সুখে আছি। আমার শরীর যা শুয়ে আছে এখন, তাও জ্যোৎস্নায়। আর কোন দুঃখ টুঃখ নেই।

তবু নোনা জলের সঙ্গে বেহায়া কিছু ফেনা আসে। না চাইলেও আসে। প্রথম কড়িটাই বালুচরে আটকে যায়। স্বভাবে আড়ষ্ঠ। অথচ কি না চাই আমি? সব ইচ্ছাই পুরোপুরি আছে আমার। কোন কোন দিন স্নানের আগে তার থাক্ থাক্ চুল দেখতাম। কোমর ছাড়িয়ে আরো নিচে জট খোলে চিরুনি। তারপর তো নদী অনায়াসে ঢেউ তুলে একের পর আরেক। এষার ঠোঁটে চুইতে থাকে হাসি। এবং সে যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেছনে চুল আচড়ায় তখন জোয়াড়ের নদী সামনে ফুলে ফেপে উঠে।

এষাকে দেখলেও তোমার মনে হবে প্রকৃতির অপর নাম রহস্য। শুধু হাসি ঠাট্টা করে। এমনকি তার অকারণ কেঁদে ফেলা ইত্যাদিকেও প্রেম অনুমান করতে পারতাম আমি কলেজে পড়ুয়া ছেলে। আমার হাত পা তুমি কোন শেকলে বেঁধে রেখেছো গো মা? সবই ভিতরে ঢুকে যায় এমন কি দুঃস্বপ্ন পর্যন্ত। তাহলে কি বাকী রইল আর? কোন ইচ্ছা? এটা কোন শক্তিই নয়।যাচ্না বললেই বোধ হয় ঠিক হবে।

আমি চাই এষা, তুমি একটা চুমু খাও আমাকে। এই আকাশের নীচে শুয়ে আছি ভাই, সবুজ মাঠে, বনুয়া গন্ধের সংগে তোমার চুল তাবুর গন্ধ এবার একাকার হয়ে যাক্।

এষা আমার ডাক শুনেছিল। সে তো শান্তনুর ছোট বোন। মাত্র কয়কদম তার হিল জুতার শব্দ শুনেছিলাম। তারপরেই সজারু, একেবারেই লাটটু হয়ে গেলাম আমি।আড়ষ্টতার কাঁটাগুলিও তীক্ষ্ণ। দুইটা চোরা চোখ ছিল। আর শরীরের চারপাশে আমার কাচের দেওয়াল আবিষ্কার করলাম একটা। তাতে এষার কপাল নাকের ডগা বুক — জোকের মত সবকিছু লেপটে যাচ্ছে এখন। এবং লিপষ্টিকের ব্যবহার নেই। ফলে চিহ্ন পড়েই আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল।

এতক্ষণ আকাশের কোনায় কোনায় যে মেঘ জমেছিল আমি খেয়াল করিনি। করতেও চাই না। যতটুকু দেখতে পাচ্ছি সবই হল স্মৃতি সত্তা এবং ওরা নখদন্তহীন। সবই কৃতকর্মের পোষা স্বপ্ন। দুঃখগুলিও যেন রঙিন কাচ কাচ শব্দ করে। করুক। সঙ্গে জ্যোৎস্নাও খা খা করছে। সাথে প্রজাপতি ও তার ফাৎনাগুলির আঁধার উড়াউড়ি করে নিঃশব্দে। এমন যে অলৌকিক জ্যোৎস্না তারমধ্যে কি আমার মা বাবা আর জুঁইয়ের কথা মনে হওয়া বারণ? কিন্তু পরীরা মানুষের কথা শুনবে কেন? ওরা করিমগঞ্জ থেকে উড়তে উড়তে আসে।আমার কী করার আছে বল? আমি কি ঐ—জ্যোৎস্নাথেকো মেঘগুলোকে এখন আটকে রাখতেপারি? নাকি ওরাই আমার মা বাবা জুঁই?

আমি ঘামছি। এষা কি জানে কেন শিলচরে এসেছি আমি? নাকি আমার বন্ধু বিমল শ্যামলেরা জানে? না মনে হয়। কাক পক্ষীটিও নয়। এখানে আসার সময় একটি মাত্র আকর্ষণ ছিল আমার

চৌদ্দ নম্বর। খাঁটি বাংলায় যাকে পতিতালয় বলে । কাছাড়ে এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থল আছে, যেখানে গেলে আমি নিশ্চয়ই তারে পাব, আরেকটি কমলারঙের বলয়। কে সে? সে কে? — জানি না যাও ! এষার সংগে এবার অভিমান করে ফেলি। আবার কী বিশ্রী অবস্থা দেখ আকাশের। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে তুমি চোখে আর মনে যে একটু কিছু খাবে—তারও জো নেই। কালো কালো ধূয়ার জাল ছড়িয়ে পড়েছে। খানে খানে ছেঁড়া, তার ফাঁকে যতটা মাছরঙ জ্যোৎস্না কেবল।

'নষ্ট' কথাটাকে আমি খুব গুরুত্ব দিই। নষ্ট চরিত্র বা চাঁদ বললেই আমারা পচা আলু আর শশার কথা মনে পড়ে। আমার সঞ্চয়ী মায়ের হাঁসের ডিম তরিতরকারি প্রায়ই পচে যেত। মফঃস্বল শহরগুলিরও তেমনি নানা জাতের দুঃখ থাকে আর থাকে সম্মিলিত স্বপ্ন। আমাদের করিমগঞ্জ শহরকে কাবু করেছিল আসলে ছিল জুয়া খেলা। সিঁড়ির পর সিঁড়ি এখানে শুধু জুয়া খেলতে দেখেছি আমি। এমন কি বিশিষ্ট নাগরিকরাও কমলা খেলেন। শীতের দিনের উমলি রোদে ফরাস পেতে বসে যে যার ফল রাখলেন যেখানে ছায়া পড়ে না, গণদেবতারা সমস্বরে হায় হায় করতে লাগলেন। আয় মাছি আয়। হঠাৎ মক্ষীরাণী যার নির্লোম ফলে এসে বসল তিনিই ভাগ্যবান। কমলার বাগান যাকে বলে। ঝুরি ঝুরি পড়তে লাগল পায়ের কাছে। ঠোঁটের কোনে তার হাসির অর্থ যাই হউক না কেন এইমাত্র কমলার আকৃতি নিয়েই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চোখগুলি। আসলে মহাশয়ের বাড়ির লোক ও স্তাবকেরাই যেন মাছি।

একসময় সিঁড়ি নামতে নামতে আমি কুশিয়ারার জলে স্থির মুখ দেখলাম, সদ্য গোঁফ উঠেছে, কয়েকটা ব্রণ এবং হাতে পায়ের লোমকূপগুলি বড় বেশী নজর কাড়ে। বার বার চুল এসে পড়ে কপালে। দু'একটি এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে যে কথা শোনে না। তাছাড়া দুইটা হাফ প্যান্টই তখন আমার বড় শত্রু । আর জাহাজের খালাসীরা বন্ধু ছিল, তাস খেলার শিক্ষাগুরু। সেই বাচিত মিঞার কিন্তু একটাই দোষ, সে ছোটদের নুনু ধরে সবসময় ঠাট্টা ইয়ার্কি মারে। তিন তাস, রামি এই খেলাগুলি খেলতাম আমরা । প্রথমে একটা দুইটা করে পড়ার বই বিক্রী করতে শুরু করলাম।

তাছাড়া আমার বন্ধুরা সবাই পরিবারের বাজার সরকার ছিল। তাদের মায়ের কাছেও অনেক পয়সা। কেবল চয়নের পড়ার বই বা খেলার কিছু ছিল না। সে প্রতি বোর্ড থেকে চার আনা তুলে চা চানাচুর খাওয়াত আমাদের। যেমন আমার মা। হাঁসের ডিম বিক্রি করে ভাড়া করা সাইকেল চড়া শেখাত। ঘন্টায় চার আনা। কিন্তু ছোটবেলায় স্কুলে যেতে চাইতাম না কিছুতেই, আরেকটা লাল প্লাষ্টিকের চুড়ি আমার কানগুলিকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত নীলমণি নিম্নবুনিয়াদী পাঠশালার মাষ্টারমশায়ের কাছে। তিনি অবশ্য কানে ঘা দেখলে আর ধরতে চাইতেন না। তার পাঞ্জাবীর হাতলে একজোড়া জালিবেত থাকত সবসময় । আমার পকেটেও স্লেট মোছার ডে-ফল। সারাক্ষণ আমি ঐ ডে ফলগুলি ধরে বসে থাকতাম। তবু জ্বালা করে। ছুটির পরে সন্ধ্যায় চিত্রবাণী সিনেমা হলের সামনে যে টুনটুনওয়ালা বসে আসলে সে-ই কিনত আমার বইগুলি। আর বাদাম বিচি খেতে খেতে আমি গান শুনতাম—নিলামওয়ালা ছয় আনা।

একটা কথা বলি, অনেকেই বলে, আমিও বলি—জুয়া খেলাটা কিন্তু আমার কাছে কোন লাভালাভের ব্যাপার নয়। কেমন জানি বিচ্ছিন্নতার ভয় কাজ করত সবসময়। কারণ অমিয় পরেশ ওদেরে দেখেছি গুলতি দিয়ে উড়ুত ফুরুৎ পাখি মারতে পারে। ওদের মুখমণ্ডলও সুন্দর ছিল। তবু এগার জনের টিমে বার বার বাদ পড়ে যায়। আলাদা ঝুলন পূজা করে। আর আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম ঘাটের শেওলা তুলে ওরা কিভাবে পাহাড় বানায়। তখন বন্ধুরা আমার, নাইলন ডেক্রনের সার্ট, কর্ডের প্যান্ট আর কাবুলি জুতা খুব পছন্দ করত। তবু বন্ধুত্ব অটুট ছিল। আমার মত একেকজন থাকেই,মধ্যস্থতাকারী, হাত বাড়ালেই আছি এবং আলাদা আলাদাভাবে বন্ধুদের সমালোচনা করেও সুখ আছে আমার সঙ্গে।

সে যাইহোক, তাস খেলায় অন্ততঃ একটা হাত আমার চাই। বৃত্তের বাইরে কিছুতেই ছিটকে যাব না আমি । নির্মল অঞ্জনদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল — ওরা পুরনো লোক। নন্দনের দাদু

তারাভূষণবাবুর নামে এখনও একটা রাস্তা আছে।আমাদের সময় করিমগঞ্জ শহরে সাহা সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। কোন ভেদাভেদ নয়। অন্তত রমণ রায় প্রণব ওদেরে এনিয়ে কথা বলতে শুনিনি। শুধু বামুনবাড়ির ভোজে রঞ্জিতের চোখে মুখে একটা ডেমকেয়ার ভাব লক্ষ্য করতাম।

আরেকটা কথা প্রচারের খুব চেষ্টা করতাম আমি — অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশী বিষয় আশয়। কেউই বিশ্বাস করত না মনে হয়। তবু এক কথা বারবার উচ্চারণে কি কোন প্রতিক্রিয়া হয়? তার উপর যদি বংশ, পদবী ইত্যাদি কুলীন হয়?

— আর কইছ না বেটা, গাঙ পাইরইয়া তোরা সবউ কাউস্থ আর বৈদ্য। লঙ্গাই কুশিয়ারা যে আমাদের মা মাসির মত—এটা সত্যি কথা। ওপারে পাকিস্তান, ভোরের আজান, ফল্গু মিঞা, আখতার মাঝিকে কে না চেনে? — হ্ইই রকিব আলি, কই যাছগিবে তুই? জলের নিশি ডাকে, ভাটিয়ালি।

আরো অনেক দূরে দূরে কে—উজান যায় ? কে আলাবিলি করে রে?

অর্থাৎ তুমি যেদিকেই যাবে-পুরো কাছাড় জেলাতে হিন্দু মুসলমানের বাস । শহরে আমরা আর ওরা গ্রামে থাকে । মইনউদ্দিন একবার জাহাজে উঠে দুনিয়া দেখতে চাইল। বলল তুই আমাদের গাইড হ। আমাদের বলতে ? আর ফতেমা। বয়স কত হবে তার? কত আর দশ। তার উপর বোরখা আছে। চোখে জাল। আমি তার কব্জি থেকে হাতের আঙুলগুলি দেখছিলাম-কচি কলাপাতা রঙের। শিশু হরিণের চোখ যেন মায়াদরী। আমি বললাম - মইন, জাহাজে খালসীরা থাকে জানিস তো। দেশ বিদেশ ঘুরে ঘুরে ওদের চোখ মুখ এখন আর সুন্দর না। রাতজাগা পশু পাখির মত। মইন শব্দ করে হেসে উঠল, বলল—খালাসী বাচিতের দাওয়াত পেয়েইতো এসেছি রে! সঙ্গে সঙ্গে আমারও নামাজ পড়ার ইচ্ছে হল। আল্লাতাল্লার কাছে দোয়া চাইলাম আমি ফতেমার জন্যে ।

এই বাচিত ভাইয়ের কাছেই জুয়া খেলা শিখেছি। আঙুল খেলা। তর্জনী আর মধ্যমা নাচায়। ধর দেখি বেটা। তারপর মুঠো খুলে প্রতিবারই একটা বুড়ো আঙুল দেখি বিদ্রুপ করে। এভাবেই সে আমার তামাকাঁসার বাসনগুলি গায়েব করেছিল। আরেকদিন বাড়ি থেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। আর মজার ব্যাপার সেদিন খেলার জন্যে যাইনি, বাচিতের ঋণ মারব, আমার হাতে তো কাঁসার থালা আছে একটা ব্যাগের মধ্যে। জাহাজের সিঁড়িতে পা রাখার ঠিক আগে কি জানি কি, পেছন ফিরে দেখি দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত। ফেরার পথে আমরা কোন কথা বলিনি, শুধু হাতের ব্যাগটাকে ভীষণ ভারি মনে হল।তখন আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।

করিমগঞ্জ কলেজে এ্যাডমিশন নিয়ে নির্বাচনের মুখে পড়লাম। একদিকে সংহতি—গণতন্ত্রী। আরেকদিকে সংস্থা — ওরা বামপন্থী। এর আগে কাছাড়ের লোকজনকে রাজনীতি সচেতন মনে হয়নি আমার। এখানে নেতাদেরই জমিদারী চলে।ওরা দল পাল্টালে আমরাও পাল্টে যেতাম।

কলেজ মজলিশে দেখলাম লাজুক ছেলেদের একটা মূল্য আছে । এতে মেয়েদের ভোট পাওয়া যায় । আর পালাবার আগেই লোকেশ উদাত্ত ওরা ধরে ফেলল। অবশ্য ছেলে দুইটা আগুনের লুকা। পড়াশুনা, খেলাধূলা, প্রেম, মাস্তানী সবকিছুতেই ওরা আছে।

একদিন তো প্ল্যাটফর্ম-লেকচার দিতে উঠে আমি নিজের নামই ভুলে গেলাম। নিচে একই মাপের সাতটা তক্তা দেখছি। উদাত্তই বাঁচিয়ে দিল আমাকে। বলল- হাতজোড় কর, যা বলবার আমরাই বলব। অথচ তাস খেলার আসরে কত স্বতঃস্ফূর্ত আমি। শানিত সেনগুপ্ত কি কখনও শো দেয়!

এক একটা জাহাজ যখন আসে, তার নোঙর করা থেকে মাল খালাস, মাল বোঝাই শেষে নোঙর তোলা পর্যন্ত প্রায় দুইমাস সময় লেগে যেত। আর আমরা বাচিতের পরে হাবিব, টেণ্ডনের পরে থাম্পি, অনেক বন্ধুকে পেয়েছি। কিন্তু কারগো শিপগুলি বেয়াড়া প্রকৃতির ছিল — বন্ধুত্ব চাইত না। তখন তাস খেলার জায়গা নিয়ে আমরা মুশকিলে পড়তাম। গুদাম ঘরগুলির খালি

জায়গায় খেলা অসম্ভব— চামড়া চর্বির গন্ধ। তাছাড়া মেঝেটাও গুড় চিটার মতই চটচট করে। তাহলে গুদামের বাইরে চিপা চাপায় দুই দেয়ালের মাঝে মাকড়সা, পচা পাতা আর কথায় কথায় মশা ঢুকে পড়ে। হঠাৎ মনে পড়ে — মুটেদের ভাণ্ডারী আক্কল ভাইও আমাদের সঙ্গে খেলতে চাইত। তাদের লম্বা ঘরে তো অনেকগুলি বাঁশের মাচা। তাছাড়া কুশিয়ারা নদী সাঁতরে পার হয়ে গেছি আমরা। বিশ্বাস করা না করা তোমাদের কাছে। পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী, আনসার সবাই আমাদের চিনত। বন্দুক উচিয়ে হাসিঠাট্টাও করত মাঝে মাঝে। তারপর নদীর পাড়ে বসে মেঘনা বিড়ি, রমনা, শসা, খিরা খেয়ে গোল হয়ে তাস খেলতাম আমরা।

আরো ছোট থাকতে দাদু আমাকে মাঝে মাঝে বোলপুরে পাঠিয়ে দেয়ার ভয় দেখাত। দাদুর বালিশের নিচে পঞ্জিকা, একটা দুইটা ঘোড়া দেশলাই আর রুমালে বাঁধা অনেকগুলি তামার এক পয়সা তাক তাক করা থাকে। ঠিক দুপুরবেলা যখন তার নাক ডাকতো তখন বাইরে পালা করে ডুগডুগিওয়ালা হাঁক পাড়ে তুলা লজেন্স। তেমনি আজও ভিতরে ভিতরে আমি অস্থির। আমরা বসে ভাত খাচ্ছিলাম। দেখছিলাম মাছের কাঁটা কত সুন্দরভাবে চিবোতে পারে। একেবারে চেটেপুটে খায় বাবা, তারপর বড় গ্লাসে এক গ্লাস জল, একটা বা দুইটা ঢেকুর। একটুখানি হাসি দিয়ে বলে—তৈরী হয়েনে, শিলচর যাব। এতে আমার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এখন মনে নেই। তবে দুষ্টু বেড়ালটা বলেছিল—দাদা, তোর মাথা দিয়ে কয়লা পোড়া ধুঁয়া উড়ছে দেখ।

তারপর আমি সত্যি দেখলাম—রেলগাড়িটা পুঁ ঝিক্ ঝিক্ চলতে শুরু করেছে। তখনও সান্‌টিং পয়েন্ট পার হয়নি। মাঝখানে একটা কথা বলে রাখি—আমাদের বাসা থেকে রেলষ্টেশন অনেক দূরের পথ। তবু বন্ধুরা মিলে চলে আসতাম সানটিং এর লোভে। ফলে আজও ভাবলাম লেভেল ক্রসিং পার হতে হবে না। কিন্তু না। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে যেই দেখতে গেছি, কয়টা কয়লাকুচি এসে পড়ল আমার চোখে। প্রথমে হাত দেইনি,তবে আর সহ্য হচ্ছে না - রগড়াতে শুরু করলাম। তখনও কুশিয়ারা নদী আমার শরীর প্যাচিয়ে রেখেছে। এবার বরাকের দিকে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে শুশুক ভোস করে উঠলেই মনে হত আরো কিছু সময় তলিযে যাওয়া যাবে। নীলমণি স্কুলের মাঠে আমার শৈশব তার কোন কোণায় কতটা জল জমে আমি জানি। কচুরি পানার ফুলও কানের চিপায় রেখে ধেই ধেই নাচতে থাকলে ধুতরার নেশা হত। আর সমতলি মনে হত না নিজেকে-এটাও একটা কথা। ব্রজের রাখাল নয়— কুশিয়ারার জলই বেশি আকর্ষণ করত। খালাসীদের উদ নদীর মাছ সবই 'ডেকে' নিয়ে গিয়ে তুলতো। এবং পরী সত্যি সত্যি আমাদের পাড়ার একজন দাদার নাম ছিল। এক এক করে এভাবেই ষ্টেশনগুলি পাব হতে থাকলে আমি করিমগঞ্জের রথ, চরক আর বারুণির মেলা শেষ করে এইবার জানলা দিয়ে বাইরে দেখি দূরে রোদ, ছায়াগুলি শুধু ঝিক্ ঝিক্ ছুটছে।

শিলচর ষ্টেশনে নেমে অনেকগুলি রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। কেউ যাবেনা। এইতো মজা শিলচরের। চা বাগানের মালিক ম্যানেজারের আড্ডাখানায় আস্তে আস্তে দেখি শীতের রোদ। আমার এখানেই বেশী ভাল লাগছে আর জি সি কলেজ।

আজ জ্যোৎস্না দিয়ে যে রাত শুরু হয়েছে এখন মেঘলা। তবে সচল মেঘ। অপেক্ষা করতেই হবে। মাঝে মাঝে বর্শাফলকগুলি শুধু ঠেলা দিচ্ছিল, তোমার দিকেই তো চেয়ে আছি হে আকাশ! তুমি স্বার্থপর। তারপর ভাবলাম গেইটে তালা দিয়ে এবার ঘুমানো দরকার। লুনাটিক শব্দটি ভীষণ পীড়া দিচ্ছে।

হঠাৎ আমার কাঠের সিঁড়ি ভেঙে কে বা কারা উপরে উঠে আসছে। 'আমার' বললাম এই কারণে যে পাঁজরগুলিতে ভীষণ ব্যাথা। একমাত্র কলম ছাড়া কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। তাই শুয়ে শুয়ে যেমন আকাশ দেখছি —সেভাবেই থাকি বালিশ চেপে। ওরা ভিতরে ঢুকে আর দেরী করে না — আমার মুখ চেপে ধরে। যদিও অত জোরে ধরার কি দরকার ? কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে— উদাত্ত লোকেশ। এইবার আমি রেগে গেলাম— ছাড়ু ছাড়। তারপর চাবি নিয়ে নিচে নেমে

যাচ্ছিলাম তালা লাগাতে। আবার মনে হল সৌজন্যবোধের কি অভাব হচ্ছে ? হঠাৎ লোকেশ আমার হাত ধরে হ্যাচ্‌কা টান দিল । আমি পেছন ফিরে হুমড়ি খেয়ে দেখলাম পিস্তল । অটোমেটিকেলি ভয়ার্ত হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে। উদাত্ত লোকেশের ঠোঁটের কোণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম । বিশ্বস্ততার হাসি হাসলাম । একসময় রাগ করেই তার হাত ছাড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিলাম গটগট করে । কিন্তু গেইটের কাছে পৌঁছেই মুখ টিপে হেসে নিলাম । জানি তো ওরা আমাকে মারবে না। কিন্তু কেন এসেছে? উপরে উঠে আবার বললাম—এ্যাই, তোরা আস্তে আস্তে কথা বল, কাঠের দোতলা, নীচে সব শোনা যায় । কিন্তু ধুম করে কথা বন্ধ করে দিলে বরং বেশি অস্বস্তি হয় । এখন বুঝতে পারছি । আমি লোক দুটোকে ভাল করে দেখছিলাম । দাড়িমোচে গিজ গিজ করছে । চারটি চোখই গর্তের ভিতর এলোপাথারি জ্বলছিল । লোকেশ আবারও আমার হাত ধরে টান দিল, তবে বন্ধুর মত । বলল একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই । আমি নিরুত্তর থেকে প্রশ্ন করি—কি কাজ ? সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত তার প্যান্টের পকেট থেকে দুই বাণ্ডিল টাকা বের করে আনল । বালিশের কিনার থেকে কাগজ কলম তুলে খস্ খস্ করে ঠিকানা লিখল দুইটা । —কিছুই বলতে হবে না । পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দিয়ে দিস ।

—তোরা কি নকশাল করিস ?

যেন যন্ত্র, উদাত্ত পিস্তল তুলেই নিজের ঠোঁট ছুয়ে চুপ ইঙ্গিত করল । আমিই বরং বেশি অসহিষ্ণু, কেবল উসখুশ করছি— টাকা না দিলে তোরা কি করবি ?

কোটরে মোমবাতির এলোপাথারি আলোগুলি হঠাৎই স্থির হয়ে গেল । আমার মনে হল—ওদের যন্ত্রগুলির মুখ চুঁইয়েও চোরা ধূঁয়া উড়ছে । কিছুক্ষণ পরে দুইজনই হেসে উঠল । তোকে আমরা চিনি, তুই আমাদের বন্ধু ।

ওরা ভোরের আলো চিনে পাখির ডাক শোনে । তারপর পা টিপে টিপে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল ।

তবে আমারও কিছু নিজস্ব বাতাস ওরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বলে, মাসে মাসে যখনই মা বাবার কাছে করিমগঞ্জে গেছি, উদাত্ত লোকেশের খবর করেছি আমি, পাইনি । তারপর উনিশশো সত্তর সাল, ফাইন্যালি শিলচরের পাট শেষ করে ফিরে আসি । ততদিনে রীতিমত একজন টেনশনের রোগী বনে গেছি । উদাত্তদের কথামত একটা ঠিকানা বহুদূর চষে বেড়িয়েছি আমি—সেই ভদ্রলোক নাকি সকাল বেলা বাজারে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেন নি । আমাদের দু'জনেরই ইংরেজী আদ্য অক্ষরগুলি এস এস জি । ওদের খুঁজতে খুঁজতেই একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম । আমার কাছে তাদের দশ হাজার টাকা আছে বা টাকাগুলি লোকেশ উদাত্তদের বা হাত ফসকে ক্রমাগত খরচ হয়ে যাচ্ছে । যদিও আমি জানি মায়ের ট্রাঙ্কে আমার ছেলেবেলার হাতপাটা, একজোড়া কানের দুল ও শেষমেষ ছয়গাছা চুরিও তুলে রেখে দিয়েছে মা । ভালই হয়েছে—যা দিনকাল । সবাই ইমিটেশন ব্যবহার করে । জুঁইও পড়ে ! 'ওকে মানিয়েছে ভাল' —এ জিনিসটা যেন আমাকে কোন না কোন ভাবে আঘাত করছিল—আমি এর অর্থ খুঁজে পাইনি ।

শিলচর ছেড়ে আসার পর এখন আমার অন্য পরিচয় । একজন বেকার । এই শব্দটার অর্থ এবার বুঝতে পারলাম । প্রথম প্রথম প্রেমের মতই ফুল ফোটে, আর পড়াশুনা করতে হবে না, দিনের বেলা চান খাওয়া শেষে ঘুমের ইচ্ছা হয় । বেশ তো । দিবাস্বপ্নগুলিতে সাধারণত ভয়ের কিছু থাকেনা । একদিন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম কাঠের দোতলা আর সিঁড়ি ভেঙে কারা উপরে উঠে আসছে ।

এইভাবে ক্রমশ একা হয়ে গেলাম আমি । এখন আর বন্ধুরা একসঙ্গে বসে আড্ডা হয় না—কারো টিউশানি, কারো কী কী যেন থাকে । তাছাড়া বাড়িঘরেও আছি আছি নাই নাই এমন একটা গা সহা ভাব সবার মধ্যে । আমার ফিরতে দেরী হলে ইদানীং রাতের খাবার থালা চাপা দিয়ে ঢেকে রেখে দেয় মা । —মা-গো, তুমি কেন এরকম কর ?

যারা কাছাড়ে থাকে তারা জানে—রাজ্য সরকারী চাকরী পাওয়া কত কঠিন ব্যাপার, এখানে কলকারখানাও নেই। তাছাড়া উদাস্ত লোকেশের টাকা—পুরোটা হাত খরচ করে ফেলেছি আমি। তাই এখন কেবলি অপেক্ষা যমরূপী বন্ধু নাকি বন্ধুরূপী যম! রাতে ঘুম হয় না ভাল কথা, কিন্তু সঙ্গে উৎকর্ন রোগ হয়েছে। পাওয়ার বেড়ে গেছে কানের। ছোট মোট আওয়াজ শুনতে শুনতে একদিন হঠাৎ যুদ্ধ শুনলাম পাকিস্থানের সঙ্গে।

জয় বাংলা, ততদিনে বাবার ব্যবসা লাটে উঠেছে। চারিদিকে অভাব আর অভাব। মানুষ তার মুখের গ্রাস জোগাড় করবে নাকি খাতা কাগজ কিনবে। মা বলে— কি করবে সবই কপাল, ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাও। আমি বুঝি না কি ভেঙ্গে ভেঙ্গে। জিনিসপত্রের দামই এখন আলোচ্য বিষয়। বন্যার সময় যে ভাবে বিপদ সীমার উপরে কত—সেটাই প্রশ্ন করা হয়। রেশন দোকান খোলা বন্ধ সমান—মাল নেই। একটুখানি জায়গা পেলেই রিফিউজি গুজে দেয়া হচ্ছে। করিমগঞ্জের লোকসংখ্যা বেড়ে তিনগুণ আর কোনদিনই যা ছিল না এখানে —মেয়েদের উৎপাত শুরু হল। ক্যাম্প পালিয়ে বাড়িঘর ভরে গেল। অত্যাচারের গল্প শুনে তবু কেটে গেল কয়দিন। তারপর মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকলে যেখানে সেখানে কবর চিতা ও কান্নার রোল উঠে। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপে যে তার নেইকো শেষ—

শালা কাছাড় জেলাটা যেন সতীনের পুত। কোন কাজ হয় না এখানে। যদি বা ছিটে ফোটা কিছু আসে—মাত্র কয়েকজন লোকে লুটে পুটে খেয়ে ফেলে সব। রাস্তাঘাট দেখলে মনে হবে—শতাব্দী পুরনো কোন জনপদ বোধ হয়।

এবং মাতৃভাষা বাংলা হলে দোষের কি হল? উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙ্গালীরা তো দাঙ্গাপীড়িত। আমাদের জন্য নূতন নূতন আইনও ভাবা হচ্ছে। এখন আর ইচ্ছে মত জমি কেনা বেচা যাবে না, সন্ অফ দি স্য়েল কথাটার অর্থ কি! দালাই লামার তিব্বতীরা দেখছি আমাদের চেয়ে ভাল। তাহলে কোথায় গেলে তোমায় পাব হে স্বদেশ?

দেখতে দেখতে উনিশশো তিয়াত্তর সাল। আমি তখন সকাল বিকাল টিউশনি করি। এপ্রিল মাসের মরা সময় খরা সময় এক দুপুরে বঙ্কদার দোকানে বসে আড্ডা মারছিলাম। হঠাৎই জুঁই দৌড়ে দৌড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে শিমুলদার চায়ের কাপই উল্টে দিল। ছিটা পড়ল গিয়ে চান্দুদা, নীলেন্দুদা আর নিধুদার সার্টে প্যান্টে। সেও উল্টেমুল্টে পড়ার আগেই আমি ধরে ফেল্লাম।

—কি হয়েছে?

—রেজিষ্টারি চিঠি। দাদা তোর চাকরি হয়েছে—এ জি অপিসে, অডিটার।

—কই দেখি?

—বাবার কাছে আছে।

আমার হাতে এখন যেন ডানা লাগিয়ে দিয়েছে কেউ পালকময়। তবু আমি উড়ে যাচ্ছিলাম না। পেঁচার মতই বসেছিলাম একটা ডালে আর মুচকি মুচকি হাসছি। আমি যাচ্ছি না কারো কাছে, সবাই এসে আমার সঙ্গে দেখা করছে। মনে হচ্ছে শিবলিঙ্গে যেভাবে দুধ স্নান করিয়ে দেওয়া হয় সেভাবে আমাকেও। তারপর উপবাস ভাঙ্গাবে বলে থালা হাতে কে এসেছে? এষা নাকী? এই মুহূর্তে বড়বেশী প্রতিশোধস্পৃহা! আমি তার সোনার থালা থেকে শুধুই একটা আঙুর তুলে মুখে দিলাম। বাদবাকি সবই ফিরিয়ে দিয়ে এবার উড়ব। অথচ কাকাতুয়ার মতই যেন পা ভারি লাগছে। পেছন দিকে মা-বাবা আর জুঁইকে দেখলাম! তাদেরও চোখ দিয়ে ধূপকাঠির মত ধোঁয়া উড়ছে এখন। উপরে গোবিন্দপ্রসাদের ছবি। বুড়া আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

এমন যে কুরকুরি আনন্দ, তাও বেশি সময় স্থায়ী হল না। এ মাসের মধ্যেই আমাকে জয়েন করতে হবে। তাহলে দেরী করে কি লাভ? বরং ক্ষতি হতে পারে। আমি আজই রওয়ানা হব। সকাল থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছে না কেউ। মা এমনিতেই ভোরে ওঠে। গতরাতে ভাল ঘুম হয়নি। কি যে ভাবছিলাম মাথামুণ্ডু। সবই টুকরো টুকরো। মালা গাঁথাও যাবে না। শেষমেষ

বিছানা ছেড়ে উঠার আগে পম্পির কথা মনে আসে। কোন কারণ নেই। পাশের বাড়িতে থাকে। তাছাড়া আমার সাথে তুলনা হয় না। সাদা ডেক্রনের জামা পরে। ঘাড় পর্যন্ত চুল। কুমকুম বা নখ-পালিশ দেয় না। জুঁই দেয়। কোনদিন যদি পথেঘাটে দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে — মেয়েটা কি অন্ধ ? সব সময় নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন ? বৃষ্টিভেজা কাঁচা আম কুড়ানোর মত মন ভরে উঠত আমার। চোখ তুলে তাকালেই তো সে আমাকে দেখতে পারে!

স্নান সেরে, মায়ের শুকনো কাপড়ও কিছু কিছু ভিজেছে, লক্ষ্মীরে দিল। না আঁচড়ানিং চুলগুলি ঘোমটা ফেলে বেরিয়ে পড়েছিল এদিক ওদিক। লালচে। গলার আঁচলে চাবির গোছা। ধূপ ধুনা আর ভোরের গন্ধ। ঘন্টার বদলে রিনিরিনি শব্দ হচ্ছিল। আমার দুই চোখ বোজা, তাই মুখের মধ্যে কাঁচা মুগ আর চিনি প্রসাদ দিল। বাবাও আজ বেরোয়নি। ট্রাঙ্ক খুলে দরকারী কাগজপত্র এক জায়গায় যোগাড়যন্ত্র করে রাখছিল। ঐতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখা যাচ্ছে। শেষে রুমালের গিট্রি খোলে। আমি দু'এক কদম এগিয়ে খাটের কোণায় বসলাম। প্রথমে ভাঙতিগুলো গুনলো। বাবা সব সময় ভাগ ভাগ করে পয়সা দেয়।

আজ হুটহাট পম্পিদের বাড়ি যাচ্ছে না জুঁই। আমি লক্ষ্য রাখছি। যত না কাজ করছে তার চাইতে বেশী ঘুর ঘুর করছে আমার চারপাশে। আমি একবারও চিমটি কাটিনি। তার দায়িত্ব হল সুটকেস গুছিয়ে দেয়া। একটা সাদা কাপড় কেটে মায়ের ফুল তোলা যে রুমালটা পছন্দ করতাম আমি, যার মধ্যে অনেক শিউলিফুল আছে, যা নিয়ে আমি আর জুঁই সবসময় ঝগড়া করি, এতদিন যেটা তার দখলেই ছিল, আজ লুকিয়ে লুকিয়ে বা দেখিয়ে দেখিয়ে আমার গেঞ্জীর ভাঁজে রেখে দিল।

দই ছিটিয়ে দিল মা। কানি আঙ্গুলে কামর দিল। থুথুর মত ফুঁ দিল মাথায়। তারপর আমি বাবাকেই প্রথম প্রণাম করলাম।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। জেনে শুনে আমার শার্ট প্যান্ট নোংরা হচ্ছে। মা মাথায় হাত রাখলে যে ঠাণ্ডা লাগে তালুতে—সেটাই সুখের। বড় হয়ে আজই প্রথম জুঁইকে আদর করলাম। চুমু খেলাম ওর মাথায়। বোকাটা কাঁদছে।

—তোমার দাদুকে প্রণাম করো।

এবার আমি গোবিন্দ প্রসাদকে নমো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকলাম কত সময়। যখন মনে হল আমিও সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু না, তখন সরে এলাম।

বাইরে এসে দেখি রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্টেশন রোডে গিয়ে আগরতলার ট্রাকে উঠব। ঠিক সন্ধ্যায় কথা আছে। ভোর ভোর সময় পৌঁছে যাব। মা কাঁদছে, বাবাও, জুঁইও। আর দেখা যায় না এমন সময় হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে কিছু বলল, জুঁই, নিশ্চয়ই রুমালের কথা হবে। নাকি পম্পির কোন কথা ?

চার

আমি এখন বাতাস কেটে কেটে যাচ্ছি তো কিনারের সব কিছুই দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছু বারান্দার আলো, কিছু ঘরের, কিছু কিছু রাস্তার। আবার 'দূর অচিনপুর মধুর' পাখিটা ডাকে। রাস্তা বাঁক ঘুরেই ঝপ্ করে পর্দা পড়ে গেল একটা। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রাক যাচ্ছে। ভিতরের আলো নিবিয়ে দিয়েছেন ড্রাইভার। অবশ্য এটা শিকারী মনোবৃত্তি। মাঝে মধ্যে তীব্র জঙ্গল চোখ গুলি আমাদের মুখ দেখে, ভুল মানুষ দেখে, গজ গজ করে পাশ কেটে যায়। ঘন্টা দেড়েক পরে পরে থামে। দু'একটা কুপির আলো। চুলাও জ্বলে। 'গরম চা' হাঁক পাড়ে না কেউ। বার বার ভুল হয়ে যায়— এই ষ্টেশনটার নাম কী? প্রতিবারই তারা হেসে উঠে। তারপর নূতন ভাবে শুরু করলাম, —এখন লংতরাই, এখন আঠারোমুড়া এইভাবে।

প্রথমবার আগরতলা যাচ্ছি দেখে আমাকেই ওরা জানালার পাশে বসতে দিল। আমিও মুচড়ে মুচড়েই বমি করছিলাম। তবু সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল না। একসময় তো সবই দেখতে পাচ্ছি আমি—আমার আঙুল কর-রেখা সব। বড়মুড়া পাহাড় থেকে এখন তর তর করে নেমে আসছি। তবে রাস্তার আলো মনে হয় আমাদের নয়। ভোর হয় হয়। রাতের পোকাগুলি এখন আবার হুল ফোটাচ্ছে চোখের পাতায়। বনবাদারের বাতাস। হাত পা যার যার ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু চোখগুলিকে টেনে খুলে ধরেছি। এই আলোতেই নাকি সে আগরগাছের তলায় থাকে। তাকে দেখতে চাই আমি।

চম্পকনগর থেকেই আমাদের ট্রাক নাক বরাবর ছুটছে। সামনে কোন প্রতিবন্ধক নেই। একজন ত্রিপুর দৈত্যের কথা মনে হল। বাবার কাছেও শুনেছি কালো বাঘ আর ধনেশ পাখির দেশ ত্রিপুরা। যার অর্থ-নাকি জলের কাছাকাছিও বুঝায়। যাই হউক এবার ছায়াতরুগুলি রাজকীয় অভিবাদন করে। আমরা কেউ কোন কথা বলছিলাম না কারণ সবাই গ্রহণে ব্যস্ত। ক্রমশ স্পেকট্রা ওয়াইড। সত্যি কোন গ্রীক নগরীর টানেই যেন ছুটে এসেছি। এই গোল চক্করটাই তাহলে মোটর স্ট্যান্ড হবে। আমি নেমে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আগরতইল্যা বাতাস আমাকে ঝেকে ধরল। এখানেও ভিক্ষুক আছে দেখি, নাকি হস্তাক্ষর চায়। বাতাসগুলোকে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে মনে হল পাহাড়ী বাঙ্গালী। এই পরিবেশে আমি নিজেকেই দেখছি। সস্তা সার্ট প্যান্ট। বাটার স্যান্ডেল। সঙ্গে ঝোলা ব্যাগ এবং সুটকেস্‌টা একসময় বাবার ছিল।

এখনও কেউ নেই। কুকুরগুলি কুন্ডুলী পাকিয়ে খানে খানে। দু'একটা রিক্সা আছে চালক নেই। কয়েকটা বাস ত্রিপাল গায়ে। তাদের সঙ্গেই জাতীয় মিষ্টান্ন ভান্ডারের সাইনবোর্ড কাঁপছে বা তার ঝুলগুলি। সব রাস্তাতেই সিগারেটকুচি আর বাদামের খোসা থাকে। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। একটু ভয়, কিছু অস্বস্তি। পরপর কয়টি হাই তুললাম। আবার ভাবি দুশ্চিন্তার কি আছে। পকেটে এপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং টাকা। বুকে ফুল বেলপাতার আশীর্বাদ।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে এলোপাথারি ঘুরলাম। দিনের প্রথম দোকান পাট খোলার শব্দ আমার ভাল লাগে। চা সিগারেটের ধোয়া, সিঙ্গাড়ার গন্ধ। দৈনিক পত্রিকার খস খস শব্দ। তারপর একখিলি পান। বাঃ ঠিকমত রোদ উঠেছে। এখনই এত রিক্সা লরী টেম্পো ট্যাক্সি। সারাদিন তো পড়েই রইল। আমি কামান চৌমুহনী ফলের দোকানগুলির সামনে দাঁড়ালাম। নাম দেখলাম ত্রিপুর হোটেল। খাওয়া দাওয়া কি বাঙ্গালীদের মতই হবে? তারপর হাত মুখ ধুয়ে একথাল মাছ ভাত খেয়ে নিলাম। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে দু'এক দানা মৌরি দাঁতে কাটছি— দেখলায়নি কত সস্তা!

আরেকটা খালি রিক্সা আমাকে দেখেই ব্রেক কষল। ইনিই তবে ত্রিপুরার আদিবাসী। লম্বাচওড়া,

মাঝবয়েসী খালি গা, প্রকৃতির উমে ফোটা একটা মুখ। আমি বললাম—দাদা অ আস্তাবল চৌমুহনী যাব এজি অপিসে। অনেকক্ষণ ধরেই এটাচিটা ভারি মনে হচ্ছে। বিছানা আনিনি কারণ আপাতত মামার বাড়িতে উঠব তবলা চৌমুহনী। হাত ঘড়ি দেখলাম। স্কুল ফাইন্যালের পরে কেনা, টাইমষ্টার, এখন থেকে তার ইস্তেমাল শুরু হবে । তবে আজকাল সবাই এইচ এম টি পরে।

এজি অপিসে ঢুকে আমি থ। কাটাখালের পাড়ে স্যাতস্যাতে গুদাম ঘর মনে হল আমার। পাহাড় পাহাড় সবই কাগজের বান্ডিল। উপরে ফ্যান ঘুরতে থাকলে কি হয় — ধূলার স্তর বাইরে যাবে না —ঘরের মধ্যেই ডানা ভারি পাখির মত উড়াউড়ি করে ।

আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে খুক-খুক করছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে হেসে উঠে। কোন বড়বাবু বোধহয়। বাকি চেয়ারগুলি ফাঁকা। তবু উপস্থিতি বোঝা যায়— খোলামেলা ফাইল। এমন কি পেপারওয়েটও নেই। ঘরভর্তি ফর ফর শব্দ। কিছু কিছু উড়ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক। আমি গলা খাকারি দিলে ভদ্রলোক আঙুল তুলে দেখালেন—সোজা ক্যান্টিনে চলে যান।

কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল। যাই হউক বুড়ো মানুষটাকে আর বিব্রত করতে চাইলাম না। এবার আন্দাজ করে করে একটা পথ দেখলাম। স্বাভাবিক তখন আমার পা ধীরে ধীরে। ধূঁয়ার কুন্ডুলিগুলিও অদ্ভুত। প্রতিটা গোলটেবিলের উপরেই দলা পাকিয়েছিল মেঘ। আমাকে কেউ ফিরেও দেখল না। অথচ বেশির ভাগ মানুষই মনে হল ঐদিককার। আসাম কাছাড় মণিপুর মেঘালয় মিজোরামের বাঙ্গালী। আমাদের তো কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি ছাড়া কোন গতি নেই।

কদিন পরেই বুঝলাম— আমি জলজ শ্যাওলার মত। এক বৃত্ত থেকে ছিটকে অন্য অস্তিত্ব এখনও খুঁজে পাচ্ছি না। মায়ের কথা হল ইন্ডিয়াতে কি কখন শিকড়ও গজাবে না? বাংলাদেশে কি ছিল না ছিল দেখিনি। জন্মের পর থেকেই অভাব আর অভাব। দুইহাত কাপড় দশ হাতে টানতে থাকলে কি আর লজ্জা নিবারণ হয়? বংশ গোত্র পদবী গরীবের হাতি ছাড়া আর কি? আসলে আমার মায়ের সুঁচসূতা মুস্তাফা খলিফার দেয়া। শতচ্ছিদ্র সংসার রীফু করতে করতেই চালিয়ে দিল মা। আর পারে না। ফলে আমিও ভিতরে ভিতরে সাবধানী। খালি চোখে খামখেয়ালি মনে হবে আমাকে। আমাকে যদিও আদেশ নির্দেশ করেনি কেউ। তবু জানি অনেক দূরই যেতে হবে আমাকে। এমনকি গোত্র বংশ পদবীগুলিকে সঙ্গে নিতে হবে।

আরেকটা কথা বলি—চলার পথে কখনও যদি পতন হয়—তার দায়ভাগ কেউ নেয় না। কারো ফাঁদেই পা দেব না —হউক না ওরা আমার মা বাবা জুঁই! প্রত্যেকেরই রাস্তা আলাদা আলাদা। এজি অফিসে ঢুকে স্থির করলাম— যেদিকে পাল্লা ভারি হবে —সেদিকেই থাকব। কর্তারা বেশি শক্তিশালী হলে তাদের দিকে। —কে বুঝবে আমার দুঃখ? কিন্তু হল ঠিক তার উল্টো। ননীদার সঙ্গেই প্রথম পরিচয় হল । এখানে এসোসিয়েশনের রোয়াব বেশি। তার কাছেই প্রথম রাজনীতির পাঠ নিলাম আমি। প্রকৃত ভারতবর্ষটাকে বুঝতে পারলাম আর ইউনিয়ন এসোসিয়েশন করা কতটা দরকার। সেই অর্থে ত্রিপুরার লোকজনকে তিনি রাজনীতি সচেতন মনে করেন।

আরেক রাউন্ড চা দিয়ে গেল আনন্দ। চোখে চোখ পড়ল বলে মুচকি হাসল। এরকম হাসির অনেকসময়ই অর্থ বুঝিনা আমি। তার এক কাজ। ফাঁকে ফাঁকে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে যাওয়া আর সাঙ্গপাঙ্গ সহ ননীদাকে একটু পরে পরে সাপ্লাই করা। ননীদা ঠিক দশটায় সই দিয়ে এসে ক্যান্টিনে বসেন আর উঠেন না। সময় সময় শুধু শ্রোতাদের মুখ বদল হয়। যখন যার চায়ের ইচ্ছে হয়— আসে বসে উসকে দিয়ে যায়।

কিন্তু ইদানিং যেন তার কী হয়েছে! কথাবার্তা খুবই কম। মন ভালমন্দ দুই-ই মনে হয়। সবসময় আশা আশংকা ছোপ ছোপ লেগে থাকে। —জানিস তো, ত্রিপুরার গ্রামপাহাড় এখন লালে লাল। আবার ধরপাকড় শুরু করেছে।

তারপর সিগারেটের ছাই দিয়ে চায়ের টেবিলে গোলমতন কিছু একটা আঁকলেন ননীদা। চোখ

রাখলেন আমার মুখে —

—ফুটবলের মত লাগছে না ?

—তোর মাথা ।

—তাহলে অন্তত মহাদেশগুলি ভাগ করতে হবে । আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি ।

প্রথমে আফ্রিকা মহাদেশ, তারপরই তিনি ভারতবর্ষে ঢুকে পড়েন । ভিতরে ভিতরে কি রেগে আছেন ননীদা ? প্রতিবেশীদের সীমানা নিয়ে শুধু শুধু সময় নিচ্ছেন বেশি । বাদ বাকি পৃথিবী পড়ে রইল শূন্য । তবুও গোসা কমছে না । এবার তুলনামূলক বিচার শুরু করে দিলেন ।

—আমাদের চরিত্র খারাপ । ননীদার গলার আওয়াজ মোটেই সুবিধার নয় । আমি প্রমাদ গুনছি ।

—আগ্রাসী, বাজারী । কথাগুলি তিনি সময় দিয়ে দিয়ে বলছিলেন ।

সেরেছে ! কি জানি কি হয়েছে ? আমার মনে হয় ননীদাও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাবেন । ফলে যতটা সম্ভব সিরিয়াস মুখ করেই শুনছি আমি এবং সত্যি সত্যি উত্তেজিত হয়ে পড়ছি মাঝে মধ্যে।

—কপাল ভাল বলতে হবে । তেমন সামরিক শক্তি নেই । নইলে আমরাও ব্রিটিশ ইয়াঙ্কিদের মতই হিংস্র ।

—স্বীকার করি পাকিস্তানও আমাদের চেয়ে ভাল দেশ । আরো জুড়ে দিলাম—বাংলাদেশের জন্ম কি এবং কেন দাদা ? চীনের সঙ্গে যুদ্ধে কার দোষ ?

কি হল ? হঠাৎই ননীদা যাবতীয় কথা বন্ধ করে এখন আমাকে ঘুরঘুর করে দেখছেন । মৃতপ্রায় কোন গরুর শক্তি যেভাবে যাচাই করে শকুন ।

—এত দ্বিধা কেন তোমার নষ্ট ভারতবর্ষের নাম নিতে !

—না মানে—মা, মাটি—

—ছাইপাস্ ।

ননীদার এমনতব মনোভাব সত্যি বিশ্রি ।—নানা মুনির নানা মত তো থাকতেই পারে ।

—আমি বুঝিনা তোমার গায়ে ছিটা পড়তাছে কেরে ? তিনপয়সার মুরোদ নাই বেটার দেশপ্রেম কিতা ! তুমি কেরে বাইল্যারার মত কথা কইবা ভাই ! তোমার দুঃখে সুখে কেউ থাকব না । থাকমু শালা আমি তিনকড়ি ননী কর । বুচ্ছ ?

আবারো মেনে নিলাম । শুধু আমার চোখগুলি তখন কথা শুনে না । দেখি অশিনদা দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল আমাকেই ডাকছে । ওকে দক্ষিণপন্থী বলে ননীদা । কার না রাগ হবে বল ! তাই আমি গুরুত্ব দিয়েই অশীনের কাছে গেলাম ।

—কেমন আছেন দাদা ?

—এতক্ষণ তোমরা যে টেবিলে বসে কথা বলছিলে—তার পাশেরটা দেখ । মণিপুরের জীতেন্দ্র সিং চা খাচ্ছে নাকি ঝিমুচ্ছে ?

—তা কি হয়েছে ?

—ছেলেটা ড্রাগস নেয় । মরফিয়া । নতুন নতুন ক্রিশ্চান হয়েছে ।

—হতে পারে । আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখন মিশনারীদের রমরমা । কিন্তু ওদের চেলারা এত বেশি নেশা করে কেন ?

—আমরাও করি । নিজে না করতে চাইলেও তোমাকে অন্যরা করায় । কথাগুলি শেষ করে আর দাঁড়ায়নি অশীনদা ।

শুধু আমি একটু সময় দাঁড়িয়ে আবার ননীদার টেবিলে ফিরে আসি । এখন আগের চেয়ে অনেক ভারি লাগছে শরীর ।

—জোকার কী কথা বলে গেলরে ?

—এমনি, কিছু না ।

—শালাকে আমি চিনি না ভেবেছিস ? সি আই এর দালাল।

—আস্তে ননীদা আস্তে ।

— শালা তুমিও একটা রিঅ্যাকশনারি।

ঠিক তখনই আমাদের সেক্সনের অর্জুন দেববর্মা ইস্কাবনের বিবির মতই বাঁচিয়ে দিল আমাকে —

—বড়বাবু ডাকতাছেন ।

—কেরে রে ?

—সাহেব চেৎছে। আপনারে ক্রস দিছে দেখছি ।

আশ্চর্য তো! এ জি অফিসে আবার ক্রসাক্রসি ব্যাপার কবের থেকে এল। একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। কি হতে পারে ? দোতলার সিঁড়ি উঠতে উঠতে, আসলে অপিসের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এসোসিয়েশনের একটা বোঝাপড়া আছে। তবে মান্থলি রিটার্ন রিপোর্টগুলি কিন্তু সময়মত দিতে হবে। বড়বাবুদের একটা কথা আমার খুব ভাল লাগে—টোটাল ভাউচার, রিসিভড বেশি বেশি করে দেখান মশায়, নইলে চাকরী থাকত না। সত্যি কথাই অবশ্য—ওয়ার্কলোডের উপরেই তো আমরা নির্ভরশীল।

আমি পা টিপে টিপে বড়বাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুসময়। শুধু চারু লক্ষ্য করল ব্যাপারটা এবং খুব ছোট করে একটা মিঁয়াও ডেকে উঠল ফাজিল। বিজনদাও হয়ত আমাকেই অনুমান করলেন। মুখ না তুলেই আঙুলে ইশারা করলেন—বসো, কথা আছে। সই করলেন, ফাইল বন্ধ করলেন, তার করিৎকর্মা দুইহাতে ফক্কা গেরো দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন ট্রে লক্ষ্য করে। নাকের কাছে মাছি তাড়ালেন একবার। ড্রয়ার খুলে এখন কি করবেন আমি জানি, তখনই ফস করে জ্বলে উঠল দেশলাই কাঠি। তিনি ফুঁ দিলেন এবং জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন উৎকণ্ঠা। নীলরঙ আকাশটাও অনেক উপরে উঠে গেছে এখন।

—তুমি এতদিন পরেও আলপিনের ব্যবহার জানো না। নোট সিটে ফ্ল্যাগ লাগাতে পারো না। কার কাছে সই-এর জন্যে পাঠাচ্ছ মার্ক করে দাও না। কী!

আর কোন কথা না বাড়িয়ে তিনি দু-তিনটে লুজসিট নিয়ে এবার শব্দ করে সমান সমান করতে লাগলেন তার টেবিলে। তারপর চুম্বক ছাড়িয়ে আলপিন তুলে নিলেন একটা। আস্তে করে লুজসিটগুলি বাঁদিকের কোণায় ফুটো করে একবার আমাকে দেখলেন, আমার চোখ দেখে খুশি হলেন মনে হল। আলপিনটাকে কাঁথার মত উপরে তুলে আনলেন। হঠাৎ ছেড়ে দিলেন হাত থেকে। ঝল ঝল হয়ে উঠল লুজসিটগুলি, পড়ল টেবিলে।

—তুমিও তো তাই কর! ফলে কী হয়!

—কী হয় ?

এইবার বড়বাবু মুখ বিকৃত করেই ভেংচি কাটলেন একটা—খোঁচা লাগে খোঁচা। সাহেবও তোমার সজারুর কাঁটায় আক্রান্ত। টক্সাইড নিতে হয়েছে।

—সরি বিজনদা।

আবার মাইক্রোফাইগু এসপ্রোর মতই তিনি গলে গেলেন। একটা হাত রাখলেন আমার কাঁধে।

—দেখ, আমাদের অপিসে তেমন কিছু কাজ নেই। নিজেও তো বোঝ। সরকারও চায় না চুরি চামারি খুব একটা ধরা পড়ুক। এত এত যে মরা ভাউচার আসে—কটা তোমাকে অডিট করতে বলা হয় ? শতকরা দশটাও নয়। তাছাড়া অবজেকশন দিয়েই বা কী লাভ ? তোতার বুলি শুনতে হবে—দি প্যারা মে বি ড্রপট। যাই হউক এত কিছু শুনে বুঝে কাজ নেই। ফলে আমাদের কি করা উচিত বল ?

— বিজনদার কথামত চলা।

হা হা —হাসি যে উঠল আর তো থামতেই চায় না। শেষে কাশতে কাশতে কোনরকমে—ডেকোরাম বুঝলে, অন্তত অফিস ডেকোরামটা আমাদের প্রত্যেকেরই মেনে চলা উচিত।

সবশেষে লুজ সিটগুলিকেই আবার হাতে তুলে নিলেন বড়বাবু। সেই পিনগাঁথা কোণায় কাগজগুলিকে একটু ফাঁক ফাঁক করে দিলেন বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে। এখন পিনের মাথাটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ঠেলে দিলেন। এভাবে। আচ্ছা যাও।

একটা আলপিন শালা—তারও কত ক্ষমতা। পিনের খোঁচা খেয়ে মরেছে এমন মানুষের সংখ্যা ভুরি ভুরি।

অফিস ক্লাব থেকে ফিরতে ফিরতে ইদানিং অনেক রাত হয়ে যায়। মামার বাসায় থাকতে এসব সম্ভব ছিল না। কান মলে দিত দিদিমণি। সন্ধ্যা সাতটার পরেই এখানে রাস্তাঘাট ফাঁকা। সবার মুখেই এক কথা—দিনকাল ভাল না। এমন অনেক কথা আছে—শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা যায় না অথচ ঠিক মনমত কথাও না।

নির্জন রাস্তা। আমি বনমালীপুর পাওয়ার হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলাম একটা সিগারেট ধরাই। এই এলাকার ছেলেদের আমি চিনি। সামনেই গণরাজ চৌমুহনীতে আমাদের মেস। ওরাও নিশ্চয় মেসে বসে তাস খেলছে। তাছাড়া আর কি করার আছে। কেউ হয়ত চিঠি লিখছে অনেকগুলি বা একটাই চিঠি খুব বড় করে। বাড়িঘরের অ্যালবাম দেখে পুরনো চিঠি উল্টেপাল্টে বেশ তো সময় কাটিয়ে দেয় কেউ কেউ। বা হয়ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে সবাই, বিষয় সিনেমা, ক্রিকেট আর নির্বাচনী রাজনীতি। নেই কাজ তো খৈ ভাজ করতে করতেই রাতের খাবার সময় হয়ে যায়। কেউ হয়ত ভাত বাড়তে বাড়তে তার প্রেমিকার কথা তুলল। নিছক শরীর নিয়েও কথা বলতে মজা লাগে এককে সময়।

এখন আমি হাঁটছি আর ভাবছি—দিনকাল ভাল না কথাটার কি সত্যি কোন গুরুত্ব আছে? কিরকম জানি একটা হাঁ না—দুইই মনে হয় আমার। জিনিসপত্রের মূল্য ব্যাপারটা তো উর্দ্ধগামী এবং মূল্যবোধে ধ্বস নামে চিরদিনই।

ইদানিং সময় গময় নাই—বিপদের সংকেত পাই আমি। ব্যাপারটা খুবই অস্পষ্ট। আজই তো মার চিঠি পেয়েছি —ওরা ভাল আছে। তাহলে জুঁই? এই মেয়েটাই আমাকে ভাবায় বেশি বা তার বয়েসি সব মেয়ে— এদের কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। অল্প তোষামোদেই গলে যায় নইলে বেশি তোষামোদে অবশ্যই গলে। বা ওদের শরীরও যে স্বাভাবিক প্রতিবাদ করে—এতশত সূক্ষ্ম কথা পুরুষেরা কোনদিনই বুঝতে চায় না। মাঝখান থেকে কলসির তলা ভারি হয়। এবং তখনই বৃক্ষ থেকে মেয়েরা মানব জন্ম লাভ করে। তাদের হাত পা গজায়, চলৎশক্তি পায়।

আসলে তো সবই আমার আশংকা। জুঁইয়ের হয়ত কিছুই হয়নি। দিব্যি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে করিমগঞ্জে আর মায়ের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে।

এখন তোমার ব্যক্তিগত বিপদ কি হতে পারে বল শানিত সেনগুপ্ত! আজই তো চিঠি পেলে। এরই মধ্যে করিমগঞ্জের পাট চুকিয়ে ওরা চলে আসবে। ভালই হবে। দুই'শ চুরাশি টাকা বেতনে চাকরিতে ঢুকেছিলাম কয়েকদিন আগে। এবার তৃতীয় বেতন কমিশনের ফলে প্রায় ডাবলের চেয়ে বেশি হবে শুনলাম। চলে যাবে। ভালভাবেই চলবে।

তবু কেন নাভির গোড়ায় মোচড় দিচ্ছে বারবার? মেয়েদের মত আমারও আশংকার বমি হবে কেন—কি হয়েছে?

কদিন ধরে হিল্লী দিল্লীর বাতাস বইছে আগরতলায়। আগুনের হল্কা তো শুকনোই হবে। বাংলাভাষায় লু শব্দটা ততটা জ্বালা জ্বালা করে না। কিন্তু কয়েকদিন ধরে শুনি—ওরা খুব খুশি, ওরা অখুশি ইত্যাদি। এখন রাজা মহারাজাদের নাকি মাসোহারা বন্ধ। ব্যাংক জাতীয়করণ হল। আজকাল রোদ সরে পড়ার আগেই চীনেবাদাম ভাজা বেরিয়ে পড়ে। শুধু শীত শীত করে আমার। ঘুমের মধ্যে গরীবি হটাও শুনি আমি। ইন্দিরার জয়। যুদ্ধ হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। তারপর

দুর্ভিক্ষ। তবুও তো সকাল সন্ধ্যা হয় দেখি!

শেষে বেতন কমিশনের বিষফল খেলাম আমরা। এবারও আদিবাসী আতিথেয়তার মতই ননীদাকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারছি না। শুনেছি ভারতীয় রেল কর্মচারীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এবং ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আমাদেরও যোগ দিতে হবে তাতে।

কেন যে প্রতিবাদী পাঞ্জাবী আর ঝোলা ব্যাগ পড়ে থাকি সবসময়। এখন পালাবার পথ দেখছি না। মনে হয়, ননীদা ছাতির হুক দিয়ে গলা টেনে ধরবে আমার, পিঠে থাপ্পর মেরে মস্করা করে—এ্যাই যে আমাদের একনম্বর একটিভিষ্ট। ঘামতে ঘামতে একসময় শীত করে। তিন বছর না গেলে কেউ কোয়াজি পারমানেন্ট করে না। যাই হউক, যা হবার হবে।

পাঁচ

যেন গতদিন খুন হয়ে যাওয়া বাসি কোন যুবক পড়ে রয়েছে বিছানার এক পাশে। দুইহাত মাথা এবং বুক, পেট থেকেই নিচের দিকে ঝুলে পড়েছিল। চুলগুলিও উল্টে গিয়েছিল বলে ঝোলে দোলে।

একসময় উর্দ্ধমুখী পা নাচিয়ে আরাম করছিল বোধহয়। তারপর কি যে খেয়ালে সাপের মত ঝুলতে থাকে নিচে, ঝুলতে ঝুলতে কোমরের কাছে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে শক্ত হয়ে গেছে শরীর।

নখে মেঝেতেও কিছু আঁচড় কেটে রেখেছে দেখা যায়। ইদানিং কাগজ কলম হাতে পেলে সে চৌকো ঘর ঘর আঁকে। যেমন শৈশবের কোঠায় লিখে রেখেছে—অভাব আর স্বপ্ন। যদিও এগুলোকে এখন আর সে স্বপ্ন বলতেও রাজি নয়। বলে—কাল রাতে একটি আকাঙ্খা দেখেছি।

তারপর ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠে অঝোরে ঘামতে থাকে। স্বপ্নের চৌষট্টিটা সাপ কিলবিল করতে থাকে মশারীর উপরিভাগে, আর একটি ছোট্ট অথচ লালরঙের বেয়াড়া সাপ ছোবল মারে নিচে। আমি যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকি বা ঘুর্ণিজলে একবার ডুবা, একবার অনেকদূরে গিয়ে ভাসা—কেউ কি আছে জলের মধ্যেও ঘামে ? আমি ঘামতে থাকি। এবং ঘাম জলেও শরীর পুড়তে থাকে আমার। আর এও জানি—ভয়ের কিছু নেই। নলের শরীরে কলি। সাময়িক জ্বালাপোড়া হবে। তারপর সবই ঠিক হয়ে যাবে একসময়।

তবু সে আঁচড় কাটতে কাটতে অনেকগুলি চৌকো ঘরই খালি রেখে দিল। ঝুলন্ত হাতের তালু ফেটে এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে যাবতীয়। চুলগুলি উল্টো ঝুলছিল বলে আরো অস্বাভাবিক লাগে। আবার বাতাসে চুলে চিন্তায় যে প্রাণের সঞ্চার হয়, মনে হয় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম, আবার পিছু ডাক দিলে কে তুমি ?

তক্তাপোষের কিনারে এসে নিচের দিকেই ঝুলছিল শাণিত সেনগুপ্ত। এবার যেন পিঠেও কে চেপে বসেছে! সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েরাই এরকম করে। জুঁই আর সে জুঁই নেই—নেংটো, দাদা দাদা করত সবসময়।

কিন্তু আমার তো দম ফেটে যাচ্ছে। বাদুড়ের মত ঝুলে পড়েছিল যখন থেকে —নিচে কে যেন ঘটি ধরে বসেছিল একটা। প্রথম থেকেই টুপ্ টাপ্ করে রক্ত বিশ্রি শব্দ করে, আসলে লোক জানাজানি ব্যাপারটাই অপছন্দ করে শাণিত। এবং এখন কোন শব্দ হচ্ছে না ঠিকই। ঘটি উপচে পড়ছে। অথাৎ ভিতরে ভিতরে কি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে না শাণিত!

চোখ দুইটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে পুতলি। এরই মধ্যে সূক্ষ্ম যত শিরা উপশিরাগুলি—হয় ফেটে গেছে, নাহয় অতিরিক্ত রক্তচাপে নিষ্ক্রিয়।

শত চেষ্টা করেও আর বিছানার ওপরে উঠে আসতে পারছে না সে। ইতিহাস চেতনা না ছাই! কী দরকার ছিল পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে। ঝিনঝিনি ধরেছে শরীরে।

এজি অফিসের চাকরি ছেড়ে দেয়ার কোন চিন্তাই মাথায় আসেনি। যদিও টারমিনেশন মানে হল চাকরি নেই। শাণিতের মনে হয় নিশ্চয়ই আবার হবে। এদিকে অবস্থা সঙ্গিন। সে ভাবছে—এখন কি করা ? মাসে মাসে এসোসিয়েশন যে টাকা দিচ্ছে তা দিয়ে তেল শুকনো লঙ্কা ভাজা আর কদিন খাওয়া যায়! তাছাড়া এভাবে ঋণের বোঝা বাড়ানো!

আমাদের পরিবারে কোনকালেই গুড়া মশল্লার তেমন চল নেই। গরম ভাত হলুদ বাটা দিয়েও খাই আমরা। কিন্তু ঘর সংসারের কথা যাই হউক, ইদানিং মুসকিল হল রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ কলিগদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেলে, একেবারে কণিষ্ঠ হয়ে পড়ে শাণিত, লজ্জায় মাথা কাটা যায়!

—'তোদের কৃপাই তো বেঁচে আছি রে ভাই'। যেন টেপ করে রেখে দিয়েছে কথাগুলি। তবে দুনম্বরি নয় —প্রতিবারই তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসে—কী করবে সে!

শুরু শুরুতে এমন ছিল না—তেনজিং নোরগে মনে হত নিজেকে। আবার সেলফ

স্টাইল্ডও নয় । সহকর্মীদের চোখে মুখেই বিস্ময় বিচ্ছুরিত হত—তখন বরং লজ্জা পেত শাণিত, মনে হত নিস্তরঙ্গ দশাদশা জীবনই ভাল ছিল, অন্তত আমারই মতো মানুষের সামনে বিব্রত হওয়ার কারণ ছিল না ।

তাছাড়া পাওনা যদিবা কিছু থাকে, গ্রহণ করার শক্তি তো শাণিতের নেই ! মানুষের গালগুলিতে যেভাবে একপরত চামড়ার নিচেই প্রশংসা জমতে দেখা যায়, জমতে জমতে চোখের পাতা দুইকূল ভারি হয়ে ওঠে, অন্তত এরকম দোষ নেই তার । তার আগেই সব্বাই বলে উঠে লজ্জা পেলে তোর মুখ তামার রঙ ধরে — কালচে কষটে কষটে । আর শাণিত্যা ছুঁচোর মত গর্ত খুঁজে কেবল । খুঁজবে নাইবা কেন ? —ঘাড়ে যে অনেক দায়িত্ব আছে তার !

আসলে সে অন্য জগতের মানুষ, বা এ জগতে একজন মনুষ্য গন্য হতে অনেক বাকি আছে তার । আর এখন তো লুডু সাপের লেজ ধরেই বসে আছি !

তারপর শবাসনে শুয়ে । মানে মাথার নিচে বালিশ নেই । অর্থাৎ যেভাবেই হউক খাবি খেয়ে বাকি অর্দ্ধেকটা শরীরও এবার বিছানার ওপরে তুলে আনতে পেরেছে শাণিত । কাম নাই বাবা বালিশের । আর শ্বাস প্রশ্বাস করে জোরে জোরে । ঘাম চাম কোন ব্যাপার না, কিন্তু আরেকটু বাতাস হলে ভাল হত !

হাসি পায় । প্রথম প্রথম শরীরের চামড়া রঙ-ফঙ নিয়েও ভাবতো শাণিত । মনে হত পন্ডিত ব্যক্তিও নিগ্রো হলে কোন মূল্য নেই । তাছাড়া আমাদের এই উপমহাদেশেই কি মনীষীদের সংখ্যা কম নাকি ? তাদের প্রত্যেকেরই বায়োডাটা খুঁজতো সে । রঙ কলো শুনলে তিন লাফ দিত, আরো খুশি হত যদি কেউ দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে উপরে উঠে আসে এবং ছাত্র হিসেবে মিডিওকার হয় ।

অনেকক্ষণ পর দুচোখ বন্ধ রেখেই হাতড়ে হাতড়ে মাথার নিচে বালিশ চায় সে । আস্তে আস্তে সবই স্বাভাবিক হয়ে আসছে মনে হয় । ঘাম শুকিয়ে গেলে সাদা বালু বালু শরীর জুড়ে ঘুম নামছে এখন টের পায় । বিছানায় ছারপোকাও আছে দু'একটা । যতদিন যাচ্ছে এজি অফিসের কলিগরাও ভাবলেশহীন হয়ে পড়ছেন ক্রমশ । এখন আর দূর থেকে কমরেড কমরেড চিৎকার করে সম্বিৎ ফেরায় না কেউ । তাহলে পাশ কেটে চলে যায় নিশ্চয়ই !

ঠিক আছে । কিন্তু কে কারে দোষারূপ করেরে শাণিত ? ওরা না আমার অন্নদাতা ! তাছাড়া প্রতি মাসেই চাঁদা তুলে পরিবারটিকে যারা খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এজন্যই ভয়ও করে, প্রথম প্রথম বেশি করত আর এখন তো কেউ আসে না আমার ঘরে । মানুষ ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেই অস্বস্তি হয় । মনে হয়, অনেক কিছু তবে আমার মেনে নেয়া উচিত । আবার ভাবি—কাম নাই বাবা, ভালো আছি,দূরে দূরে থাকাই অনেক ভালা ।

দয়াদাক্ষিণ্যে একেবারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছি । যত পুতপুতি সবই আমার—ওরা হয়তবা ওদের জায়গায় ঠিক আছে । অনেকটা সেই গল্পের মত—দেশ উদ্ধারের কোন ইচ্ছাই ছিল না । ক্ষোভ ছিল—সেতো দীর্ঘদিন ধরেই পুষে পুষে রাখতে হয় ! একসময় ক্রোধও পুড়ে ছাই হয় । যাই হউক, প্রতিশোধ নেব ঠিক করেছিলাম আমার স্টাইলে, অদৃশ্য আততায়ীর মত । হৈ হট্টগোল করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনার মত বোকা আমি ছিলাম না ।

প্রতিবারই দাঙ্গার পর কিছু বাড়িঘর পুড়ে গেছে দেখা যায় । দমকল চলে যাওয়ার পরও ধোয়া ওড়ে । এভাবে সে ঘুমের ঘোরে শিকার হতে চায়নি । এরমধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই । তবে কি পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে কেউ তারে জলে ফেলে দিয়েছিল ? কে সে ?

সে আর কেউ নয় — শাণিত সেনগুপ্ত নিজেই । আমার মধ্যে কোন ক্ষুদিরাম বসু টসু নেই । তবু কারে ঘুম পাড়িয়ে রাখি সবসময় ? সে কে ? তার জেগে ওঠার সময় হয়নি এখনও । কিন্তু বারান্দায় এত কোলাহল কেন ? কেন দুষ্ট লোকেরা কেবল খোশামুদি করে —'তোমাদের মত তরতাজা ছেলে' !

ঠিক দুপুরবেলা, একটা কাউয়া ডাকে। এই আগরতলায় দেখলাম কাঠের ফ্রেমে টিনের ঘর বাড়ি বেশি। সরাসরি রোদ পড়লে একরকমের গরম লাগে শরীরে, রোদজ্বলা টিনের গরম আরেক রকম।

এমন কোন দুপুরে তোমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যদি কাক ডাকে বা গভীর রাতে কুকুর—আমরা দূর দূর করে উঠি। আজ যদিও উচ্চবাচ্য করেনি কেউ। শুধুই পাশের বাড়ির ঠাম্মার কাশি বেড়ে গেলে রতনরাও কাশে। আমি বুঝি না—এও কি সংক্রামক রোগ? নাকি ওরা এভাবেই শাসন করে বা সহায়তাও হতে পারে আমি জানি না।

এই বনমালীপুরে সবই সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। আর আমরা মাত্র কয় ঘর ভাড়াটিয়া। প্রত্যেকটা বাড়ি পুরনো। সত্তর আশি বছর তো হবেই, তার চেয়েও বেশি হতে পারে। গণরাজ প্রেসের সঙ্গে যে ভট্টাচার্য্য বাড়ি—তাদের পূর্বপুরুষেরাও নাকি মহারাজের কর্মচারী ছিলেন। আগরতলার পুরনো বাঙ্গালি পরিবারের অনেকেই তাই। ইদানিং একটি পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে — যাদের এক আত্মীয় মহারাজ বীরচন্দ্রের দরবারে সর্বোচ্চ পদাধিকারীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মহারাজ ব্যক্তিগতভাবেও মান্যগণ্য করতেন, গুরু মানতেন ভদ্রলোককে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করলে, মহারাজ তাকে গৃহবন্দী করে শাস্তি দিয়েছিলেন।

এমনি হাঁটতে হাঁটতে একদিন আমি ওদের বাড়িতে ঢুকে যাই। কোন কারণে সেদিন দারোয়ান ছিল না। আমার পেটে পেটে ছিল সামসের গাজি বা রতনমণি সম্পর্কে নূতন কোন তথ্য জানতে পারি কিনা। রতনমণিকে ওরা এই রাজবাড়ির ভিতরেই পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

শাণিতের চোখ এখন মাকড়সার জালে—ইস্ কী ঝুল জমেছে! সতীশ সাহাও বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশে থাকেন, কুমিল্লায় ব্যবসা করেন। দুই দেশেই বিষয় আসয় এমন লোকের সংখ্যা আগরতলায় অনেক। ওদিকটাও একসময় ত্রিপুরা ছিল।

হঠাৎ একঝাঁক বাতাস, আর পূর্ব থানা থেকে উড়ে আসা কিছু কোলাহল শুনা গেল। এখানে ইন্টারোগেশন চলে ২৪ ঘন্টা। বাড়ির কাছে থানা, একদম ভাল লাগে না আমার। একরকমের নিশ্চিন্তি থেকে আরেক রকমের অপরাধ বোধ বাড়ে।

টিনের দেয়ালে ঝুল। সংক্রান্তি, মাস পয়লা না এলে এ বাড়িতে ঝাড়পোছের বালাই নেই। জুঁইটা দিন কে দিন খরগোস্ হচ্ছে। মেঝেটা ঝাড়ু দিতে বল্লে কোণায় জমিয়ে রাখে সব, আবার তর্ক করে— কোথায় ফেলব? মাথায় নাকি? কেন রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে ফেললেই তো হয়! পেত্নিটা ....

গণরাজ চৌমুহনী থেকে মোটরস্ট্যাণ্ড এই রাস্তাটা প্রতি বছরই জলে ডুবে যায়। তখন কয়েক ঘন্টার উদ্বাস্তু হয়ে পড়ি আমরা।

হতে পারি, কিন্তু বনমালীপুর ছেড়ে কোথাও যাব না। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি, এখানেই বিরোধী নেতাও থাকেন। আগরতলার রাজবাড়ি আমাদের কাছাকাছি। পুরনোটা নয়। ১৮০০ শতাব্দীর প্রথম দিকে মহারাজ কৃষ্ণকিশোর যে নতুন হাবেলি নির্মাণ করেছিলেন সেটা। এখানে থেকে শিকার করার জন্যেই বানিয়েছিলেন তিনি। রাজাদের খেয়ালের কি অন্ত আছে! শোনা যায় তিনি নাকি মেয়ে বাঘ ছেলে বাঘ ধরে ধরে বিয়ে দিতেন। তাছাড়া আমাদের বনমালীপুরে খুব কমই লোডশেডিং হয়। এই জায়গা ছেড়ে আমি কোথায় যাব?

এখন দুপুর কটা বাজল? রোদের তেজ একই রকম। তবে বেকার থাকতে দেখেছি ... এখনও আমি বেকার। খাওয়াদাওয়ার পর তেল মাথায় যেমন দিবানিদ্রা! ঠিক তিনটায় পরিষ্কার শার্টপ্যান্ট পড়ে বেরিয়ে পড়তাম আমি। রাস্তায় নেমেই বিড়ি সিগারেট যাহোক ধরাতাম, লুকিয়ে চুরিয়ে, মানে ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে গিয়ে ফস্, এখন হাসি পায়, দেশলাই বলতে কয়টা বারুদকাঠি আর এক টুকরো খোল ছিল।

চিত্রবাণী তখন করিমগঞ্জ সহরের খুব নামকরা সিনেমা হল। ম্যাটিনি চলছে। রাস্তাঘাট

শুনশান। কিছু রোদ কিছু ছায়ার মধ্যে হাঁটতে আমার ভাল লাগে, চুল পেতে আঁচড়ানো, তেলতেলে, ধীরে ধীরে হাঁটা, মনে হত আমার দ্বারা অনেক কিছুই করা সম্ভব।

আর কবে হবে? তখন তো চালকের ভূমিকায় ছিলেন দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত। আমরা এখন যত খুশি মন্তব্য করতে পারি মা ছেলে মেয়ে মিলে, কিন্তু সেদিন ভাতের জোগার করতে হয়েছে বাবারই। এবার সেই রথের রশি আমার হাতে, হঠাৎ করে পায়ের নিচ থেকে মাটি কেড়ে নিয়েছে ননীদা, অশীনদা ওরা। সেই উদাত্ত লোকেশ ওরাও কিন্তু আমার কোন ক্ষতি করেনি। এখন আমি আমার কররেখাগুলি দেখছি, অন্যরাও দেখছে ঝুকে পড়ে তীক্ষ্ণভাবে, রথের রশি টানতে হবে আমার।

আর কষ্টেমষ্টে দিন চলে যাচ্ছিল, এর বেশি তো দরকারও নেই আমাদের। মধ্যবিত্তরা সং দশের সাজই বানায় এমনভাবে। প্রথমে একটু তেল দিয়ে ঘসে দিতে হয় সাজটা, ক্ষীরটাকেও আঁশাতে হবে পরিমাণমত—নইলে যত সূক্ষ্ম আঙ্গুলই হউক—সন্দেশ ভেঙে যাবে।

সেই অসভ্যরাই আমার হাতে একদিন টারমিনেশনের কাগজ তুলে দিল। এবং যত বেটাগিরি ছিল আমার, সব শেষ হয়ে গেল এক নিমেষে। বাড়ির গেইটে এসে অনুপ জিজ্ঞেস করল—কিরে, একা যেতে পারবি তো?

—হেঁ হে। অনুপের যে অসুবিধে হচ্ছে আমি বুঝতে পরছি। আমার সমবয়েসি, এক সঙ্গে চাকরি পেয়েছি, একই এসোসিয়েশন করি অথচ!

সে চলে গেলে রুমাল বের করে যে মুখ মুছব—তারও প্রয়োজন নেই এখন। শরীরের সব জল শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট নাভি—সবই খড়খড়ে। ফলে পিচুটিগুলি শুধু খুটে খুটে তুলে দিলাম। তারপর ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেলাম বোকার মত—যেন ভীড় দেখছি। আমার ব্যবহার ভঙ্গি তখন কেমন ছিল—আমি তো আর বলতে পারব না। কিন্তু মা বাবা জুঁই, ওরা যেন শূন্যস্থানে বাতাস ছুটে এসেছিল —

—কি হলো রে?

— এই ফাঁকে আমিও হেসে ফেলার তীব্র চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম, আমার চোখের কোণাগুলি ঝাপসা হয়ে এসেছিল, ফলে কাগজখানা বাবার উদ্দেশ্যেই বাড়িয়ে দিয়েছি। বাবাও দেখলাম বিছানায় বসতে বসতে বলছে—চাকরিটা নেই। মুহূর্ত মাত্র। তারপর মা'ই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল, যেন কিছুই হয়নি বা অনেক কিছুই হযেছে হয়ত—যা, আগে হাতমুখ ধুয়ে আয়, ভাত খা—

ভাত! বুকটা আমার ধক্ করে উঠল—ভাতের জন্যই তো সবকিছু। একদিন চুপি চুপি মায়ের কপালেও বলিরেখা আবিষ্কার করলাম। আর বিরক্তি ব্যাপারটাই বাবার ভূষণ। কিন্তু মূল সমস্যা হল জুঁইকে নিয়ে—

এমন একটা ভাব ধরে থাকে — যেন আমি তার কত ক্ষতি করে ফেলেছি। সত্যি কথা বলতে কি—সেদিন থেকেই দাবীদাওয়া ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে। মানুষ মাত্রেই নাকি স্বার্থপর হয় — হবে হয়ত! স্নানের আগে এখনও আমি মাকে বুকে পিঠে তেল মালিশ করে দিতে বলি। ইদানিং মায়ের হাতগুলিও সঠিক জায়গা ছুতে পারে না।

শাণিত বিছানায় চিৎ হয়ে পায়ের ওপর পা রেখেছিল। তারপর দোলাচ্ছিল। হাউ টু স্টপ ওয়েরিং। আমার মনে হয় সবচে ভাল পথ হল—পিপড়েগুলো যখন মগজের দিকে ধাওয়া করে — তখনই মাথাটাকে একবার ঝাকার দিয়ে, একটা গান ধর। 'শুনোগো দখিন হাওয়া'। শচীন কর্তা লোকটা কি ত্রিপুরার রেল গাড়ি? শাণিত শব্দ করে হেসে ফেলে।

আমি কি পাগল হয়ে যাব? তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে দেশ বিনোদন তুলে নিল হাতে। অনেক পুরনো অবশ্য, মলাট নেই, প্রথম পাতাতেই নাম লেখা আছে কাবেরী। জুঁই এনেছে। তারও হাতের লেখা দু'একটা অক্ষর আছে দেখলাম—যেমন এস ফর শিউলি হবে জানি, কারণ এই নামটি সে যখন তখন যেখানে খুশি লিখে রাখে। কিন্তু এন ফর কি জানি না।

নীলাঞ্জনা ? নিরঞ্জনা ? যা খুশি হতে পারে।

এ মুহূর্তে আমারই নারী সংসর্গের বেশী প্রয়োজন। অন্তত মাথাটাকে শরীর থেকে আলাদা করে রাখবে। কে যেন কাঁদছে মনে হল ? স্বপ্ন দেখার মত ধরফড়িয়ে উঠে শাণিত। কাঁচনীল রঙের মধ্যে ডুবে আছি মনে হয়। ঝরাপাতার স্তূপে কে কাঁদে চুপি চুপি ? তড়িতাহত কোন পরী নাকি ? সারথি দেববর্মার বোন লালিমার কান্নাও এমনই। এমন সময় মায়ের হাত থেকে হাত পাখা পড়ার শব্দ হল মেঝেতে। কে হতে পারে—? পাশের বাড়ির ঠাম্মা নয়ত ? শাণিতের কাছে এখন তিনিই একমাত্র প্রতিবাদী চরিত্র। বাড়ির ছেলে বুড়ো কেউই তাকে গ্রাহ্য করে না, তবু ঠাম্মাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। হঠাৎ শোনা গেল কান্না—ব্যাপার কি? এমনকি রাস্তার লোকজনও ছুটে আসে। সবচে মজার কথা— বাড়ির লোকগুলোর তখন যা মুখের অবস্থা হয় ! আরেকদিন এই রতনদের বাড়িতেই আমি একটা সাপ মারতে গিয়েছিলাম। তারপর হাত পা ধুয়ে ওদের ঘরে গিয়ে বসেছি মাত্র, অন্য ঘরে ধূম ধূম লাথির শব্দ হল দরজায়। রতনটাও দেখি তিরিং তিরিং লাফায় —

—কী হচ্ছে এসব—এটা কি ভদ্রলোকের বাড়ি !

—কই, কিছু হয়নি তো দাদুভাই !

তাহলে ? তাহলে এখন আমি কার কান্না শুনলাম ? হাত পাখাটি তখনো মাঠিতে পড়ে রয়েছে? —কি হয়েছে মা কি ? এক লাফে তার কোলের কাছে গিয়ে বসে—মা ! কিন্তু চোখ খুলেছেন না অতসী। —তুমিও যদি এমন কর মা, তাহলে আমি বাঁচব কি নিয়ে ! ইমারজেন্সিটা উঠে গেল বলে, চাকরিটাও ফিরে পাব। তাছাড়া এসোসিয়েশন তো টাকা দিয়ে যাচ্ছে মাসে মাসে।

—বাবারে ! কথা বলতে গেলেই অতসীর দুই ঠোঁটে ফোসকরা উঠে, ফেটেও যায়। —আমরা কি তোমার উপর পড়ে পড়ে কেবল খাব ? আমাদের কি কোন কর্তব্য নেই ?

—এই বার কি জানি কি বুঝল শাণিত, অতসীর দিকে তাকিয়ে রইল এক মিনিট, এর মধ্যে মায়ের আঁচল দিয়েই তার চোখ মোছে দিল। লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন যাত্রাগানের মঞ্চ এটা। দুই চোখ পাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল—পুলিশ, পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে তোমাদের। একটি নাবালক ছেলের বিয়ের ইচ্ছে পোষণ কর তোমরা —যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে ! ততক্ষণে অতসীও আবার বিছানা ছেড়ে ছেলের চিবুক ছুঁয়ে ফেলেছেন—আহা খোকন সোনারে !

হাসতে হাসতে আবারো বিছানায় ফিরে মনে মনে ফোড়ন কাটে শাণিত—মাই বেটি, কোন বোঝ নাই, আমার ক্ষুধা বাড়াই দিলায় তুমি ! ননীদা, অশীনদা, ওদের কথা মনে হলেই তো পিত্ত থলি উপচে একেবারে, একেবারে তিতা হয়ে যায় শরীর। আর মনে হয়—তখন আমি একটা পাউরুটি ছিলাম।

তারপর মা ছেলের সিনেমা দেখতে দেখতে দিব্যেন্দুবাবুও খুক্ খুক্ শুরু করে দিলেন—হরি, দীনবন্ধু, আর পারি না। — আমার কথা তো বিষ্ঠার সমান, নাপাক্। কিন্তু জ্বালা জুড়াইতে পারি না যে ! কি করি হরি ? কে উত্তর দেবে আমাকে ? আর সবার সাস্‌পেনশন হইল—তোর কেন টারমিনেশন রে মূর্খ !

অর্থাৎ আবারও তড়িতাহত। ঝাপসা হয়ে এল দুই চোখ। কেবল কানের মধ্যে প্রাণ আছে বোঝা যায়। আর একফোটা লবনজল দিকভুলে মুখে ঢুকে পড়লে—অস্থির হয়ে পড়ে শাণিত। মনে হয় জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেছে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। বাবা একটা কথাও মিথ্যে বলেনি ! ননীদা ওরা কি জানতো না —আমি পিওরলি টেম্পোরারি ! তবু আমাকেই ঠেলে দিল ওরা !

আর এক মিনিটও সহ্য হচ্ছেনা। ঘরের বাতাস গরম হয়ে গেছে। লাফ মেরে উঠে দাড়ায় শাণিত, তাড়াহুড়ো শার্টপ্যান্ট পড়ে, চুল আঁচড়াতে হবে ওঘরে গিয়ে—

ছয়

জুঁই দিনে ঘুমায় না। তারও বুকে এখন বই, মলাট বাধানো। শাণিত বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে তার গালে একটা চিমটি কেটে দিল। আর হাউমাউ করে পাড়া জাগিয়ে দিল জুঁই—গুন্ডা, বদমাইস্।

সতীশ সাহার বাড়ির নাম 'মণি মঞ্জরী'। তার গেইট খুলে শাণিত রাস্তায় নেমে এসে দেখে --লোকজন তেমন নেই। মন্দ না!

বিষ্ণু পুরাণে যে কিরাত দেশের কথা লেখা আছে তার বহুলাংশ এই ত্রিপুরা। বাংলার মুসলমান আমলে ঐতিহাসিকেরা ত্রিপুরাকে জাজনগর বা জাজিনগর নামেও আখ্যায়িত করেছেন। আর সর্বশেষ রাজধানী এই আগরতলা। এখানে নাকি আগরগাছের ঘন জংগল ছিল। এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকলে এখন শাণিতের চোখ দুটি কেবল পায়ের সামনে সামনে পড়ে। দীর্ঘশ্বাসও পড়ে একটা—সেই অশ্বক্ষুর, সেই ধূলো কি আর এখন খুঁজে পাওয়া যাবে!

অনেকক্ষণ ধরেই একটা রিক্সা ক্রিং ক্রিং করে চলছে। ভীষণ বিরক্ত বোধ করছে শাণিত। হঠাৎই পেছন ফিরে বেটার হেন্ডেলবার চেপে ধরে—

—কিতারে শালার শালা—

—আরে! ভিস্সেন! কেমন আছো?

কতদিন পর বলো! থাকো কোথায়?

—উঠেন উঠেন।

—না, তুমি নামো।

—আরে উঠেন না!

—শোনো ভিস্সেন, ঐ দেখ শনিদার চায়ের দোকান, এক কাপ চা খাই চল, মনে আছে তো?

আসলে শনি সাহাও এতক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের দেখছিল—বাবু হেই জলদস্যুটারে আবার জোগাড় করলেন কৈ থাইক্যা। অনেকদিন পর আমরা এক চোট হেসে নিলাম আর পুরাণো মদের মতই ক্রমশ নেশা বাড়ছে বুঝতে পারছি..........

— ভিস্সেন!

সেদিনের কথা তোমার মনে আছে তো! একজন দেবতার মতই রিক্সায় হেলতে দুলতে চলেছি, কোন ফাঁকে যে টুপ করে পড়ে গেলাম রাস্তায়, একেবারে শুয়ে গেলাম। তখন সদ্য ইউনিয়ন করতে শিখেছি। বুঝেছি-একদল লোককে আমার বিষ্ঠাপোকার চেয়েও বেশী ঘৃণা করতে হবে। আর অন্যদের ব্যবহার অনেকটা - যার দাদা নেই তার কাছে দাদার মত। যার বাবা নেই তার কাছে বাবার মত। ননীদা ওরা বন্ধুত্ব ব্যাপারটাকে মোটেই পাত্তা দিতে চান না। কিন্তু ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ক্যারিসমা দেখাতাম। কারোর হয়ত চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের উপর প্রভাব বেশি — তিনি তাদের ডিল করতেন। আমি মেয়েদের কাছে যেতাম ভোট চাইতে — আমার যত আড়ষ্টতা ব্যর্থতাগুলিই নাকি সহানুভূতি কুড়োবে— ননীদা মনে করেন।

সেদিনও এসোসিয়েশন রুমে বসে, সামনে যে প্রতীক ধর্মঘট হবে তার শ্লোগান লিখছিলাম। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ফিরব কি করে! কমরেড রাহার পকেটে সবসময়ই ছোট বড় চ্যাপ্টা রামের বোতল থাকে। একটু পরে পরে কাকআড়ালে উল্টে উল্টে দু'এক ছিপ খায়, খাওয়ায়ও। ইদানিং আমি আর রাহা অনেক কাজই একসঙ্গে করি। আজ পুরো বোতলটাই সে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল—চলিরে, বড় পার্টি আছে। আমি কাম কাজ সেরে অফিসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি যখন—আস্তাবল চৌমুহনীতে যত বারান্দা আর রাস্তার আলোগুলি ছাড়া কিছু নেই।

আমার জগৎ কাঁপছে। এমন সময় পেছন থেকে যদি কোন রিক্সা জানান দেয়—কেমন খুশি খুশি লাগে না! এমন কি ভাড়া কত তাও জিজ্ঞেস করিনি। তবে দুই দুইবার চেষ্টা করেও কিছুতেই উঠতে পারছি না দেখে—সবই আলোর ধাঁধা, কে যেন পাঁজাকোলা করে বসিয়ে দিল আমাকে—তুমি কে ? আমার বুদ্ধিসুদ্ধি সবই এখন নাসারন্ধ্রে ভিজা ভিজা, বাতাস মায়ের কাজ করছিল। আমরাও হেলতে দুলতে যাচ্ছিলাম। আর দিক ভুলে আমি স্যাটেলাইট যেন ল্যাম্পপোস্টগুলি জড়িয়ে আলো দেখছি। হঠাৎ হঠাৎ যে জায়গাগুলি পরিচিত মনে হয়—তারও নামকরণ করতে পারি না। মা বাবা জুঁই—সবাই যেন টুকরো টুকরো ঢেউ, খুব বেশি হলে ভাঙা কলসের টুকরো একটা দুইটা ধরতে পারি, আর সবই ফসকে যায়। ব্যর্থতায়ও ঘুম আসে। বৃন্ত থেকে একটা এঁচড় যেন টুপ করে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। চুল্লাৎ। আরেকটা রথ এখন যুদ্ধক্ষেত্রে শব মাড়িয়ে যায়। আ: !

অনেকক্ষণ ধরে আমার চোখে মুখে আলোর ছিটা দিতে থাকলে, বুকও ভিজে গিয়েছিল বোধহয়। শীত শীত করে। চেয়ে দেখি সেই রিক্সাওয়ালার কোলে মাথা রেখে আমি শুয়ে আছি, আর সে মুচকি মুচকি হাসছে। জীবনে এই প্রথম এত কাছে থেকে একজোড়া সবুজাভ নীল রঙের চোখ দেখলাম। আমি স্প্রিং-এর মত নেমে আবার মুখোমুখি হলাম তার।

—কি নাম তোমার ?

— ভিন্সেন, ভিন্সেন লাগারডো।

—ওরা জলদস্যু ছিল বাবু। ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে নাকি কুকিদের যুদ্ধ হইছিল। সেইবেলা রাজা চাঁটগাওয়ের সমুদ্র থাইক্যা যুদ্ধকরণের লাইগ্যা হেদেরে ধইরা আনছিল।

—তুমি কি পর্তুগিজ ?

—হ। কাশিপুর মরিয়মনগরে থাকি। অখন তো আমরারে কেঁউ পুছে না বাবু !

— দরকার কী ! আমারও তো পোষায় না, আপন মনে হয় না আগরতলাকে। একটি মুখও স্থানীয় দেখলাম না — কি আদিবাসী কি বাঙ্গালী, সবার মধ্যেই কেমন উচাটন লক্ষ্য করি আমি —পরদেশি পরদেশি ভাব। কারো ঘরবাড়ি কাছে ছিল, কারো দূরে—এই যা পার্থক্য। অথচ ফিরে যাবার পথ নাই।

শনিদার চায়ের দোকানে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল একটা লোক। এবার উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এল যেন কাছের মানুষ— আমার নাম আনোয়ার। একমুখ দাড়ি। একটা চারমিনার এগিয়ে দিল আমার দিকে, লাইটারে আগুন ধরিয়ে দিল। মাথায় চুল কম। প্যান্টের ভেতরে শার্ট গুঁজে পরেছে, হাওয়াই চপ্পল পায়ে।

—ইদন খলিফার বাড়ির কাছে আমার বাড়ি। টুকটাক কন্ট্রেকটারি করি - আর্থ ওয়ার্ক।

আমরা দুইজনেই ধুঁয়া ছাড়লাম।

—আমার জন্মকর্মও এখানে। তবু এই ত্রিপুরাটাকে আমি ঘৃণা করি। কেন বলুন তো ?

আমি মুখের পুরনো পান চিবুচ্ছিলাম। শনিদার চায়ের দোকান এখন মেঘাচ্ছন্ন। চোখগুলো রগড়ে দিলেও জ্বলে। বললাম —

—আনোয়ার, একদিন আসুন না আমাদের অফিসে। ভিন্সেন তুমিও এসো।

— না দাদা, শনিদার চায়ের দোকান ছাড়া কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না আমার।

—আপনি কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা বলছেন ?

—না। এটা কোন ব্যাপারই না। ১৯৬৪ সালে যখন নেহেরু মারা গেলেন, তখন ভারতের তদারকি প্রধানমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ। আর এখানে কি হল—'সম্মিলিতভাবে' ঠাণ্ডা মাথায় বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে আমাদের বর্ডার পার করে পাকিস্থানে ছেড়ে দিল সবাই।

এবার আমি আর আনোয়ারের চোখ দুটোকে সুযোগ দিলাম না, কি উত্তর দেব আমি ! আমাদের পাপের কি অন্ত আছে !— আচ্ছা চলি।

—চলিরে, বলেও কিন্তু শাণিত দেখল—দোকান জুড়ে এখন শুধুই আনোয়ার। এজাতীয়

অনেকগুলি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে ত্রিপুরায়। শরণার্থী আদিবাসী সম্পর্ক। পাহাড়ের বুকে ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি অনেক জটিল প্রশ্ন ছাড়াও, আছে মুহুরী চর। বিলোনীয়া সংলগ্ন এই চরটির দখল স্বত্ব নিয়ে ভারত বাংলাদেশে গোলাগুলি চলে। অথচ জায়গাটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমনও না। কী আর করা যাবে! — যারা দেশ চালায়, তাদের মাথা আমাদের মত নয়!

ত্রিপুরার দক্ষিণে পাহাড় পাথর পিলাক আর দেবতামুড়া। খোদাই করা তারা-মা আর সূর্যের বিশাল মূর্তি,—কারা গড়েছে এইসব? উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর-সেখানেও উণকোটি দেবতার মূর্তি গড়া হয়েছে আর একজন শিল্পীর নাম মুখে মুখে ফেরে — কালু কামার।

যাক্! রোদটাকে এখন চোরকাঁটার মত ঠেকছে। লোকজন কম তবে যানবাহন বেড়েছে। আরেকটু বাঁদিকে সরে গেল সে। যেন ভিন্সেনই অলক্ষ্যে নির্দেশ করল তাকে। মানুষে মানুষে এ কেমন সম্পর্ক? নারী পুরুষের মত মনে হয়। বন্ধুত্ব। আমরা পাশাপাশি দাঁড়ালে বুকের মধ্যে পানীয় জল টলটল করে বুঝতে পারি। ছেলেটির চোখে সাত সমুদ্র তেরো নদী, নীল জল দেখলে আমিও আপনা আপনি ডুবে যাই।

এখন একঠায় দাঁড়িয়ে থাকি গণরাজ চৌমুহনীতে। মাঝে মাঝে এমনও হয় - দুপুরের ঘুম সেরে উঠেছি অথচ ভোরের ঘোর লাগে। বা রোজকার ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই দেখলাম-এ কোন্ শহর-আমি চিনি না। বা এইমাত্র যেমন চোখের সামনে মালঞ্চ নিবাসেব পাতালপুরী ভেসে উঠল। আমি সিঁড়ি নেমে সিঁড়ি নেমে, পায়ে রাজকীয় নাগরাই জুতো, এবং অবৈধ প্রেম পিছু নিয়েছে এখন, সেও তার ভবিষ্যৎ জানে না। এই মালঞ্চ নিবাসে একটুকরো এ জি অফিসও আছে। —একদিন রবিঠাকুর এখানে বসে গান লিখেছিলেন—কেন যামিনী না যেতে জাগালেনা! কিন্তু আমাব প্লেস অফ ইন্টারেষ্ট হল—মালঞ্চ নিবাসেব নিচে ঐ পাতালপুরীটা। কেন জানি বার বার মনে হয় — যত অবৈধ প্রণয় এখনো সেখানে বন্দিনী হয়ে আছে। আমি কি তাদের মুক্তি দিতে পারি না?

কারবার দেখ! হাঁটছি গণরাজ চৌমুহনী হয়ে লক্ষ্মী নারাযণ বাড়ির রাস্তা ধরে, আর ভাবছি মালঞ্চ নিবাসের কথা! আসলে অতীত ইতিহাসের একটা আকর্ষণ আছে — বিশেষ কবে রাজকীয়, যেন ইরাণী নর্তকীর নাচের সঙ্গে মেন্ডোলীনও বাজছে।

সত্যি কথা বলতে কি —বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসার সময় যে বিরক্তি ভাবটা ছিল-এখন তা নেই। ভিন্সেনের স্বভাবটাই এমন!

শাণিতের একটা পান খাওয়ার ইচ্ছা হল। কারণ সামনেই টং ঘর দেখা যাচ্ছে, সাবান আর সিগারেটের বিজ্ঞাপনে মোড়া।

রোজগারের অনেক রাস্তা আছে—এবার একটাব পর একটা ভেবে দেখতে হবে তার। হাঁটার গতি কমে আসে। হাতের কাজ বলতে যা বোঝায়—সেরকম কিছু জানে না সে। ব্যবসা করার ক্যাপিটেল নেই। পোষায়ও না। বাকি রইল টিউশনি, ইন্সিওরেন্সের দালালী আর দোকানে দোকানে খাতা লেখা।

ধূর শালা! ছিনতাই করব আমি।

ইত্যাদি প্রশ্ন উত্তর অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকলে শাণিত ভাবে -শালা টং ঘরটা এখনও একই জায়গায় রয়ে গেল? তা না হলে কী! দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি হাঁদারাম।

সে পা বাড়াতে গেলেই নাকের ডগা থেকে ঘাম পড়ে, একবার আকাশটাও দেখে শাণিত। দু-একটা চিল আছে।

সাঁ সাঁ করে সাইকেল রিক্সা তার পাশ কেটে চলে গেল, অন্য কিছু না। আরেকটু সরে এল — জীবনের এতই মায়া!

— আমার চাকরীটা?

— আজ বড় গরম।

—এবার কোন দিকে যাবে বল ? বলতে বলতেও কিন্তু হাঁটছে শাণিত সেনগুপ্ত। পশ্চিম দিকের রাস্তায় সোনালি জল ঢেলে যাচ্ছে একটা ঝাঝরি গাড়ি। সে কাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাঁটছিল। দুই হাতে হাঁটুর কাছে প্যান্ট চিমটে ধরে গোড়ালি পর্যন্ত তুলেই ছেড়ে দিল। রাস্তায় শুধু ধুলো আর ধুলো। এতটুকু জল শুষে নিতে আর কত সময় লাগে! বৃষ্টির প্রশ্ন নেই তবু শিয়াইল্যার বিয়া বিয়া ভাব। এখন আকাশটাই যা জ্বালা-পোড়া হাসি মারছে। এক টুকরো জলে সূর্যের বিকিরণ দেখে লালিমা দেববর্মার কথা মনে হল। তাদের বাড়িতেও থোকা থোকা ঘাস বাগান আছে-গলিচার মত। শাড়িটাকে দুইহাতে গোড়ালির সামান্য উপরে তুলে, বকের মত হাঁটছিল লালী।

হঠাৎই পিঁপড়ে কামড়ে দিল। লাফ মেরে উঠল সে। আসলে সব জল শুষে নিয়েছে তো, রোদই তার পা কামড়াচ্ছে এখন। শাণিত মাথা তুলে আবার দেখে রাজবাড়ির চূড়াটা। একঝাক পায়রা উড়ে গেল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল — জানি, বংশানুক্রমে তোমরা এই পরিবারেরই বন্ধু আছ এখনও। অন্য কোন দেশে মৃণাল মৃণালিনী যেমন।

আমরা যে ত্রিপুরার ইতিহাস পড়ি, তার মধ্যে কৈলাশচন্দ্র সিংহের রাজমালাই প্রামাণ্য মনে হয়। অন্য লেখকদেরও একহাত নিয়েছেন তিনি। তোষামোদ করতে গিয়ে তথ্য লোপাট করার অভিযোগ এনেছেন।

এমন আরো অনেক কথা — এখন আর ইচ্ছে করলেই সব মনে করতে পারে না শাণিত। ননীদা অশীনদা আমার মাথাটা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। তাই নিজের অজান্তেই হাঁটার স্পিড বেড়ে যায়। হঠাৎ থেমেও যায় শাণিত। আবার পেছনের লোকটা কাছে চলে আসার আগেই সে চলতে শুরু করে।

অর্থাৎ আস্তে আস্তে হাঁটছে। মনে করে করে হাটছে। ত্রিপুরার অনেক নৃপতি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। সতীদাহ প্রথা-রাজ অন্তঃপুরকে বার বার শূন্য করেছে। আরেকটা মজার কথা মনে পড়ে — ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পয়লা ফেব্রুয়ারী মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের সুপুত্র ঈশানচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় গর্ভমেন্ট অর্থাৎ বন্ধু ইংরেজরা ১২৫টি স্বর্ণমুদ্রা নজর দাবী করেন ত্রিপুরা সরকারের কাছে। অনেক দরকষাকষির পর ১১১টি স্বর্ণমুদ্রা নজর গৃহিত হয়।

এতদ্বারা একটা কথা স্পষ্টই বোঝা গেল যে — শাণিতের স্মরণ শক্তি নষ্ট হয়নি। তবু ননীদা অশীনদাকে বকাবকি করল।. শালারা তো আমার — চাকরি খাইছে, তাই না!

একটা সিগারেট হলে হবে এখন। টং দোকানের গায়ে পোষ্টারগুলি এখনও তার লক্ষ্যে। হাঁটতে হাঁটতে তিন দফা চার দফার বেশি কর্মসূচি পড়া যায় না — অক্ষরগুলিও খুব ছোট ছোট। এগুলো কি ইমারজেন্সির পক্ষে লেখা?

— আমি জানি না।

শার্টের হাত গুটিয়ে রাখার মত বদঅভ্যাসগুলি এখনও ছাড়তে পারল না শাণিত। ইদানিং বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মা শার্টের কলার, হাতল ইত্যাদি ঠিক করে দেয়। সেদিন চুল কাটা নিয়েও বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেল।

ইমারজেন্সি কিন্তু মেয়েদেরও ছেড়ে কথা বলেনি। নাভির নীচে শাড়ি আর হাতকাটা ব্লাউজ কেউ পরে না এখন। আমাদের জুঁইও আগে স্কার্ট ব্লাউজ পড়ত আর কলেজে যাবার সময় শাড়ি। কিন্তু হাঁটুর উপরে উঠে গেছে তার যে স্কার্টগুলি - সবই মা নিজের ট্রাংকে তালা লাগিয়ে রেখে দিয়েছে।

রাত ন'টা বাজার আগেই বাড়ি পৌঁছে যেতে হবে। না গেলে হিন্দী ভাষায় জবাব দিহি। তাছাড়া ওদের হাতের লাঠিও ভীষণ চঞ্চল। শক্তিমান গাড়িগুলো বিকট শব্দ করে ব্রেক কষে, খাচা ভেঙে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হয়!

কুছপরোয়া নেই। উপায়ও নেই, শক্তিও নেই যখন। জ্বলন্ত সিগারেটটাকে দুই আঙুলের

চিপায় রেখে এমনভাবে মুঠো করেছে শাণিত, ঠোঁটে নিয়ে এসেছে, তারপর বুক পুড়ে পুড়ে মহাটান দিল—যেন নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে দূয়ার কুণ্ডলী, আবার ছত্রাকের মতই ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে থাকবে।

সে নাক দিয়ে একটু একটু ছাড়ছে আর হাটছে। ঝিম ঝিম করছে মাথা। নেশাখোরদের আরাম। এত করেও কিন্তু গণরাজ চৌমুহনী থেকে খুব বেশী দূর এগোতে পারেনি। কী সব হাবিজাবি চিন্তায় সময় খেয়ে ফেলে তার। লোকজন যানবাহন—কিছুই খেয়াল করছে না বা হয়ত সবই দেখছে খেলনার মত। কেন?

— এর নাম শাণিত অবশ্য দিয়েছে — উচ্চাকাঙ্খার অভাব। যাই হউক এখন তার চোখ গিয়ে পড়ল — ব্যানার্জী বাবুদের বাড়ি ঘেসে যে গলি গেছে — তার মুখে, একটি বিয়ে বাড়ির গেইট বানানো হচ্ছে। তলে তলে সানাইয়ের ধূন।

—তাতে কী হয়েছে! হাঁটো। চাকরি বাকরি নাই বেটার আবার বিয়া!

তখনই শালা রাস্তায় উলঙ্গ হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে। আমাদের পাড়ার হরকে বোম বানায়। তার বোন বেতরঙ্গীও সক্কালবেলা রাস্তার পাশে জলের কলে চান করে। এখন যত কার্তিক কার্তিক ছেলে ছোকরা, বাপের চর্বি খায়, প্রত্যেকটাকে ধরে ধরে বেশ্যাদের মাঝখানে মস্করার চূণ আর পানের বটু ছুড়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ধীরে বৎস ধীরে! ভাগ্যের কথা কি কেউ বলতে পারে? কপালের লেখা? মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে হবে তোমার।

এই বিয়েটা কি হিকনানি? নাকি কাইজাগনানি?

— যা খুশি হউক।আমার প্রশ্ন হল সেই নেড়া পাহাড় থেকে নেমে আসা দুইজন দাদু-নাতি এবং তাদের হাতে একেকটি টাক্কাল। ত্রিপুরী বিয়ে বাড়িতে তোরণ বানানো হবে। বাঁশের মধ্যে ফুল। এই শিল্পে ওরাই শ্রেষ্ঠ। ত্রিপুরীরা ফুলের গয়নাও বানাতে পারে ভাল।

পক্ককেশ বৃদ্ধটির হাতের টাক্কাল তরুণের চেয়ে দ্রুত চলে। মরা বাঁশ একটা অথচ তার চামড়ায় কতরকমের ফুল ফুটে দেখ। দিন ঢলে যাচ্ছে নাকি? না। মাত্র চারটে বাজে। কারণ আমি ভাবছি-বুড়োর চোখের কোল দুটি ফোলা ফোলা টস্ টস্ জলে ভারি লাগছে, সন্ধ্যার আগে কাজ শেষ করতে পারবে তো?

চোখে ছানি পড়লে দেখেছি-ভেতরটাও কুচকানো লাগে। মনির দুইদিকে জল রঙের পিচুটি লেগে রয়েছে মনে হয়। ছেলেটির মধ্যে তবু কিছু অসহিষ্ণুতা দেখে ভাল লাগল। সে একটা বিড়ি ধরাল এবং ধুঁয়া যে ছাড়ছে তা বুড়োর নাক মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাসে মিলায়।

এখনও রাজবাড়ি, বাণামহল এবং কর্তা ব্যক্তিদের বাড়ি ঘরে অনেক দাসদাসী কাজ করে। ওরা অনেকেই নেড়া পাহাড়ের মানুষ। নূতন দালানবাড়ি, মেরামতি ইত্যাদি যাবতীয় কাজই ওরা করে, করে আসছে বংশানুক্রমে। রাজত্ব গেছে প্রায় পঞ্চাশ পছর। সে সময় যে মজুরি পাওয়া যেত-এখনও তার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। তাছাড়া রাজবংশীদের সামনে চোখ তুলে কথা বলা যায়না। ফলে ভিতরে ভিতরে জমছে অভক্তি। কিন্তু উপায় কি? ওয়ানচাদের বাড়িঘরে গিয়ে কাজ করতে একেবারে ভাল লাগে না। ওঁরাও ঠকায়। তাই স্বজাতির হাতে মরাই ভাল। এখনও কর্তাদের মেজাজ রাজকীয় রয়ে গেছে। ভুলভাল হলে যেমন লাঠিপেটা, আবার খুশি হলে সোনাচান্দিও মিলে যেতে পারে!

এবার অন্য প্রসঙ্গ। সত্যি করে বলতো শাণিত—এদের দুর্দশার জন্যে কারা দায়ী? দাঙ্গা পীড়িত শরণার্থীরা, নাকি ত্রিপুরার মহারাজা আর তাদেরই স্বজাতি এলিট উপজাতিরা?

নুতন করে বাঁচার তাগিদে উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরা এখানে অনেক পাকা কাজই করছে অবশ্য। বিশ্বাস নষ্ট করেছে আদিবাসীদের। তাদের আহারে বাসস্থানে ভাগ বসিয়েছে। সত্যি কথা কি — উদ্বাস্তু বলতে এখন বাঙ্গালী উপজাতি দু'দলকেই বোঝায়।

একঝাঁক টিয়া এবার টেঁ টেঁ করতে করতে শাণিতের এত কাছ দিয়ে গেল, সে দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিকই, একরকমের অস্বস্তিও হল, অথচ তলে তলে তীব্র ভাললাগাও আছে। হঠাৎ হঠাৎ কোন মাছরাঙা পাখির রঙ দেখেও এরকম হয় বা হয়ত অতৃপ্তি বেড়ে গেল।

শাণিত উপরে দেখল, ভাল করে দেখল, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না সেই চিলগুলিকে। পেছনে তাকিয়ে দেখল—একজন মাত্র ট্রাফিক পুলিশ বিশ্রাম পজিসনে। এবং সামনে এখন ভিড়, দূরে ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দোরগোড়ায়।

ফলে আবার সে আস্তে আস্তে হাঁটে এবং ইতিহাসে ফিরে যায়। প্রজাপালন এবং রাজ্যশাসন কথা দুটি বহুকাল ত্রিপুরায় কোন অর্থ বহন করে না। রাজার রাজত্ব বলতে শুধু রাজধানীর প্রশাসন এবং অন্যত্র চৌধুরীদের কর আদায় ইত্যাদি ছাড়া রাজায় প্রজায় আর কোন বিনিময় ছিল না। ত্রিপুরা সরকারের কাছে বন্ধু ফিরিঙ্গিদের পাওনা দিন কে দিন বাড়ছে। ওদের খুশি করতে হচ্ছে অন্য পথে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় কজন স্বদেশী সৈনিক এসে আশ্রয় নিয়েছিল ত্রিপুরায়। কিন্তু মহারাজের লোকলস্কর তাদেরে ধরে ধরে আবার ইংরেজদের হাতেই তুলে দিয়েছিল। এদিকে সম্পদ বলতে যা কিছু ত্রিপুরার নিজস্ব, সবই লোপাট করে নিচ্ছে চোরাকারবারীরা। প্রজাদের দুর্দশার কথা বলে লাভ নেই। রাজস্ব আদায়ের নামে খুনখারাবি। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, ধীরে ধীরে বন পাহাড় সবই সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে, ফলে জুম নেই। তবু পরিবার পিছু জন প্রতি কর ধার্য করে দিয়েছে রাজ্য—এ টাকা দিতেই হবে। সমর্থ পুরুষ হলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—বেগার মুটে মজুর।

রাজন্য ত্রিপুরার সর্বশেষ চিত্রটিকে এভাবে এঁকে ফেলার চেষ্টা করল শাণিত। ধরা যাক তখিরাই বা খুমতি ওরা তৎকালীন চরিত্র। বন পাহাড় মানেই তো পৃথিবীর অচ্ছুৎ অংশ, এদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে নেই—এতে সভ্য সমাজের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে! সত্যি পড়ে কি?

কিন্তু চৌধুরীদের পোষা কুত্তাগুলি ঘেউ ঘেউ করে জংগলের মধ্যেও ঢুকে। তখিরাই ভাবে—আমাদের কাছ থেকে জুমের জায়গা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে যখন, আর গাছের উপরে বাঁশের মাচা রেখে লাভ নেই। চৌধুরীরা এগুলিকেই বলে ঘর সংসার, প্রতিটি পরিবারে লোকজনের মাথা গুণে গুণে কর বসায়।

তাই খুমতিদের এখন আর ঘর নেই। হাঁড়িপাতিল ভেঙ্গে ফেলেছে ওরা। পরিবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে জংগলে ঘুরে বেড়ায়। তবু ঘেউ ঘেউ করে আসে। হয়ত আমার পাশেই কোন ঝোপে বনমুরগি ধরে ঝাপটা ঝাপটি করছে আর আমরা যে যার জায়গায় বসে চুপচাপ শুধু দেখছি।

জলের সেই ঝাঝরি গাড়িটা এখন আবার এদিকেই আসছে, তবে জল নেই, দু-এক ফোঁটা পড়ছে কেবল, ঘড়ং ঘড়ং শব্দ, আগে তো ভারি ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়িগুলি সব এমনই—লড়খড়া। গাড়িটা আমার কাছে এসেই ব্রেক কষে থামলো। তখনও গড় গড় করছে। স্টিয়ারিং ছেড়ে গলা বাড়িয়ে—হ্যালো, ইস্টিং টি ফাইট।

—আরে রবিদা!

আমরা দুজনেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে হেসে নিলাম এবং চলতে শুরু করলাম —যে যার দিকে।

যুদ্ধের মরা রবিদাও পাঠশালার গণ্ডি পেরোতে পারেনি। ইংরাজি বলার সখ। এরকম হলে কেন জানি শাণিতের খুব কষ্ট হয়।

ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ে যখন দুর্ভিক্ষ, তখন শহরের লোকগুলি কি নিয়ে ব্যস্ত ছিল জানো? —ইতিহাস নিয়ে। সত্যি মিথ্যা ইতিহাস রচনার ধুম পড়ে গিয়েছিল, নিজেদেরে মহাভারতীয় কর্মযজ্ঞের শরিক প্রমাণ করতে হবে। তবেই তো আসবে কৌলিন্য!

এই যে নিজের সঙ্গে ধোঁকা, প্রজাদের সঙ্গে ধোঁকা—এসবেরই তো প্রতিবাদ করেছিল

রতনমণি। মরেও ছিল।

তবে প্রজাদের নিয়ে প্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেছিল ভারতীয় কমিউনিস্টরাই। বিশালগড়ের কাছে গোলাঘাটি, খোয়াই-এ চম্পাহাওর আন্দোলন শুরু করেন ওরা। একটা কথা শাণিতকে বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু কোন লাভ হয়নি—তুমি যে বেটা তিন পয়সার কেরাণি, তাও চাকরিটা ধরে রাখতে পারলে না, রাজনীতি নিয়ে কচকচি কর কেন?

এখনও এই রাস্তায় সে বোকার মত দাঁত বের করে হাসছে। —আমি কবে রাজনীতি করলাম! আমার বাবাকে দেখেছি স্বদেশী এবং কংগ্রেস করয়াদের তল্পিবহন করতে। প্রশ্ন হচ্ছে দেশটা যেদিকে জাহান্নামে যায় সেদিকে আমার চোখ কানও যায়, তা আমি রুখব কি করে?

আসলে আমি দাঙ্গা দেখেছি, দাঙ্গা দেখেছি,দাঙ্গা দেখেছি। তিনবার এই কথাগুলি উচ্চারণ করেও কোন ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারল না এখন। মা বলে—আরে, আমরা যখন পাকিস্তান ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় আসি তখন তুই আমার পেটে। তারপর আসামে গেছি—সেখানে যদিও অসমিয়া বাঙ্গালীতে দাঙ্গা হয়, কিন্তু আমরা ছিলাম বাঙ্গালী প্রধান কাছাড় জেলাতে। সেখানেও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা, কিন্তু দাঙ্গার সময় আমরা কি আর বাইরে থাকতামরে!

তাহলে আমি অভিমন্যু। আমি দাঙ্গা দেখেছি, আমি দাঙ্গা দেখেছি।

কই জানি দেখলাম! ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখায় এরকম কোন দৃশ্যই ছিল না, তবে বোনের ঘরে ডাই রাত কাটাতে এলে জীবনে এই প্রথম আমি দেশভাগ দেখলাম।

এমনি টারমিনেশনের কাগজখানা যেদিন হাতে পেলাম—আমার বারবার মনে হতে লাগল —মায়ের কথা হেলাফেলা করা উচিত হয়নি—রাজনীতি-এ দেশটারে খাইছে, আরো খাইব।

আগে যেমন সমাজপতিদের মাথা গুনে গুনে ভোটের রাজনীতি হত, এখন তেমনি প্রতিটি ব্যক্তিকে নজরবন্দী করে একই কাজ করা হয়। তুমি কংগ্রেস, তুমি সি পি এম, তুই নকশাল, আর ইদানিং বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতি উপজাতি আন্দোলন কর তুমি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ জি অপিসের দপ্তরি রাখালদা আবার অন্য কথা বলেন — বাবু, আপনারা হইলেন রাজনীতির মরা আর আমরা টাকা পয়সার।

শাণিত ভাবে—এখন যদি আমি রাখালদাকে বোঝাতে যাই যে, টাকা পয়সার মরাও আসলে রাজনীতির মরা, তাহলে অনেক সময় নেবে, তাই চুপ করে গেল।

কিছুদিন আগেও আগরতলায় স্থানীয় আদিবাসী ছাড়া পাহাড়ের মানুষ একদমই চোখে পড়ত না। যা'ও দু-একজন রিক্সাওয়ালা ছিল — ওরা শহরতলীর। আর এখানকার রাজনৈতিক দলেরা যে মহামিছিলের আয়োজন করে, বেটাগিরি করে নিজেদের লোকবল দেখায়, তখন যত সরল সোজা পাহাড়ি লোকজনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসে আগরতলায়।

ইদানিং অবশ্য এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ত্রিপুরার বিরোধী দলগুলি যে গ্রামপাহাড়ে দুর্ভিক্ষের কথা বলে সবসময়—বর্তমান অবস্থাটি যেন সত্যি সত্যি তেমনি। নইলে কি দল বেঁধে বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চা কোলে কাখে করে এমন ভাবে বন উজার করে চলে আসে কেউ? রাতের আগরতলা ও তার বারান্দাগুলি এখন আর গরু ছাগলের দখলে নেই।

ওরা দলে নেমে আসে ঠিকই, তবে সহরে ঢোকার মুখে যে যার মনস্থ করা কাজেই যায়। মেয়েরা বাড়িঘরের কাজই পছন্দ করে বেশি। এবং পুরুষেরা মুটে মজুর, মুনি কামলা, রিক্সাও চালায় কেউ কেউ। তাছাড়া ইদানিং অনেক নুতন নুতন দৃশ্য দেখা যায়। হাটে বাজারে, রাস্তার পাশে ছোট ছোট টং নিয়ে বসেছে আদিবাসীরা। পান বিড়ি বিক্রি করে। টুকটাক জুমের তরকারি নিয়েও বসে মাঝে মাঝে। আজকাল আর দামাদরি করে কোন লাভ নেই, দিন কাল বদলে গেছে। সংখ্যা এবং ওজনে ওদের সঙ্গে ঠকাঠকি সম্ভব নয়।

শুনেছি পাহাড় ঘুরে ঘুরে আর মাইট্যা আলু মিলে না। একমাত্র ভরসা শিকড় বাকড় । পোকা যে পোকা উদচিংড়ে — ওরাও এখন শহরে বাস করে। জংগলের ভেতর আগে বনগয়াম, কাঠাল ইত্যাদি পাওয়া যেত—এখন গঞ্জের যত কাঠকুড়ানি ছেলে-মেয়েগুলি ডাকাত পড়ার মতই পঙ্গপাল সব উজাড় করে পালায়।

আর রিজার্ভ শব্দটি হল পাহাড়ের শত্রু বিশেষ। পুলিশ রিজার্ভ, রিজার্ভ ফরেষ্ট শুনতে শুনতে কান ঝালা পালা। অর্থাৎ জুম বন্ধ করতে হবে। জ্বালানী জোগাড় করা যাবে না জংগল থেকে। কখনো সখনো বন্য শুয়োর শিকার করে যে মচ্ছব হবে -- সে আশাও নেই । শিয়াল ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি পাখী পর্যন্ত বসতে চায় না ত্রিপুরার জংগলে। আর সবচে ভয়ের ব্যাপার হল যত নূতন নূতন অসুখ। এখন মাত্র একঘন্টার বিষবেদনাতেই পাখি পালায়।

আজকাল আরেকটা কথা শাণিতকে ভাবায়—দলে দলে এই যে অবতরণের পেছনে কে আছে? দেবতা লামফ্রা নাকি ?

কমিউনিষ্টদের যখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ে, তখন ফেরারিদেরে ওরাই কিন্তু বুকে আগলে রেখেছিল, ছদ্মনামে ডাকতো প্রিয় নেতাদের। লামফ্রা, খিল্লঙ, গণ্ড—এই নামগুলোর পেছনে তখন কে বা কারা — অনেকেই তা জানে।

তেমনি আজো পাহাড়ে ছায়া দেবতা আছেন সন্দেহ করে শাণিত। দেবতা লামফ্রা নাকি বুড়া হয়ে গেছেন ? তার হাত থেকে সমাধান সূত্রগুলি কে বা কারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

কদিন আগে শাণিতদের বাসাতেও একটা কাণ্ড ঘটে গেল। শীত শীত পড়ে সময় ভোরে যেমন ঘুম লাগে, সেদিনও বোধ হয় ঘুমিয়েই ছিলাম। 'ধুম' করে একটা শব্দ শুনে হঠাৎ, চুপচাপ কান খাড়া করে পড়ে রইলাম আমি, মাকে ডাকলাম, উত্তর দিল বাবা—কিতা অইছে রে? মায়ের বিছানা থেকে জুঁই বলে উঠল—আমিও শুনছি শব্দটা —ধুম ধুম।

—তা অইলে তো দরজায় লাথি মারতাছে কেউ ?

—হ মারছিল! ডাকাইত পড়ছে না কিতা ? নিত কিতা?

— আইজ কাইল সব সম্ভব, দিন কাল ভাল না, পাহাড়ে অভাব, অশান্তি।

তখনও অন্ধকার কাটেনি। আমি চকির তল হাতড়ে হাতড়ে আমার ছ য় সূতি লোহার রডটা তুলে নিলাম। ফিস ফিস করে বাবাকে বল্লাম—তুমি দরজা খোল। আর আমি পাঁঠা বলি দেয়ার মত দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারে।

দরজাটা খুলতেই আগের চেয়ে আরো জোরে শব্দ হল— ধপাস। মায়ের হাতে মিটমিটে লেন্টন ধক্ করে উঠল। গাজনের হরগৌরী যেন ক্লান্তিতে গলা জড়াজড়ি ঘুমাচ্ছিল দরজায় ঠেস্ দিয়ে। এবার ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। তখনও ভয় কাটেনি আমাদের । আমি শুধু লোহার রডটাকে অন্ধকারেই নামিয়ে রেখে দিয়েছি।

—তোমরা কেডা?

— আগে বুইজ্যা লও। বাইরের লাইট জালাও।আরো থাকত পারে ।

— না না, আমি তখিরাই বাবু.আর ইডা খুমতি, বউ, রাইত হইলে রাস্তার পোলাপানে বড় যন্ত্রনা করে, ঘুমাইত পারেনা ।

– তোমরার বাড়ী কই ?

— বড়মুড়া বনকুমারী ।

এবং ডামাডোলের মধ্যে কখন যে ভোর হয়ে গেছে আমরা খেয়াল করিনি । মা একটা কলাই করা থালায় চার কাপ চা নিয়ে এসেছে । দুই কাপ আমরারে দিল দুই কাপ তখিরাই খুমতিরে ।

— তুমি ঘরের কাম পারোনি গো মা ?

খুমতি মাথাটা উপর নিচ করল। আর তখিরাই -কইল- আমিও ঘুমাইব রাইতে ।

এ ভাবেই আগরতলার অনেক বাড়ী ঘরে এখন ওরা পেটে ভাতে কাজ করে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল— ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস। আমি শুধু খুমতিকেই দেখতাম। আর মনে হত - এখনও আমি একই ভুল করি -খুমতির পিঠে কি পাথর পাহাড় লেগে রয়েছে ? তাহলে অনেক কিছুই তার এখনও অনাবিষ্কৃত।

সে অবশ্য আমাকে পাত্তাই দিত না।- তাই আমার পাপের আকার পরিণত হয় নি কোনদিন।

খুমতির বয়েস পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, তঁখিরাই-এর পঁয়তাল্লিশ হবেই। সন্তান সন্ততি নেই। তবু কি মনে হয় জানো—যে কোন দিন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে অঙ্কুর। এতা উর্বরা সে।

একদিন দেখলাম জুঁই খুমতিকে একটা ব্লাউজ পরতে দিয়েছে আর দুই জনে কথা বলার সময় দুষ্টুটা আমাকেই দেখছে আড়চোখে। আরেকদিন শুনলাম মা বলছে—তোমার পাছড়ার ওপরেই শাড়িটা পড়ে ফেল।

আমি আর কি বলব। আমি শুধু ত্রিপুরার হস্ত শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। পাছড়া রিয়া।

তবে রাতের বেলাতেই আমাদের সবচে অসুবিধা হত। তখিরাই শুয়ে থাকত আমার বিছানার পাশে মেঝেতে চাদর পেতে। আর ঘুমতির বিছানা ছিল মা'দের ঘরে। ওদের ঘুম মানে কি- শুয়ে পড়লেই নাক ডাকার হুড়োহুড়ি। তবে কাম কাজ যেদিন বেশি, আমি আর জুঁই তো অনেক আগেই ঘুমিয়ে থাকতাম, ওরা তখন কলতলায় খুটিনাটি শব্দ করে, বিশেষ করে জল ঢালার শব্দ।

তখন নিজেদের মধ্যে ককবরগে কথা বলত। পরে অবশ্য আমি আর জুঁই আলাদা আলাদা পুছতাজ করে অনেক কিছুই শিখে নিয়েছিলাম। এক কাইশা, দুই কুনউ। পুরো একদিন বোঝাতে সালসা। শুধু দিন হলে সালনুউ।

সব দেখে শুনে একটা কথাই মনে হল- মহাভারতীয় উপাখ্যান নয়—উয়ার প্রভাবই ওদের মধ্যে বেশি। বাঁশ পূজা বাঁশ খাওয়া ইত্যাদি। তখন প্রচুর পরিমাণে বাঁশ পাওয়া যেত ত্রিপুরায়।

আর আমাকে আকর্ষণ করেন দেবী বুড়িবক। 'উনারা সাত বোন। বাকি ছয়জনই স্বামী ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। একমাত্র তিনি অবিবাহিতা। তিনি মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া করেন।' এজন্যেই ত্রিপুরাকে সাতবোন পরীর দেশও বলা হয়ে থাকে।

এখন শাণিতের তন্ময়তা ভাঙে ঢিল খেয়ে। একেবারে কপালটার মধ্যে— মাগ্‌গো ! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে শাণিত। কিন্তু খুঁজে দেখল— কেটে টেটে যায়নি খুব একটা, ফুলেও উঠেনি, তবে চামড়া কিছুটা থেতলে গেছে মনে হয়— কী করে, কী করে হল ব্যাপারটা ! 'ও' ঢিলটা ছিল ঝুরঝুরে মাটির। মুখ এবং হাতের গুড়া মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে আবার সে উঠে দাড়ায়, মূহুর্তে স্নানের মতই ঘেমে গেছে—

— কেডারে শালা !

— ধর্ ধর্ পঙ্খীটারে ধর্

যেন ধক্ করে শৈশবে পৌছে গেল সে, খেলার মাঠে অঞ্জন নির্মল পনই ওদের সাথে, তার হাতেও একটি কঞ্চি বাঁশের ঝাড়, আর লাফাতে লাফাতে গুড্ডির সূতো — চোখ কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, মাছরাঙা বা ডোরাকাটা রঙের হলেই ঘুড়িটাকে পঙ্খী ডাকতাম আমরা।

কিন্তু ডাকে-ওঠা ষাড়ের শরীর থেকে যে গন্ধ বের হয়, এখন চারদিক ম ম করে, বমির ভাব করছে শাণিতের—

— ধর্ ধর্, পঙ্খীটারে ধর্ —

যেন আগুন ধরে গেল চর্তুদিকে। শাণিত দেখল — মানুষের ইন্দ্রিয় জাতীয় দাহ্য পদার্থগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। শুকনো আঁচে তার বুকের ভিতরটাও স্বাভাবিক খড়খড়ে হয়ে পড়েছে। নাভির গোড়া থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে জমে যায় বুকের খাচায়, দম বন্ধ বোতলটার তালু অব্দি।

— এই মুহূর্তে পল্মী দেববর্মাই কি একমাত্র আলোচ্য বিষয় !

— ধর ধর, পল্মীটারে ধর—

এমন যৌন চ্যাঁচামেচি এর আগে কোনদিন শোনা যায়নি এ শহরে। আরে শোনো না ভাই—এখন ইমারজেন্সি কথাটি পর্যন্ত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে পল্মীর সামনে।

সে লস্কর সম্প্রদায়ের মেয়ে। দেখতে শুনতে অনেকটাই ত্রিপুরীদের মত। গায়ের রঙ বাঙালীদের মত বাদামী আবার ফর্সাও হয়। কিন্তু ওরা অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও এস টি সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারল না। না বাঙ্গালী না আদিবাসী। উপাধি দেববর্মাও আছে আবার দাস চৌধুরীও লেখেন অনেকে।

ফলে শাণিতের এখন মনে হয়—এই যে সমতলী আদিবাসী ইত্যাদি সমস্যা—এর একটা সমাধান সূত্র পল্মী দেববর্মার কাছে মিলিলেও মিলিতে পারে।

দেখা যাক পল্মী রহস্যটা কি আসলে। আগরতলা শহরে আরো একজন নামকরা পাগলের নাম দিগম্বর।

আমরাও কি কম পাগল নাকি, —এই যে এখন আমি কচ্ছপ পায়ে হাঁটছি,—আমার চোখগুলিও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে—ঘোলাটে বোকা বোকা। আসলে মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই কিছুই। রাস্তা দিয়ে আমরা যতটা হাঁটি, রাস্তা ছেড়ে অন্যপথে আরো বেশি। তবে বেশিরভাগ মানুষই কোমড়ে দড়ি বেধে রাখে, ফিরেও আসে চটজলদি। কেউ কেউ পারে না।

যেমন সেই নেড়া পাহাড় থেকে নেমে আসা দাদু নাতির কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে এখন। ত্রিপুরী বিয়েটা কি আজই ? বর আসার আগেই কি ওরা গেইট কমপ্লিট করতে পারবে ?

হঠাৎ আকাশ মেঘলা হয়ে গেল। হুড়হুড় শব্দের মধ্যে এখন থতমত দাঁড়িয়ে রইল শাণিত। বধ্যভূমিতে বাতাসও শোঁ শোঁ শব্দ করে। শাণিত লক্ষ্য করে—এনিমেশন ছবির মত একজন পরীকে রীতিমত তাড়া করে নিয়ে আসছে কালো কালো মেঘগুলি। একই সঙ্গে তার মনে হল—ইনিই তবে প্রিয়তমা বুড়িবক হবেন।

অবশ্য পুলিশের বাঁশি আর বুটজুতার আওয়াজ এখন এমন শুনাচ্ছে —মনে হবে একবার ধরা পড়ে আবার তিনি ফসকে গেছেন।

তার গায়ে বস্তাকাটা পোষাক, তাতে চূণ দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে—পল্মী। সে ছুটছে এবং বিড় বিড় করছে—তোরও নাই, আমারও নাই—আয় আমরা বিয়া বই।

বয়স ১৭-১৮ হবে। রাস্তায় নেমেছে—তাও মাত্র দিন কয় হল। আর দোষ হল তার একটি, খুব বেশি ভিড় দেখলে—কখন যে সে দিগম্বরী হয়ে পড়ে এবং ইচ্ছে করেই জনতার চোখেমুখে ছুটতে থাকে কেবল। এমন দমবন্ধ করা চিকন ফর্সা আর বাদামী রঙের শরীর পল্মীর ! উড়ন্ত চুলগুলি মেঘের মধ্যে যেন জল তিরমিরি করে। আর কাকতাড়ুয়ার পরিধেয়টি তার দুইদিকেই হাতকাটা। কিন্তু বগলতলার মাপ ভুল হয়েছে। তারপর হাঁটু থেকে সবটা পা, দুই ডানা ও গলার যতটা উন্মুক্ত, রোদে পুড়েও যেন মঙ্গল হয়েছে—নজর লাগে না।

কিন্তু হঠাৎ যখন ঢাকনা খুলে দেয় পল্মী, জ্বাল দেওয়া দুধের ছচপেন দুই রঙ ধরে।

জনতার মধ্যে রতনের বাবাকে এখন স্পষ্ট দেখতে পেল শাণিত, পাশের বাড়ির প্রফেসর মেসো ও বিশু ডাক্তারকে এ সহরের সবাই চেনে। শাণিত অন্য সময়ও দেখেছে—পল্মীর পিছে পিছে যারা ছুটে যায়—তারা শুধু পতিত শ্রেণীর লোক নয় বা তাদের অল্পবুদ্ধি পোলাপানও না —যারা অস্ত্র বলতে শুধু মাটির ঢেলা বোঝে।

ধেয়ে আসা জনতার রঙ যে মেঘের মত হয়—তাও শাণিত আগে জানতো না। কারণ লোকগুলোর মাথা, হা-করা মুখের ভিতর এবং পল্মী দেববর্মাকে ছুঁয়ে ফেলার জন্যে উদগ্রীব প্রত্যেকটি হাতের চেটোতে এখন কিছু কিছু অন্ধকার আছে।

আমাদের রতনের বাবা সরকারি উকিল বাবু, আজ কোন কাজে বোধহয় তাড়াতাড়ি ফিরছিলেন,

এখনও তার গায়ে কালো আলখাল্লা। তিনি চাবি দেয়া পুতুলের মত ছুটছিলেন, প্যারাসুটের মত আটকে আটকে যাচ্ছিলেন বারবার, তবু তার অতিলম্বা হাতগুলি পেছন থেকে পক্ষীকে স্পর্শ করল। তিনি তার দুই হাতের আঙুলে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। মিশরীয় নৃপতি যেভাবে নিজেই সিংহাসন হয়ে বসে থাকেন তেমনি পক্ষীও এখন তার কোলে বসল। গলাকাটা, ছালচামড়া তোলা গরম গরম মুরগিটা। টপ টপ করে রক্তও পড়ছিল বোধহয়—অত খেয়াল করা যায়নি। তবে এটা ঠিক— পতনোন্মুখ সমাজটাকে রক্ষা করার দায়—শুধুমাত্র পুলিশ বা ফায়ার ব্রিগেডের উপর ছেড়ে দিলে চলে না। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা তাহলে কি হবে? এখন কালো পিঁপড়ের ঝাঁকে পক্ষীকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তবু সে বিড়বিড় করে চলেছে ঠিকই—তোরও নাই, আমারও নাই—আয় আমরা বিয়া বই।

ভোঁকাট্টা ঘুড়িকে যেভাবে সবাই একসঙ্গে চোখে দেখে না, কেউ কেউ দেখে, অথচ ছুটতে থাকে, অবশেষে কাড়াকাড়ি করে ছিঁড়ে ফেলে—ঠিক সেভাবে এখন এই প্রকাণ্ড ভিড়টাও ফুট্টুস। পরিবর্তনের মধ্যে শাণিত শুধু দেখল রৌদ্র এখন বাড়ি ঘরের চালে, গাছের গলায়। আর এতক্ষণ যে শরীরী ধকল গেল তাতে শার্টপ্যান্ট ভিজে জবজব্। দুইপায়ে চলৎশক্তি ফেরেনি তখনও। এমন সময় সে দেখল—সেই নেড়া পাহাড়ের লোকদুটিও কামকাজ শেষ করে তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং শাণিত হাঁটতে শুরু করেছে ঠিকই, তবে পক্ষী ঘটনাটির ঘোর কাটতে কাটতে কতসময় যে এমনি চলে গেছে ভগবান জানে। মাঝখানে একটা পান খেয়েছিল মনে আছে, তবু মুখের ভেতরটা এখন কুলকুচি করা শূন্য মনে হয়।

এই বিরক্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তির একটাই পথ আছে—পূর্ববর্তী কোন অবস্থানে ফিরে যেতে চাইছে শাণিত, সেখান থেকে আবার শুরু করতে চায় সে। মাঝখানের ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কি?

আট

সেই ত্রিপুরী বিয়েটা হিকনানি নাকি কাইজাগনানি ? অবশ্য আগরতলা শহরে এখন এসব প্রশ্নের কোন মনেই হয় না। প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে মানে হিকনানি। আর মুরুব্বিরা যে বিয়ে দিয়ে থাকেন তার নাম কাইজাগনানি। বিয়ের আগে এক বছর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ওদের খুশি করে তবে বউ আনতে হবে। যতসব পুরনো প্রথা—শুধু সহর কেন—গ্রামপাহাড়েও এখন আর কেউ মানে না।

কিন্তু শাণিত শানাইয়ের হাল্কা সুরটা শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না কিছুতেই এবং আরো কিছু ইতিহাসের কানাকড়ি তারে সুড়সুড়ি দিচ্ছে এখন—

যেমন একটি শ্বেতহস্তী। ত্রিপুরার জংগলে সাদা হাতি—বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। কিন্তু একসময় পার্বত্য ত্রিপুরার বনজ সম্পদ ঈর্ষা হওয়ার মতই ছিল। হরেক রকমের কাঠ, মূল্যবান যত গাছগাছালি, ঔষধি ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন জাতের পশুপাখি ছিল। ধনেশ পাখি, হাতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার তো রাজ্যের ভেতরেই একটি সাদা হাতি নিয়ে একজন কুকি সর্দারের সঙ্গে মহারাজ ধন্যমানিক্যের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। তাছাড়া হাতির লোভে আশপাশের রাজ্যগুলিও ত্রিপুরা আক্রমণ করত বারবার। সে সময় শুধুমাত্র হাতি থেকেই রাজস্ব পাওয়া যেত বছরে ২৩-২৪ হাজার টাকার মত।

হঠাৎই ইতিহাসের সূত্র তার হাতছাড়া হয়ে পড়ল, ভালই হল, সারাক্ষণ কাসুন্দি ঘেটে ঘেটে আর ভাল লাগছে না। —সেই দাদু নাতি তার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারেনি এখনও। নাতি ভাইয়ের কাঁধে টাক্কালটাকে কুড়ালের মত লাগছে। এবং খুব সম্ভব শাণিতের বাঁ-কান ঘেঁষে গিয়েছিল তখন।

এবং কি জানি কি ভাবের উদয় হল তার, জোরে জোরে উচ্চারণ করতে লাগল সে—তোমরাও উদ্বাস্তু হে! তোমাদের এই অবস্থার জন্যে আমরাও দায়ী। তুমি কি আমার চেয়ে বড় প্রেমিক দাদুভাই ? কিন্তু ছলাকলা আমরা ভাল পারি। প্রকৃতিও প্রতিবন্ধী তখন। বন্দিনী শস্যক্ষেত্র। তুমি দখলসত্ত্ব কথাটিরও কোন গুরুত্ব দিলে না। আমরা তোমার সরলতার সুযোগ নিয়েছি হে একলব্য ! সম্মিলিতভাবে আঘাত কর আমাদের, সহাবস্থান শেখাও।

একই কথা অনেকেই বলেছে শাণিতকে। মানুষ যখন কার্যকারণে একা হয়ে পড়ে বা ইচ্ছে করেই একা থাকে, তখন কি হয় আসলে, জ্ঞানে অজ্ঞানে নিজের সঙ্গেই কথা বলে সবাই। চিন্তা দুশ্চিন্তার বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে। পংখী দেববর্মার সঙ্গে এ ব্যাপারে তার মিল আছে। পাগলীর মনের কথা মানে হল মুখেও উচ্চারিত হবে। কেন মাঝে মাঝে শাণিতেরও মনের কথা মুখে উঠে আসে ? যেমন এখন একটি মেয়ে তার পাশ কেটে গেলেই কথা বন্ধ করে শাণিত। নিজে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটিকে এগিয়ে দেয়। সর্বশেষ যে শব্দটি সে উচ্চারণ করেছিল, এখনও জিভের ডগায় ধরে রেখেছে—শেখাও, সহাবস্থান শেখাও হে একলব্য এবং একই সঙ্গে তার কানের পাশ দিয়ে ঘন নীল রঙের পুলিশ ভ্যান ছুটে গেল। মুহূর্তে গুটিয়ে গেল কচ্ছপটা। দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশে সময় নেবে।

ভ্যানগুলির মডেলও প্রায় একই রয়ে গেছে। তবু ইমারজেন্সি কথাটি যেন গন্ধ ছড়ায়, সন্দেহের বশে বা শত্রুতার বশে বা হয়ত নিতান্তই ডেইলি কোটা ফুলফিল করার উদ্দেশ্যে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে ওরা।

আগরতলায় জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার আগে ভীষণ বিশৃঙ্খলা চলছিল। ১১ই মার্চ ১৯৭৫ ইংরেজীতে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার প্রশ্নে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। একনাগারে ১৯ দিন চলে। গোটা ত্রিপুরারাজ্যটাই অচল হয়ে পড়েছিল তখন। এবং প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ সরকারী কর্মচারীর এই আন্দোলনকেও গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল

শুধুমাত্র ডবল ইনক্রিমেন্টের লোভ দেখিয়ে। এখন কেউ কি বিশ্বাস করবে—যত লোক অংশগ্রহণ করেছিল সেই ষ্ট্রাইকে প্রায় তত লোকই ডবল ইনক্রিমেন্ট নিয়েছিল।

আর এখন তো ইমারজেন্সি। চারদিকে গুজবের ছড়াছড়ি। উদয়পুর টাউন হলের মাঠটা নাকি বেদখল হয়ে পড়েছিল অনেকদিন ধরে। এখন জরুরী অবস্থার সুযোগে সেটাকে মুক্ত করা গেছে। এরকম টুকটাক সুফল ভাবলে সুফল—না ভাবলে নাই।

যাই হউক সামান্য এক বৈকালিক ভ্রমণে কত ঝড়ই না তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মন-বনের গাছপালা সব টুন্ডামুন্ডা হচ্ছে। কর্দমাক্ত হচ্ছে মৎস্য হৃদয়। বহিরঙ্গ রঙ্গ ভীষণ। অভিনয় মানুষের সহজাত গুণ। কি হয়েছে তোমার, হাওয়া খেতে বেরিয়েছ বিকেলে! তবে জীবনের ষোল আনা অভিজ্ঞতা যাদের হয়নি, তিনমাথার বুড়োবুড়ি না হলে তা হয়ও না অবশ্য। মনের কথা মুখে অবশ্যই ছায়া ফেলবে। হাটতে হাটতেই শাণিতের মুখটা লজ্জাবনত হল। অনুপ ছাড়া কথাটা আর কাউকে বলাও যাবে না। বিশেষ করে কিরীট দত্ত বা সারথি দেববর্মাকে কোন দিনই বলা সম্ভব নয়। ওরা স্থানীয়। এত দিন বসবাসের পরও আগরতলার প্রতি কোন ভালবাসা জন্মায়নি। কেন এমন, কেন হয়! এখানে না আছে বাড়িঘর —না আছে জায়গা জমি। উদ্বাস্তু পরিচয়ে আছি। আমার মা বাবা রিফিউজি ছিল। রিফিউজিরা সাধারণত যাযাবরই হয়। বালককাল মানে আসামের কাছাড় জেলাটাকে কি খুব আপন মনে হয়েছিল— মোটেও নয়। ভালবাসা যদিবা কিছু থাকে সবই আমার অভিমানি শৈশবের প্রাপ্য—ভারতবর্ষের আহ্লাদিত হওয়ার কিছু নেই তাতে এবং এখন আমি একজন ইহুদি।

শাণিত যেন সত্যি সত্যি লম্বা হয়ে গেছে অনেকখানি, আরো বেশি বাতাস পাচ্ছে, তার মুখমন্ডল সে নিজে দেখতে পারছে না ঠিক আছে, তবে পায়ের গোছাগুলি আগের চেয়ে ভারি লাগছে— এতে কোন সন্দেহ নেই।

আগের চেয়ে রাস্তায় ভিড় বেশি। লোক দেখলেই বোঝা যায় বিকেলের পোশাক আষাক। এবং ভিড়ের শব্দই হল— এক নাগাড়ে রিক্সার ক্রিং ক্রিং —দারুণ লাগে আমার।

প্রথম যেদিন আগরতলার মাটিতে পা দিলাম—ট্রাক থেকে নেমে এলোপাথারি হাটছি, তবে চোখ কান খোলা, প্রথমেই একটা পান দোকানের সামনে গিয়ে দাড়ালাম সিগারেট কিনতে— দাদা, একটা চারমিনার দিবানি। পান দোকানিও পাল্টা প্রশ্ন করল, কোন্‌খান্ থাকি আইছইন রেবা আপনে? তবু উচ্চারণ শুনেই শাণিত বুঝতে পারল— লোকটা সিলেটি নয়।

আরেকদিন, এখন আমরা যেখানে থাকি—তার পরের বাড়ির পরের বাড়ি, সীমানা নিয়ে এখনও ঝগড়া করে মানুষ। মাথা ফাটাফাটি কান্ড। শেষে স্থির হল —বিচার সভা বসবে। দিব্যেন্দুবাবু সাফ জানিয়ে দিলেন —তিনি পরের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। অগত্যা শাণিতকেই যেতে হয়েছিল কারণ পাড়া প্রতিবেশীর প্রয়োজনে বার বার গা মেরে থাকার ফল ভাল হয় না। বিবাদের কথা কিছুই বলা যায় না —কখন কার ঘাড়ে এসে পড়ে!

তর্ক বিতর্ক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য মোড় নেয়। বিচার শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই শাণিত এখানে উপস্থিত। এক কোনায় গুটি সুটি বসেছিল চুপ করে। কারণ তখন যে কথাবার্তা চলছিল—

এই যে সত্যেন সেন, তোমরা ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড় সব ছেড়ে ছুড়ে আগরতলায় এসেছ কি করতে?

—প্রাণের ভয়ে ভাই? অমরপুরের আগে আমরা আসামের দুমদুমায় ছিলাম।

—সে তো আমরাও ছিলাম নাগাল্যান্ডে, চারদিক পাহাড় ঘেরা আর প্রকৃতির কি লীলা দেখ শাকসব্জীর মধ্যে লাইপাতা আমার খুব প্রিয় এবং আগরতলায় যেমন কয় পা গেলেই সটীর ঝোপ দেখি, তেমনি নাগাল্যান্ডেও আহা লাইপাতা!

—কোনখানে নেই? রিফিউজি বাঙ্গালীরা মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর, এমনকি অরুনাচল

প্রদেশেও বসতি গড়েছিল। প্রথম প্রথম তাদের খুব অসুবিধে হত— মরা পোড়া নিয়ে। স্থানীয় লোকদের ভয়—মানুষপোড়া ধূয়া যে গ্রামের উপর দিয়ে যাবে—অমঙ্গল হবে তাদের।

সে কথাই তো বলছি —আপনারা হলেন গিয়ে খেদা খাওয়া হাতি—তাড়া খেয়ে তাড়া খেয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছেন, আর বিপদে ফেলছেন আমাদের।

নারে ভাই, দাঙ্গায় দাঙ্গায় বহুবার মুখ পুড়েছে। ত্রিপুরার চশমা বানরও শুনেছি অবলুপ্তির পথে।

অসম্ভব। শাণিত এলোপাথারি মাথা নাড়তে থাকে। রাস্তা থেকে ঢিল তুলে ছুড়ে মারে সামনে। কপাল ভাল বলতে হবে— একটা সাদা এম্বেসেডারের প্রায় গা ছুঁয়ে পড়ল গিয়ে ড্রেইনে!

ছলকে উঠল রোদ। রাস্তার দুই পাশে ভারি ভারি পর্দা। রিক্সা টেম্পো ট্যাক্সির ভিড়। শুধু সওয়ারি নিয়ে যাওয়া আসা নয়, অন্য অনেক কাজও করে তারা। এমন কি ট্যাক্সির ভিতরে বোঝাই হয়ে থাকে বস্তা। আগরতলার কিছু অঞ্চলকে মনে হয় ড্রাগনের জিহ্বা। তার গরম শ্বাস যেন সবসময় অনুভূত হয়। সীমান্তের আশপাশে যারা বসবাস করে সবাইকে বকরাক্ষসের খাদ্য মনে করে শাণিত। দ্যানিকেনের 'দেবতারা কি গ্রহান্তরের মানুষ' পড়তে পড়তে যেভাবে গা ঝম ঝম করে উঠে তেমনি আগরতলায় অরুন্ধতীনগর থেকে নরসিংগড় যাওয়া আসার সময় বুক ঢিব ঢিব করে। অথচ উপরে উপরে শান্ত, কী নিস্তরঙ্গ আগরতলা। যেন নিরামিষাশী। একটু পরে পরে হাই উঠে কেবল।

শাণিত জানে এই অন্ধকার জগতের লোকজনকে খাটাবার সাহস ত্রিপুরায় অন্তত কারো নেই। আগরতলায় ছোট মাপের মাফিয়া ডনের সংখ্যাও অসংখ্য। কত হবে?

কী জানি কত! আমি শুধু বলব—আগরতলায় সব সময় একটা গরম শ্বাস বয়ে যাওয়ার কথা। তাছাড়া তীরবেগে ছুটে যায় যে জীপগাড়িগুলি, আস্তাবলের ব্রিজ পার হয়ে এসে ফিরে যাওযা বাসের জন্যে অপেক্ষারত কয়টি ছাত্রছাত্রীকে উড়িয়ে নিয়ে,টেনে হেঁচড়ে, চাকার নিচে পিষে ফেলে। পিছলে গিয়ে দু একটা উল্টেপুল্টেও যায়। কার্টুন ভেঙে কালো পিচ্ রাস্তায় চকচক করে সোনার বিস্কুট। পেটমোটা বস্তা ফেটে গাঁজা চরস আর গোলমরিচ গড়ায়, হাওয়ায় উড়ে, অন্য গাড়িগুলির পিছু পিছু যায় কিছু। হরির লুটও তত মজা লাগে না দেখতে! দূর থেকে সাইরেন বাজিয়ে আসে পুলিশ ভ্যান। শূন্য শ্মশানে তখন ওরা কি করে—আমি বলতে পারব না।

বাকি রইল আগরতলার পূর্ব দক্ষিণ দিকটা। কিছু সমতল, আর সব পাহাড়। সেদিক থেকেই স্বাভাবিক শীত নেমে আসে, খরা, বৃষ্টির জল নেমে বন্যা হয়ে যায়। আর এখন তো সূর্যাস্তের পর কোটি কোটি ভয় নেমে আসে।

ফলে ত্রিপুরাকে কি করে ভালবাসবে তুমি শাণিত সেনগুপ্ত? নিরস নিষ্কষ লাল রঙের মাটি—নূতন কোন চিহ্নই ধরে রাখতে চায় না। শীতই বলো বা বর্ষা—দু'একদিনের মেহমান ছাড়া কেউ কিছু নয়। তাছাড়া বারো মাস যে বাতাস ব্যতিব্যস্ত করে—তার নাম বান-বাইন্যা। জলের বংশ থাকে না এই বাতাসে।

গা জ্বালা করে। এখনও এই রাস্তায় কিছু শুকনো পাতা আর এক স্তম্ভ বালু শাণিতকে পেঁচিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, মন্দির চূড়ার মত ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হাওয়া। বড় ক্লান্ত লাগে। ভিনসেন চলে যাওয়ার পর গণরাজ চৌমুহনী থেকে উইমেন্স কলেজ—এইটুক মাত্র রাস্তা, অথচ কত যুগ ধরে হাঁটছি। রাস্তার পাশে কলেজের দেয়াল ঘেঁসে কয়টা খেজুর গাছ কাঁপছে। লাসুসিংগুলি ছায়া দিতে পারে না ভাল করে, কোন কোন সময় রাস্তার ওপর পড়ে থাকে যেন গ্রীকদেশের কয়টি থাম। আর এখন একটা মোটাসোটা গাছের গুঁড়ি দেখে বসে পড়ে শাণিত।

—আরে আরে—কি কর তুমি? এখন ইমারজেন্সি। শুধু শুধু ধরে নিয়ে যায় থানায়। এই খেজুর গাছগুলিও পরিচিত আগরতলায়। অনেক গল্প আছে। এখানে প্রেমিকেরাই রসের কলস

উঠায় নামায় । পত্র বিনিময় করে দেয়াল টপকে । গেল কালও এখান থেকে কয়জন রোমিওকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ ।

ভালই হয়েছে । আগরতলায় পড়াশুনার রেওয়াজ এখন প্রায় নেই বললেই চলে । সকাল সন্ধ্যা শুধু আড্ডা । গুণ গুণ করে বই পড়া—ব্যাপারটাই কি উঠে গেল চিরতরে ? আরেকটা ব্যাপার দেখলাম—এখানকার ছেলেরা একই রকম চুল কাটে —রাজেশ কাট্ । আশ্চর্য লাগে আমার—এই শহরে বেশিরভাগই সম্পন্ন .নুষ অথচ, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে কোন মাথাব্যথা নেই । আর হঠাৎ দেখবে ছেড়ে এলো কন্ট্রাক্টরি শুরু করে দিয়েছে । তারপর প্রেমের বিয়েই হউক বা আলাপের—এই প্রথম তাদের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ জন্ম নেয় । বিয়ের আগে সব ছেলেই এখানে—এমন কি বাপের তৈরি বাড়ি থাকলেও, একটা নিজস্ব কোঠা তৈরির কথা ভাবে ।

এমন অনেক কারণ আছে—শাণিতকে ভাবায় । যেমন কালিপূজা শনিপূজা । শ্যামা মায়ের আরাধনা বছরে একবারই হয় । কিন্তু রুদ্রকালির পূজা, ছিন্নমস্তার — আগরতলার পাড়ায় পাড়ায়—মাসে এক দুইবার তো হয়ই । শক্তিশালী বোমা ফাটিয়ে জানান দেয়া হয় চতুর্দিকে, মদে মাংসে বেকারত্বের প্রতিবাদ । আর এই খেলার শুরু শনিপূজা দিয়ে । থালা হাতে ছোট ছোট নেংটো সকল বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় । আট আনা চার আনা যা পায় । প্রতি পাড়াতেই ৪/৫টি শনিতলা আছে । সপ্তাহের রোজগার । তাছাড়া মারদাঙ্গাতো লেগেই রয়েছে নিত্যদিন । লাঠি ছুরির কোন কারবার নেই—সবই আগ্নেয়াস্ত্রের খেলা । মাফিয়াদের পুতুল । আলাদা আলাদা রাজনৈতিক দলের লোক ।

রক্ষা ! এখন ইমারজেন্সি । খারাপ হোক ভাল হোক—একদল লোকেরই শাসন এখন ।

রাজনৈতিক নেতাদের এক একজন ধর্মগুরু মনে হয় আমার । আগরতলার ধর্মকর্মও অদ্ভূত । এখানে কের খার্চি দুর্গাপূজা সার্বজনীন হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু গণমুখী ধর্ম—কথাটা শুনলে বিরক্তি লাগে না ! ত্রিপুরার বাজারগুলিতে পালাগান আর নাম সংকীর্তনের জোয়ার এখন । কাতারে কাতারে লোক আসে, খিচুড়ি বিতরণ করা হয় । এরই মধ্যে আবার কষ্টমষ্ট করে ব্যবসা বাণিজ্যও চলে, কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে থাকে সবসময় ।

তারপর খড়িমাটি দিয়ে কপালে দাগকাটার মত আঙ্গুলে ঘাম কাটল শাণিত । সারারাত পাতার মধ্যে যেমন গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশার সর পড়ে থাকে, বিন্দু বিন্দু নয় অবশ্য, আঙ্গুলের ডগাটা দেখল ভিজে উঠেছে । একটা কথা সে বিশ্বাস করে—এখন যেমন এখানে শুকনো বাতাস, আগে তেমন ছিল না । শষ্য শ্যামলা ছিল, আর্দ্র ।

মানুষের উদরপূর্তি ব্যাপারটা যে কী ভয়ংকর—তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ ত্রিপুরার জংগল ।

এখন গণরাজ চৌমুহনীর দিক থেকে হঠাৎ সাইরেনের শব্দ শুনে তাকায় শাণিত । দুইটা মাত্র জিপ, মাঝখানে একটা এম্বেসেডার দেখে, তাড়াতাড়ি খেজুর গাছের গুঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় । মন্ত্রী মিনিস্টারের যন্ত্রণা, পিছে পিছে সিকিউরিটিদের সঙ্গিন দেখে । খুবই আস্তে আস্তে যাচ্ছে — লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির সামনে জটলা । এখন বাংলা কোন মাস কে জানে, আবার হাসে—যেন ইংরেজি মাসে বিয়ে হতে নেই । শাণিত জানে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির সামনে বরযাত্রীদের ভিড় সারাদিনই থাকে । দূরে দূরে বিয়া হয় না এখন । অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যটাই আর কত বড় । আগরতলা বা আগরতলার ধারে কাছে হিন্দুমতে বিয়ে হলে—সব বরযাত্রী পার্টি লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি হয়ে যাবে—এটাই রেওয়াজ ।

এখানকার অনুষ্ঠানগুলিকে দায়সারা গোছের মনে হয় আমার । সবই কাটছাট হতে হতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এখন শুধু সাতপাক সম্বল । ধামাইল গীত এসব উঠে গেছে, কড়িখেলা, জলের মধ্যে বরকনে ফুল খেলা, কিছুই নেই ।

—রিফিউজিদের অত সময় কই ?

বরযাত্রীদের অবস্থা তো আরো খারাপ। কনে বাড়িতে পৌঁছামাত্রই বরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। এবং বরযাত্রীদের অন্য কোন ঘরে অনেক সময়ই শুধু বসে থাকা বা দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। কোনভাবে চা মিষ্টি খাওয়া শেষ হতে না হতেই—ভাত খাওয়ার টেবিলে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আর কোন খোঁজখবর রাখে না কেউ।

একেই বোধহয় উদ্বাস্তু মানসিকতা বলে। পায়ের নিচে চাকা বেঁধে দিয়েছে। আমার সামনে এখন যানজট। রাস্তার উপর ধর্মকর্ম, ভিড়। টপকে টপকে যাই কি করে? বরযাত্রীদের দল লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িব ফটক বরাবর রাস্তা ব্লক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদল বেরুলে আরেক দল ঢুকবে। এই ভিড়ের মধ্যে সবাই কি বরযাত্রী—নাকি অন্য লোকও আছে? তবে লোকগুলোকে দেখলে পালাগানের নট নটী লাগে। উগ্র গন্ধ। যতই ভেতরে ঢুকছে ততই দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

একসময় ছিটকে বেরিয়ে এল হাওয়ায়। রোদও আছে, একটু দাঁড়ায়। রুমাল দিযে ঘাড় গলা ও হাতের লোমকূপগুলি মোছে। এইবার বাতাস লাগে গায়ে। এবং হাতের তালু পাফ করে করে হাঁটতে থাকে।

হাঁটা আবার কি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি পার হলেই তো রাজবাড়ি। একজন দুর্লবেন্দ্র চন্তাইয়ের ইতিহাস চেতনা সম্বল করে কবি বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর যেভাবে লিখতে বসেছিলেন—ঠিক সেভাবে শাণিত এখন ফুল চোরের মতই তাদের ভিতর বাগানে ঢুকে পড়েছে সাঁজি হাতে।

যে রাতে শাণিতের ঘুম হয় না বা যেদিন জ্যোৎস্না থাকে, আকাশে অসংখ্য তারা, কেউ কেউ খসে পড়ে। শুধু ফুল নয়, শাণিত এখন অবহেলায় পরিত্যক্ত কিছু নুড়িও খুঁজছিল। সেই কবিদ্বয়ের বিচারের ভার যেন তারই হাতে।

নাম তার গোপীপ্রসাদ বললে হয়তো তুমি চিনবে না। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ অনন্ত মাণিক্যকে কোনভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়েছিল। তারপর মহারাজকে হটিয়ে সে নিজেই ত্রিপুরার সিংহাসনে বসল। নূতন নাম হল তার উদয়মানিক্য। ২৪০টি বিয়ে কবল। কিন্তু একটি লোকের পক্ষে ক'জন বৌকে বশে রাখা সম্ভব? গভীর রাতে তার বউবা রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে এসে রাস্তার লোক ধরে ধরে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতেন।

এতক্ষণ রাজবাড়ির দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়েছিল শাণিত। হঠাৎ মনে হল মাথা থেকে বোদ সরে গেছে অনেকক্ষণ।

আমার সামনে এখন চিলড্রেন্স পার্ক। আজকাল একটিও শিশু এখানে আসে না। অনেকগুলি ছাতাঘব আছে। শুধু সায়া আর ব্রেসিয়ার পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি মেয়ে। পার্কটাকে মাঝখানে রেখে চারদিকেই বড় বড় রাস্তা। এই শিশু উদ্যানটিকে সহবেব হৃদয় বলা চলে। মেয়েগুলি অবশ্য শাড়ি ব্লাউজ পরে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বে পার্ক থেকে। রোজগারের সময় হয়ে যাচ্ছে। অলস ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছে অনেক লোক। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। সে বাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। অনেকগুলি মেয়ে ডাবল পেটিকোট পড়েছে। এদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই বাক্যালাপ আছে শাণিতের। ওরা মাঝে মাঝে বিড়ির আগুন চায় তাব কাছে বা অন্যমনস্ক রাস্তা হাঁটতে থাকলে, মাঝে মাঝে খোদ ব্রেইনে ব্রেক কষে দাঁড়ায় দু'একটা রিক্সা, একটি মেয়ের নাম বৃষ্টি। আমার জন্যে অর্দ্ধেকটা সিট খালি রেখে মিটি মিটি হাসে।

—শাণিত কি অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল? কেন? এ জি অপিসের লোকগুলি তার পাশ কেটে গেলে কি লাভ হবে?

—দূর থেকে, পেছন থেকে, কেউ কি চিৎকার করে উঠবে—কমরেড শাণিত সেনগুপ্ত খবর আছে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার হাতদুটি তুলে নেবে হাতে—তোমার আবার চাকবি হয়েছে ভাই।

শাণিত বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন সেই লোকটা, ধরা যাক অনুপ, আমাকে বুকে টেনে নেবে আর অচলগাড়ি হঠাৎ ঝিক ঝিক করে ওঠার মত কাঁদতে থাকব আমি এবং শেষমেষ জড়িয়ে ধরব অনুপকে, আর ছাড়ব না।

কিন্তু একটা মালবোঝাই লরি এখন শাণিতের খুব কিনার দিয়ে গেল গিয়ে। বড় দানাগুলি ধূলা হতে পারে না, জাস্ট এক বাতাস বালু এসে পড়ল তার চোখে মুখে। সেও চোখ বুজে হাতের তালু দিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছিল দ্রুত, তখনই যত গাড়িঘোড়া পেছন থেকে পেঁ পুঁ শব্দ করে।

শাণিত আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখে—সেই ভিড়, তবে বরযাত্রী মনে হল না, কেমন কেমন লাগে, এত ভেঁপু বাজছে কেন?

—কি হয়েছে দাদা?

—কি জানি! ডিমাপুর থেকে নাকি একটা ছেলে এসেছিল গণরাজ চৌমুহনীতে—তার মামার বাড়িতে, তাকে কে বা কারা ধরে নিয়ে গিয়ে নাসবন্দী করে ছেড়েছে।

কোথাও স্বস্তি নেই। শাণিতের শরীর কুটকুট করে উঠল। মনে হল আমরা সবাই সাধারণ মানুষ— কোন মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঝড়ঝঞ্ঝার কবলে পড়েছি, আর আমাদের সামনে পেছনে শুধু লাউড স্পিকার নির্দেশ জারি করে চলেছে। কর্তাব্যক্তিরা প্রত্যেকেই কানে কানে কথা বলেন, সবশেষে একজন ঘোষকের কাছেই শুধু থাকে মাউথপিস। শাণিতের মনে হয় ডাক্তারবাবুদের কাছেও এখন নির্দেশ এসেছে যেভাবেই হউক জনসংখ্যা কমাতে হবে ভারতবর্ষের।

এক জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ড্রেইনের মশা কামড়ায়। মাছি সুড়সুড়ি দেয়। ঘাড়ে গলায় বারবার তাড়াচ্ছিল সে, পেছন ফিরে দেখল সত্যি সত্যি এ জি অপিসের অনুপ—তার হাতে একটি পাখির পালক। চোখাচোখি হতেই দৌড় দিল— যেন সময় নেই রে, পরে দেখা হবে।

যার মানে হল মার্ডার কেস। সেই ক্ষত থেকে আবার রক্ত চুঁইতে শুরু করেছে। আর প্রতিরোধ করা যাবে না। মাইকে শোনা যাচ্ছে—শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ।

আসলে বাবার মুখভঙ্গির কাছেই তো একেবারে পরাস্ত হয়ে পড়েছিল শাণিত—আর সবার সাস্‌পেনসন হইল, তোর টারমিনেশন!

শাণিত এখন দরদর করে ঘামছে। কোথাও বসতে হবে, ভিতরে ভিতরে প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করে। কিন্তু ক্ষেত্রটি কোন ব্যক্তি, একটি ব্ল্যাকবোর্ড, একখণ্ড কাষ্ঠ বা একগণ্ডুষ জল এমন নয়। মনে হয় ছুঁইতে পারি না ধরতে পারিনা বাতাস আকাশের মত আমার শত্রু, আমি তার অতি ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এটম বোমাই কি তবে একমাত্র প্রতিকার!

এই যেমন আমাদের ভারতবর্ষ। উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে তারই একটি অংশ—মনে থাকে না তো! এমনকি বিদেশীরাও দখল করে নিলে—বেতার ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বছর পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে নর্থ ইষ্ট।

এবার তার চোখ পড়ল গিয়ে চিলড্রেন্স পার্কের বেঞ্চিগুলিতে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হচ্ছে। সেদিকেই পা বাড়াল শাণিত। দু একদিনের মধ্যে আরেকটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার — একশ টাকা ভাড়া দিয়ে এই পস এরিয়ায় আর কতদিন থাকা যাবে! জি বি হাসপাতালের দিকে শুনেছি—ভাড়া কম লাগে।

শাণিত দেখল পূর্বদিকে একটা বেঞ্চি এখনও খালি পড়ে রয়েছে কারণ এক টুকরো রোদ বেঞ্চিটাকে আঁকড়ে রয়েছে এখনও। সেখানেই গিয়ে বসল। মুখের চামড়া একটু চিড়বিড় করে সহ্য করে নিল রোদটুকু। তাছাড়া তার বুকে ছায়া পড়েছে—সেটুকু দীর্ঘ হতে বেশী সময় লাগবে না।

কটা টিউশনি ধরতে হবে, তাহলে আর চাকরির চিন্তা সবসময় মগজ কুরে খাবে না। সহানুভূতির ঠেলা পোহাতে হবে না রাস্তাঘাটে। তাছাড়া টাকা চাই। বাবার কাছে কিছুই নেই। কেবলি বোঝা তুলে দিল আমার কাঁধে। আর ফ্রিডম ফাইটার পেনশনের টাকা? যতসব সন্দেহের কথা বাদ

দিলেও—ব্যাপারটা খুব ইরেগুলার—তিন চার মাস পরে পরে যদি কিছু পাওয়া যায় ! তাছাড়া ভদ্রলোকের সর্বস্ব ছিনিয়ে যে নেব—ভাল লাগে না আমার । লোকটা কেমন বোঝ—নিজে স্বাধীন ব্যবসা করবে কারণ গোলামি পোষায় না । কিন্তু ছেলেমেয়েদের বেলায় এমন ভাব ধরে থাকে—যেন ব্যবসা ব্যাপারটাই দুই নম্বরী, লোক ঠকানো । যাই হউক এখন শাণিতের কাছে বড় প্রশ্ন হল জুঁই । গিরিকাকিমা বলেন—একটা মেয়ে মানে হাতি পোষা ।

একটু আগে নাসবন্দী করা হয়েছে ছেলেটা যে দোকানে বসে কাঁদছিল সেটা লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি চত্বরেই একটি মিষ্টির দোকান । এখন শাণিত যেখানে বসেছে সেখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভিড়টা । যা খুশি হউক—আমার কি ! যদিও শাণিত সুমিতেরাও মাঝে মাঝে এই দোকানে বসে আড্ডা মারে । সুমিতই বেশি । আর একটু পরে পরে চা মিষ্টির অর্ডার দিতে থাকবে সে, খেতেও হবে—জোর করে খাওয়াবে । দোকানের মালিক বা আমরা—আমাদের কার ঘাড়ে কটা মাথা যে সুমিতকে বাধা দেব ! সুমিত ঘোষ টেরর । অথচ ছেলেটাকে মাস্তান বলতে রাজি নয় শাণিত । সাহস আছে — সৎ সাহস । কিন্তু শাণিতের রাগ অন্য কারণে । সঞ্চারী মেয়েটার প্রতি বড় অবিচার করে সুমিত । রোজদিন নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে দেয় বন্ধুদের মাঝখানে । শাণিতের কথা হল প্রেম কি বাজারে বসে করা যায় ? এসব বোঝে না ছেলেটা । নরম স্বভাবের মেয়ে সঞ্চারী । রোজদিনই ডেকে নিয়ে আসে, রোজদিনই কষ্ট দেয় ওকে । মেয়েটা আমার মনের কথা বোঝে । এমন ভাবে চোখ করে তাকায় —কী আর করা যাবে শাণিতদা—পাগলের পাল্লায় পড়েছি ।

পার্কের অন্য বেঞ্চিগুলিও দেখল শাণিত । বিশ্রামরত লোকজন । পেছনে প্যালেস কম্পাউণ্ড । ডানপাশে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন — রোজই কিছু না কিছু লেগে থাকে এখানে—নাটক, গানবাজনা । এখন তো ইমারজেন্সি—তাই সরকারী প্রোগ্রামই বেশি হয় ।

এই মুহূর্তে পার্কে যারা উপস্থিত আছেন তাদের অনেকেরই জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে, নাহয় স্বাধীন ত্রিপুরার লোক ওরা — উজিরবাড়ি, নাজিরবাড়ি, ভাণ্ডারী বাড়ির লোক । আরো কিছু ছেলে ছোকরাও আছে ।

একটা মেয়ে তখনও ডিসটার্ব করে চলেছে আমাদের । সে কিছুতেই ব্রেসিয়ারের ওপর ব্লাউজ চড়াচ্ছে না এতক্ষণ ধরে । শাণিত অন্যদিকে তাকায়, অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করে । তখন অনুপকে দেখে কি মনে হয়েছিল ? এ জি অফিসের অনুপ । এখন আর আমাদের অফিস বলতে পারে না সে, কোথায় যে আটকায় ! তবে কি চাকরিটা আর ফিরে পাওয়া যাবে না ?

ধুস্ শালা, দেশলাই আনিনি । দাঁড়িয়ে পড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা আবার তার সিটেই রেখে দিল । দু'একবার এদিক ওদিক দেখে—সবকটা বেঞ্চি ভরে গেছে। বেরিয়ে যেতে যেতে, কেউ কি কিছু মন্তব্য করল ? ওরা ইণ্ডিয়ান বাই বার্থ । তাকে ক্রস্ করল একজন চিনেবাদাম ভাজা ।

বাইরেই কয়টা বিড়ি সিগারেটের দোকান । সন্ধ্যা হয়ে আসছে । সঙ্গে একটা পানও কিনল শাণিত। এবং পানে চুন লাগাতে লাগাতে তার মনে পড়ল—মণি ঠাকুরের কথা—তোমার কুষ্ঠিতে কুগ্রহ মানে রাহুর বড় প্রভাব । শাণিত এসব মানে না তবে, সত্যি যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে ননীদা অশিনদা ওরাই তার জীবনে রাহু কেতু শনি । আর সময় আমার কোনদিনই ভাল যায়নি । শিলচর করিমগঞ্জে থাকতে ছিল উদাত্ত লোকেশ—দৈত্য দুইটা । ওরা আবার নকশাল করে । সেই রাজনীতি ! অতসী সেনগুপ্তের কথায়—রাজনীতি-এ খাইল আমারারে । এ জি অফিসের দপ্তরি — রাখালদার কথা হল — বাবু আপনারা রাজনীতির মরা আর আমরা টাকা পয়সার ।

এমন সময় শাণিত লক্ষ্য করল—সেই ছেলেগুলো এসে তার বেঞ্চিটা দখল করে নিয়েছে । সব কটার ঠোঁটে মনে হয় আমারই সিগারেট, প্যাকেট নিচে পড়ে রয়েছে ।

কী আর করা যাবে, ফিরেই যাচ্ছিল শাণিত, তবু পেছন থেকে মন্তব্য করল— ও দাদা,

দেশলাইটা দেখি তো !

শাণিত আস্তে আস্তে ফিরে। হঠাৎ করে মাইকের মুখ ঘোরে গেলে —নে নে নে—

—আরে আরে !

আসলে শাণিতের তখন আর কিছুই মনে ছিল না —শুধু একটা লাল চাঁদ। আর দুরন্তএকটি বলের দিকে গোলকিপার যেভাবে ঝাপ দেয়। ছেলেগুলির মাথায় শুধু ঠকাঠক শব্দ হল। তারপর ক্যামেরার রিল গেল ছিঁড়ে।

তারও অনেকক্ষণ পরের কথা। শাণিত দেখল—নিগেটিভ ছবির মত কিছু মুখ তার মুখের উপর কাঁপছে। সঙ্গে অবশ্য এক বিন্দু আকাশ দেখে আশ্বস্ত হল সে। নইলে এই পৃথিবীটা নরক ছাড়া আবার কী ! সে উঠে দাঁড়াতে গেলে এবার ভূতেরা তাকে বাধা দিল—আরেকটু সময় !

— না। শাণিত কেগোমেগো করে কোনরকমে উঠে দাঁড়ায়, কোমর ভাঙা বিড়ালের বাচ্চা যেভাবে। হাত দিয়ে ঠোঁটের দুইকোণ মোছে , ঠান্ডা লাগে, ভেজা, কিন্তু হাতটাকে সে আর চোখের সামনে নিয়ে আসতে চায় না।

চিলড্রেন পার্ক থেকে কোনরকমে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। যানবাহনগুলি গুল্লির মত এদিক ওদিক করছে। ধুঁয়া আর ধূলা মিলে খেয়াল হল তখন পার্কের আলো এবং এখন রাস্তার আলোগুলি তাকে বিদ্রুপ করছে। মিটমিট কবছে যত চেরা চেরা চোখ। শালা, গুলাল মেরে সব বেটাকে অন্ধ করে দিতে হবে। ঠিক তখনই দেখবে পেছন থেকে কান চেপে ধরেছে পুলিশ।আর এখন তো ইমারজেন্সি, সি আর পি'র লাঠির বাড়ি খেতে খেতে হাজতে যেতে হবে।

নয়

তবে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়াও উচিত হবে না এখন। অকারণ চেঁচামেচি শুরু করে দেবে মা—তোর কি হয়েছে, শরীর খারাপ নাকি ?

আমি যতই মাথা নাড়ি না কেন—মা এসে আমার ঘাড় গলা ছুঁয়ে দেখবে। মরার মত ঠান্ডা হাত তার। তারপর কপাল। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে দেবে।

অসহ্য ! শাণিত এবার বিপরীত দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দিকে । এত নিঃসঙ্গতা এর আগে কোনদিন অনুভূত হয়নি। জোয়ারের জলও তীরে এসে ছুঁইতে পারে না আমাকে। আমি একটি নুড়ি। শুধু শুধু ঢিল ছুড়ে যে বালকগুলি বা কোন ব্যর্থ প্রেমিকার হাতে না পরলে আমার মুক্তি নেই।

তাছাড়া ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র একাকিত্ব পর্যন্ত গড়াত তবু চলত। কিন্তু আমার এখন বোধ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। এই ত্রিপুরা রাজ্যটা যেভাবে যোগাযোগের অভাবে বিচ্ছিন্ন, ঠিক সেভাবে এখানকার লোকগুলিও আলাদা আলাদা একক। এদের কোন যৌথ সত্তা নেই। আর এটি একটি এমন উপলব্ধি যে— ফিটকিরি ছাড়াই দুধ ছানা হয়ে যায়।

আজ পরিবেশ দূষণের যুগে কোন যৌথ পরিবার নেই। ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে সংসার। বুড়া মা বাবাকে পর্যন্ত বোঝা মনে হয় । তার উপর যদি ভাই বোন থাকে, বাপ দাদার সঞ্চয় না থাকে তাহলে— এতসব কার লায়বিলিটি ?

শাণিত ভাবে আমার এই চিন্তা ভাবনাগুলিও উদ্বাস্তু মানসিকতারই ফল।

—কি খবর দাদা, ভালোনি ?

লোকটা তাকিয়েছিল এদিকে আর রিক্সাওয়ালা এগিয়ে গেছে অনেকখানি। পরিমলের দাদা ভূপতিবাবু। পি ডাব্লু ডি অফিসের বড়বাবু। তখন আমার টেবিল থেকেও অনেকগুলি অডিট অবজেকসন গিয়েছিল ওদের অফিসে। এই নিয়ে পরিচয় প্রসঙ্গ কথাবার্তা, চিঠির উত্তর টুত্তর ইত্যাদি। এতদিনে তিনিও নিশ্চয়ই জেনে গেছেন— আমার চাকরি নেই !

শাণিত দুইবার হাই তুলল, সঙ্গে চুটি। বাঃ আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনটাকে সাজিয়েছে ভাল। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে — ত্রিপুরার শিল্প সাহিত্য নিয়ে একটি আলোচনা চক্র। ফেষ্টুনে ফেষ্টুনে। শাণিত ভাবছে—এখানে ঢুকতে গেলে প্রবেশপত্র লাগবে নিশ্চয়ই, আবার ইমারজেন্সি ! ভরসা পায় না শাণিত। তার পোষাক আষাক হাওয়াই চপ্পল দেখে। সেন্সরশিপ চালু হয়ে গেছে সারা দেশে। আর আমাদের এখানে জরুরী অবস্থার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল—শাসকদল কংগ্রেসেরই কয়জন জনপ্রতিনিধির গ্রেপ্তার।

আজকাল দুপুর গড়াতে না-গড়াতেই উচাটন শুরু করে দেয় শাণিত—বেরিয়ে পড়তে হবে। অথচ বৈকালিক ভ্রমণটা তার কাছে মোটেই সুখকর নয়। মাথার মধ্যে একটা পোকা অনবরত কাটছে। তাছাড়া ঘর থেকে বেরুলেই সে একাকিত্ব আর বিচ্ছিন্নতার কবলে পড়ে, রাস্তা ঘাটে লোকজন তাকে উইস্ করে না— এমন না, কিন্তু

সবাই শরণার্থী আসলে। এপারে ঘরবাড়ি করা হয়নি এখনও। যা'ও কিছু মাইট্যা কোঠা আছে—পাকাপোক্ত বাড়িঘর ভাবলেই ভয় হয় ! কখন কি হয় ! যারা পারে পশ্চিমবঙ্গে জমি কিনে রাখছে কিছু কিছু।

তারপর ত্রিপুরার মেয়েদের প্রসঙ্গেও একটা কথা মনে হল কেন জানি—কোথায় যেন পড়েছি—ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ মানুষ ঠিকঠাক না পেলেও কিন্তু মাটি খুঁড়ে যারা গর্তে বসবাস করে—তারা পায়।

এরইমধ্যে আবার বৃষ্টি হলো কখন ? ভিজে রাস্তা পুরোপুরি শুকায়নি। অবাক হল শাণিত ? রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে, পাশে নালাগুলি পর্যন্ত জলে ভারি লাগছে। তবে আড়ি পাতলে

কুলকুল শব্দ শোনা যায় না। অনেকদিন শুনতে পায় না সে। নদীর কথাবার্তা একরকম। আর সমতলের মধ্যেই উপর থেকে নিচে, এক নালা থেকে আরেক নালায় অন্যরকম শব্দ হয়। এখন ছেঁড়া ছেঁড়া আলোর মধ্যে স্রোত ধরা পড়ছে অবশ্য। একটি চারমিনারের প্যাকেট্ আটকে আটকে তবু যাচ্ছে। শাণিত আরো কাছে নামিয়ে আনে চোখ। গা ঘিন ঘিন করে তার। তবু কিসের যে একটা কৌতূহল। বাকল ছোলা কয়টা পচা আম বা কাঁঠালের রোয়া টোয়া কিছু হবে আরকি!

বনমালীপুরে প্রতিবছরই একবার দুইবার ঘরদোয়ার ছাড়তে হয় আমাদের। একনাগাড়ে ঘন্টা দুই বৃষ্টি হলেই হল। আর আমরা যে জায়গাটায় থাকি সেটা আগরতলার বুক। আমাদের আশেপাশে সব বাড়িতেই স্যানিটারি লেট্রিন থাকা উচিত। অথচ প্রতিবারই জল নেমে গেলে ঘরের মধ্যে থোকা থোকা গু আবিষ্কার করি আমরা। জুঁই তো কয়দিন একেবারে উপোস থাকে। গন্ধ লেগে থাকে সবসময়।

এখন পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়ে গেছে—শুরু হয়ে যাবে আমার জুঁই যন্ত্রণা। কেন যে এমন হয় বুঝি না। এমনিতে অন্ধকারে কিছু সময় হাঁটাচলার পর অন্ধকারও সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আলোতে তেমন হয় না ব্যাপারটা। তারাবাতির মত অজস্র কাটা কাটা একটা ঘোর লেগে থাকে রাতের রাস্তায়। ঘরে বসে একা মদ খেতে খেতেও এরকম হয় লক্ষ্য করেছি।

যেমন এখন আমি হাঁটছি, হঠাৎ দেখলাম—জুঁই, জুঁইই তো, কার হাত ধরে যেন, দেখতে দেখতে ভিড়ের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল। তারপর আমি অনেক ধাক্কাধাক্কি খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই আবার হাঁটছি। আবার একটি ইমিটেশনের দোকানে জুঁইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। স্কার্ট পড়া, তাও যেটা আকারে যথেষ্ট ছোট হয়ে গেছে, সেটা। নীল লঙের। হয়ত কানের দুল, পুঁতির মালা যে যে কাঁচের ডালায়—জুঁই সেদিকে ঝুঁকে পড়েছে। দোকানিও একটা কিছু দেখছে মনে হল, তন্ময় হয়ে। বা জুঁইয়ের হাত টেনে নিয়ে আদরে আদরে চুড়ি পরিয়ে দিচ্ছে। মূলত এখানেই শাণিতের অসুবিধা। চুড়িওয়ালা কোন কষ্ট না দিয়ে পরাতে পারলেই গণ্ডগোল হয়ে গেল ব্যাপারটা। মেয়েদের কৃতজ্ঞতাবোধেরও কোন মা বাপ নেই জানেন তো? তারপর হয়ত দেখলাম—জুঁই না মেয়েটা অন্য কেউ।

সঙ্গে সঙ্গে শাণিতকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করে উইপোকা। ভেজা পিচ্ রাস্তা থেকে পোড়া গন্ধ, ধোয়া আর উইপোকা উঠে। অসহ্য লাগে তাদের পাখার ফরফরানি। শরীরে বসেই পিলপিল করে হাঁটতে শুরু করে দেয়। অনুপ্রবেশ করে। দৌড় দিয়ে এই একটুখানি আলোকিত পথ পার হয়ে গেলেই একটা শিরীষ গাছের ঝাউ অন্ধকার পায় শাণিত। তাড়াতাড়ি শার্ট খোলে, গেঞ্জি খোলে, ঝাড়ে, একটা দুইটা পোকাকে আঙুলে পিষে ফেলে। প্যান্ট খোলে না সে তবে দু'এক জায়গায় হাত ঢুকিয়ে চুলকে নেয়। এক এক করে গেঞ্জি সার্ট পরে, বোতাম লাগায়। তাড়াতাড়ির মধ্যে তার গোটানো হাতল খুলে যায়, আবার লাগায়। চুলে আঙুল চালিয়ে সে মনে মনে বলে—এর বেশি কী দরকার আছে! শরীর থেকে যত উইপোকা ঝেড়ে ফেললেই কি মুক্ত হয়ে গেছে মনে করে শাণিত? না। তার শরীরে এখনও মোটা তুলির কিছু পোঁচ লেগে রয়েছে, ঠিক কালো রঙের নয়, ধূসর বিষণ্ণতা। কথা ছিল সে বিদুরকর্তা, পোস্টাফিস চৌমুহনী, কামান চৌমুহনী, মটরস্ট্যাণ্ড হয়ে, পূর্বথানার সামনে হেঁটে হেঁটে ঘরে ফিরে যাবে। থানার সামনে কি রকম জানি হয় শাণিতের। বার বার মনে হয় — এই বুঝি হাঁক পাড়ল কেউ– কুত্তার বাচ্চা শোন্। ভিতরে ঢুকেই ইন্টারোগেশন রুম।

কিন্তু শাণিত যেদিকে যেদিকে এসেছিল–সেদিকেই ফিরে যাবে ঠিক করল। এর পেছনে হয়ত সেই অপমানজনিত কারণটা থাকতে পারে। অবশ্য শাণিতকে প্রশ্ন করলে সে উল্টো বলবে –তুমি অসুস্থ, ওসব কোন কারণ নয়, এমনি।

তবে এখন বমি বমি ভাব হচ্ছে সত্যি। মাঝে মাঝে এমন হয়। তখন গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে একচোট বমি করে নেয়। এটাও একটা কারণ হতে পারে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার। আজ বমি টমি

কিছুই করল না। পেছন ফিরে হাঁটছে শুধু, আস্তে আস্তে, অন্যমনস্কভাবে। এবং এখনই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানটিও ভাঙল। একটু দাঁড়াতে হল শাণিতের। সিনেমা ভাঙলে দৃশ্যটি যদি হয় সাদা কালো, তাহলে এটা রঙিন, সুগন্ধযুক্ত এবং যৌন।

কিন্তু ফেরার পথে সেই চিলড্রেন্স পার্কের সামনেই আবার কেন দাঁড়িয়ে রইল শাণিত? অবশ্য ইদানিং রাস্তায়-ঘাটে সে এমনি দাঁড়িয়ে থাকে। খুব ভাল করে লক্ষ্য না করলে পথচারিদের কিছু বুঝার কথা নয়। এখন যেমন আলস্যে এদিক ওদিক দেখছে। আর কিছু ভাবছে কি? তখন সেই গন্ডগোলের কথাটা? ঠোটের কোণা চিন চিন ব্যথা করছে এখনও।

—শাণিত, শীত শীত করছে নাকি তোমার? পেছন থেকে একটা বুলেট এগিয়ে আসছে। এর শব্দ শুনেই বুঝা যায় —ভেট ভেট, বক্কা বক্কা কালো ধুঁয়া হবে। পরিবেশ দূষণে ভরে যাবে বুকের ভেতর। তারপর প্রাণায়াম শুরু করে দেবে সে। আগরতলায় কলকারখানা নেই। তেজস্ক্রিয় সূঁচও হারায় না। শুধুমাত্র খাটা পায়খানা, ভাঙাচোরা ইঞ্জিনের ধুঁয়া আর ইট ভাঁটাগুলি।

হঠাৎই ব্যাঙের মত লাফিয়ে উঠল। বুলেটটা যে তার শার্টের কলার কাঁপিয়ে যাবে—ভাবতেই পরেনি। তবে অনেকখানি চলে যাওয়ার পর আৎকে ওঠা সেই মুহূর্ত মনে করে ভাল লাগছে। একেবারে অরিজিনেল ফিলিংস্। এবং ডেল কারনেগির মত কতগুলো টিট-বিটও আবিষ্কার করেছে সে। এভাবে একা একা বা নিঃসঙ্গ শুয়ে বসে থাকলে—জাবর কাটে। ঠিক জাবরকাটা নয় —শাণিত আসলে একদিক থেকে কুড়োতে থাকে স্মৃতি আর অন্যদিকে কমলা রঙের ফুটকি নিয়ে অজস্র শিউলি ঝড়ে পড়ে—যা কিনা চোখের পাতায় পড়লে দু'চোখ বুজে আসবে—মায়ের স্পর্শ পেলেও এমন হয়! আসলে গত দিনগুলিকে সে সিঁড়ি মনে করে। এবং থপ্ থপ্ করে নামতে থাকে নিচে। যদিও কয়েক কদম নেমেই সতর্ক হয়ে পড়ে শাণিত। শুনেছি প্ল্যানচেটে যে ভূতকে ডেকে আনা হয়, অনেক সময় অন্য ভূতও নাকি ঢুকে পড়ে মিডিয়ামের শরীরে। এভাবেই সিঁড়ি নামতে নামতে একসময় সে একটা জলের কুয়ো পায়। পায় মানে কি— অনুমান করে। অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জলের ঢেউ কিভাবে অনুভব করা যায়? সে পারে। হঠাৎ বেশি করে ঠান্ডা পেয়ে যায় হয়ত। আর নিচে নামতে চায় না। যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। বা আদপেই হয়ত জল নেই নিচের সিঁড়িতে। আরো কত নিচে গেলে—তাও সে জানে না। এখানে আসার সময় প্রথম কয় কদম কিছু সূর্যালোকও ছিল। এখন কী অবস্থা! তবু নিজেকে সে গভীর জলতলের একজন ডুবুরিই মনে করে। সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই। জীবনে ব্যর্থতা এত বেশী যে ফিরে যাওয়ারও তেমন ইচ্ছে নেই এখন। কোন লক্ষ্যবস্তু নেই হাতের কাছে। ফলে টেক্সাস টুপি দিয়ে সারাটা মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে শাণিত।

এমন সময় তার বন্ধ চোখের পাতায় কয়টা আলোর বক্ররেখা আঘাত করল। চামড়া ফুঁড়ে চোখে যে অনুভূতি হল তাকে আমি জীবন প্রদীপের আলো মনে করি। এবং সবই যেন ঈশ্বরী পাটনীর কাজ। শাণিত চোখ মেলে—তুমি কে গো! করতলে প্রদীপ ধরে রেখেছো? উজ্জ্বল মুখমন্ডল, শূন্য সিঁথি এবং অন্ধকার শরীর তোমার বাতাসে কাঁপে।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির খুব কাছাকাছি আসার পর, সেই মিষ্টি দোকানে কাজ করে একটি ছোট্ট আহ্লাদী ছেলে, কানাই, এখন ডেকে ডেকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। আর শাণিত ছিল অন্যজগতে। তাই ছুটে এসে শাণিতের গায়ে হাত দিল কানাই—দাদা!

যেন মুগুর দিয়া আমার মাথায় মারল কেউ— কি হয়েছে রে! লালবাহাদুর ক্লাবের সাথে কোন গন্ডগোল টন্ডগোল নাকি? কয়টা বোমার আওয়াজও শুনেছি সন্ধ্যাবেলায়।

—না না, অনেকদিন দেখিনি বলে, কেমন আছেন, বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন নাকি?

শাণিত জোর করে একটি দীর্ঘশ্বাস আটকে দিল। চট্ করে বিলি কেটে দিল ছেলেটার চুলে—কেমন আছিস?

—ভাল।

শাণিত আরো একবার বিলি কেটে দিল—চলি রে !

আমার যে কতটা ক্ষতি করে দিলি—কী বুঝবি তুই ! কোথায় ছিলাম আর কোথায় নিয়ে এলি ?

এতক্ষণ পর মনে হল — টিল যে পড়েছিল মাথায়—এখন ভার ভার লাগছে । ঠোঁটের কোণে ব্যাথা—হা করা যায় না । মেজ মেজ করছে গা, পা দুইটা পাথর ।

আর কানাই যেখানে ছিড়ে দিয়েছে সূতা — সেখানে একটা গিঁট দেওয়ার চেষ্টা করছে শাণিত । লালিমার মুখ মনে করার চেষ্টা করছে । রাজরক্ত যার শরীরে ।

আরেকদিন অফিস কেন্টিনে আমাদের তর্কের বিষয় ছিল—১৯৪৯ সালে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্ভূক্তি । এ জি অফিসের কেন্টিন গিজ গিজ করছিল তখন । একটা করে টেবিল আর চার পাঁচটা চেয়ার —এভাবে খানে খানে জটলা। সিগারেটের ধুঁয়া, চা, জর্দা পানের গন্ধ । সময়টা অবশ্য টিফিন টাইম-ই । আমাদের পাশে একটা টেবিল, তারপরই ননীদা ওরা । আমি ওখানে জায়গা পাইনি বলে এদিকে এসেছি । মনীষ ওরাও আমার বন্ধু । কনটেমপরারি । আমরা যখন আড্ডায় বসি তখন বিষয় আশয় সব সময় রাজনীতি থাকে না, প্রেম ভালবাসা শরীর ইত্যাদি থেকে খেলাধূলা পর্যন্ত সবই আলোচনা হয় । আজ ব্যাপারটা কিন্তু অন্য মোড় নিয়ে নিয়েছে । সারথিকে কিছুটা উত্তেজিত মনে হল আমার । এ ঘটনার কদিন পরেই আমি এ জি অফিস থেকে আউট হয়ে পড়ি ।

কথা বলতে বলতেই সারথি একটা থাপ্পর মেরে উঠল টি-টেবিলে । তখন আমি ননীদার কিনারে দাঁড়িয়ে তার কথাগুলি গিলছিলাম । বসার জায়গা নেই । এদিকে আবার কি হল ! কেবল পলিটিক্স !

সারথির কথা হল স্বাধীন ত্রিপুরার ভারতভুক্তি মেনে নেয়নি অনেকে ।

— তাহলে ত্রিপুরা স্বাধীন থাকলেই কি ভাল ছিল ? আমি এর কোন উত্তর দিতে পারব না কারণ এটি খুব ছোট্ট একটি রাজ্য । অর্থনৈতিক দিক থেকেও ভীষণ দূর্বল । ওদিকে মৌলবাদী । এই পার্বত্য ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে ডিভিসন অফ লেবার ব্যাপারটা ছিল না । তাই এখানকার সমাজ সম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি । কামার ছুতার স্বর্ণকার এভাবে ভাগ ভাগ ছিল না । তখন রাজা বাহাদূরই তোমাদের নিয়ে আসেন এখানে । তোমরা সমতলী মানুষ, কৃষিজীবী, জীবনের অলিগলি ভাল জান । যথারীতি আমরাও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি তোমাদের উপর । মহাভারতীয় ধর্ম্মযুদ্ধের শরিক হওয়ারও লোভ ছিল আমাদের —কৌলিন্যের লোভ । এসবই ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির কারণ বলে মনে হয় আমার ।

—তাতে কী হয়েছে ? বাস্তবিক পক্ষে এর চেয়ে ভাল পথ ছিল না । তুমি জান কি —অন্তর্ভুক্তির জন্যে পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল ভারত সরকারকে ? ত্রিপুরায় তেল আছে বলে লোভ দেখানো হয়েছিল ?

এই মনীষটাকে কিভাবে গালাগাল দিলে সুখ হবে স্থির করতে পারে না সারথি । তার কোন সময় মনে হয় ছেলেটা মৌলবাদী, লুনাটিক, ফেনাটিক ।

—তোমার ভারতবর্ষ কি দিয়েছে আমাদের ? এই উত্তর পূর্বাঞ্চল কি ভারতের মধ্যে পড়ে ? সেই দ্রোণাচার্যের যুগ থেকে এখানে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হয় । যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে —এমনকি একলব্যের বৃদ্ধাংগুষ্ঠ পর্যন্ত ।

হঠাৎই মনীষ উঠে দাঁড়ালে আমরাও রণে ভঙ্গ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি । সারথি তখনও বসে । খপ্ করে ধরে ফেলে আমার একটা হাত, টেনে বসিয়ে দেয় ।

খালি কাপগুলি জড়ো করার সময় একধরণের শব্দ হয়, কাঁচের গ্লাস জড়ো করার শব্দ অন্যরকম—

—আমাকে ছাড়, সেক্‌শনে যাব ।

—বেশি কথা বল্লে ইলোপ করে নেব ।

এই সারথি দেববর্মাই সারা ত্রিপুরায় আমার একজন মাত্র বন্ধু। অফিসে কেউ জয়েন করতে এলেই যেচে পরিচয় করতে আসে ছেলেটা। সে স্থানীয় বলেই হয়ত—গ্রহণ করে নেয়ার একটা মনভঙ্গি আছে তার। কিন্তু পদ্ধতিটি খুব বিশ্রী। পেছন থেকে ধুম করে একটা থাপ্পর বসিয়ে দিল হয়ত। নুতন জায়গা। তবু আমি রেগে গিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখি ছেলেটা বোকার মত হাসছে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে— আমি সারথি।

—আমি শাণিত।

তারপর থেকে ফাঁক পেলেই আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তাম এদিকে ওদিকে। নিজে আমি নিঃস্ব মানুষ—গর্ব করার কিছুই নেই আমার। আবার সারথিকে মনে হত—তার বুকের মধ্যে মস্ত বড় ক্ষত আছে। আমরা নিঃশব্দে হাটতাম এবং এই কথাটাই ভাবতাম সবসময়। আরো মনে হত সারথিকে আমি ছুঁইতে ধরতে পারিনা—তার সুউচ্চ একটা শিখর আছে। সে যদিও তার মুকুটটাকে ধূলায় রেখে যখন তখন ফুটবল খেলা শুরু করে দেয়। তখন আরো শীৎকার হয় আমার। আমি নত হয়ে পড়ি তার কাছে।

সেদিন মনীষ ওরা চলে গেলে—সে আমাকে বলল—চল, তোকে আজ একটা গহ্বর দেখাব। প্রায় ছয় ফুটের মত লম্বা হবে সারথি দেববর্মা। তার বুক কোমড় সবই একবার একবার নজরে পড়বে তোমার। অতি লম্বা দুই বাহু। লম্বাটে মুখমন্ডল এবং গায়ের রঙ নিয়ে আমরা সব সময় কথা বলি। শুধু চোখের কোণ দুটিতে মঙ্গোলিয়ার ছাপ আছে।

এমনকি এক কিকে স্টার্ট হয় তার রাজদূত। ভেট্ ভেট্ করে উঠে। সে উঠে বসে, তারপর আমাকে ইশারা করে —বস। ধক্ করে চলতে শুরু করে। খুব কম সময়ের মধ্যে গতি পায়। তারপর বাতাস কেটে কেটে পাখীর মতই উড়ছিল। আমি কোন বেতালা কথা বলিনি—কোথায় যাচ্ছিস? তার আগেই বাতাস আমার নাক মুখ বন্ধ করে। আমি তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে শ্বাস প্রশ্বাস করতে থাকি। তবু বাতাস আমাকে পীড়া দিচ্ছে। দুচোখ ভরে উঠেছে জলে। হঠাৎই ব্রেক কষল সারথি। আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। ধাক্কা লাগল গিয়ে তার পিঠে। প্রায় দুইজনই একসঙ্গে নামলাম।

এই জায়গাটার নাম সূর্য চৌমুহনী। এখন তার বাইকটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সারথি। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে গট্ গট্ কবে সূর্যঘর সিনেমা হলের দিকে এগিয়ে যায়। টপ করে ঢুকে পড়ে একটা বিলিতি মদের দোকানে। শাণিতের ভাল লাগছে না। দোকানের নামটাও অদ্ভুত —'রাম'। এটা কিন্তু বার নয়। সারথির পেটে কি বুদ্ধি কে জানে! অন্য কিছু না। মাল তো আমিও খাই। এখন ভাল লাগছে না। কিন্তু শালার শালা, ভমা ভমা গলায় আমাকে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। এরকম সময় ভীষণ লজ্জা করে। আমি জানি সে থামবে না। তাই তাড়াতাড়ি অসভ্যটার কাছে দৌড়ে যাই—কি? চেঁচাচ্ছিস কেন? আমার ভুরু যতই কুঁচকে থাকুক না কেন—আমি জানি সে থামবে না। আমি তাকে এড়াতে পারব না। দোকানির সঙ্গেও নিশ্চয়ই তার একটা ভাইল আছে। সে ডাকে—আরো কাছে আয়। আমি যাই—না গিয়ে উপায় নেই আমার। তবু বল্লাম—খাব না। সে এক সিঁড়ি উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁহাত দিয়ে আমার ডানহাত চেপে ধরল। তারপর ভারি হাতটাকে রাখল আমার কাঁধে। সারথির সঙ্গে দোকানি বেটাটাও আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হা কর। এইবার আমি মুচড়া মুচড়ি শুরু করি — না কিছুতেই না। কিন্তু সারথি আমাকে শুরুতেই পাথরের মত চেপে ধরেছে। অটোমেটিকেলি আমার মুখটা এখন পাখির বাচ্চার মত হা হয়ে গেল। সে তার আঙ্গুল এবং বোতলের মুখ দুটোই ঢুকিয়ে দিল আমার মুখের মধ্যে। এইবার সারথিকে আমার খুনি মনে হল। কী পেয়েছে সে? আমি কি পারি না তার নুনুতে একটা লাথি কষিয়ে দিতে? এতক্ষণ পর প্রথম ঢোক গিললাম। কিন্তু একসঙ্গে তো আর অনেকগুলি ঢোক গেলা যায় না। তাই একদিকে উপচে পড়ে আমার বুক গলা ভিজে যাচ্ছিল ঠাণ্ডায়, আর ভেতরটা পুড়ছিল। তারপর ঢোক গিলতে গিয়ে আবার নাকতালু

লাগল যখন—সারথি ছাড়ল আমাকে । তখন আমিও তার হাত থেকে এক ঝটকায় বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে গলায় ঢেলে দিলাম ঢক ঢক করে । নিজে নিজে অনেক কিছুই পারা যায়, আত্মহত্যাও করা যায় কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে খুন হওয়া যায় না । জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে বুক তবু আমি মুখভঙ্গি বিকৃত করলাম না । এদিকে সারথিও একটার পর একটা নিব গলায় ঢেলে দিচ্ছে । মোট তিনটা । একবার শুধু একটা ঢেকুর তুলল । শান্তভাবে পয়সা মিটিয়ে দিল দোকানিকে । আমাদের দিকেই তাকিয়ে একটা রাস্তার ছেলেকে ডাক দিল । সবকটা বোতল তুলে দিল তার হাতে । তারপর আমার হাত ধরল, বলল—চল । আমি শুধু চিন্তা করছি সারথি মায়াবী, কারণ তার হাতের স্পর্শটি এখন আমার কাছে মায়ের চেয়ে দামী মনে হচ্ছে ।

কী সব হাবিজাবি কথা বলতে বলতেই সে বাইকে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল । শালা মদতি তার হাত একটু কাঁপল না । পায়ে স্ট্রোক করল, ভেট ভেট করে উঠল রাজদূত । সে উঠে বসে বলল—প্রস্তুত । আমিও আর দেরি করলাম না । তরল পদার্থগুলি এখন আমার শরীরে কাঁচপাত্রের ভেতরে যেমন থাকে তেমনি রয়ে গেছে মনে হল, শুধু পোড়ায় ।

সারথি আবার সেই বাজপাখিটা—কুছ পরোয়া নেই, জড় পদার্থগুলি পর্যন্ত দৌড়ে দৌড়ে যায় । চোখের সামনে রাজবাড়ি ক্রমশ বড় হতে থাকে, অথচ এখনই একদলা থু থু ফেলার প্রয়োজন হল সারথির ।

—শাণিত, তুমি এখন একজন বাজদ্রোহীর ঘোড়ায় চড়ে বসেছ ?

প্যালেস কম্পাউণ্ডটাও কম বড় নয় । সারথি লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দিকে গিয়ে একবার দুইবার চক্কর মারল । ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ঢুকল বেরোল । রাণামহল, জগন্নাথবাড়ি, জোড়া দিঘি, পুরনো লালদালান, উত্তর গেইট হয়ে কম্পাউণ্ডের পশ্চিম দিকে কর্ণেল চৌমুহনীতে গিয়ে থামল । বলল—নামবি না কিন্তু ! তাবপর বাইকটাকে আবার সে উত্তর দিকে মহিম ঠাকুরের বাড়ির দিকে সোজা চালিয়ে দিল । এবং কর্ণেল বাড়িটাকে এড়িয়ে আরো এগিয়ে যেতে থাকল ।

এখন আমি কোন কথা বলছি না কারণ সারথির নেশা কতটুকু চড়েছে—কিছুইতো বোঝা যাচ্ছে না । তখন মদ খাওয়ার সময় মনে হয়েছিল তার নিচের ঠোঁট সবসময় ভেজা থাকে । কিন্তু এখন বাইকটাকে সে এমন জায়গায় কন্ট্রোল করল—সত্যি আশ্চর্য হতে হয় ! মেইন রাস্তা ছেড়ে এবার একটা ইট বিছানো পথ ধবল সারথি । আমি এখন চোখের সামনে ঘন বন দেখতে পাচ্ছি । যদিও সবই গৃহপালিত বৃক্ষ, ছোট মোট গাছগাছালি । আমি মধ্যেই আরেকটা গেইট দেখতে পাচ্ছি— । থোকা থোকা ঘাস । আমরা দ্রুত পার হয়ে গেলাম ঘাস বাগানটিও । তারপর দেখলাম ইটের রাস্তা শেষ । এবার পেছন ফিরে দেখি বন জংগলে ঢেকে ফেলেছে আমাকে । পুরনো দালানবাড়ির টুকরো ইট চুন সুরকির ঢিবি খানে খানে ।

আমরা যেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখান থেকেই থাক-থাক সিঁড়ি উঠে গেছে । পাশে বেশ লম্বা, উঁচুও । তারপর একটা বারান্দামত চত্বর, আবার সিঁড়ি । সারথি ততক্ষণে কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেছে । আমার মত নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বাইক—একটু কাৎ হয়ে । বিরক্ত হয়ে সারথি ডাক দিল আমাকে । আমি প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই বুঝলাম শ্যাওলায় পা ডুবে যাবে । যাই হউক উপরে উঠতে হবে । বারান্দা মত চত্বরটায় এসে একটু দাঁড়ালাম । কিন্তু সারথির তর সয় না । সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে । তারপরই শেষ সিঁড়ি । তাও সুন্দরমত পার হযে গেলাম আমি এবং পড়লাম গিয়ে আরো বড় একটা বারান্দায় সেখানে পরিচয় হল একটা খাঁচাবন্দী ময়নার সঙ্গে । সে দুইবার ডেকে উঠল—রাজকুমার, রাজকুমার ।

হা হা করে হেসে উঠল সারথি । কোথা থেকে যেন অনেকগুলি কবুতরও তারে উত্তর দিল । আমি দেখলাম বাড়িটার দুইদিকে দুইটা লম্বা লন চলে গেছে । একটা উত্তরে আরেকটা পূবে পশ্চিমে । এটিও একটি ধ্বংসস্তূপ । পুরোটা বাড়ি, লনগুলি সব ফাটা ফাটা, লাফ দিয়ে পার হওয়া যায় না এমন গহ্বর । আর গাছের শিকড়ও আমার মতে সরীসৃপ শ্রেণীর—পুরো বাড়িটাকে

পেঁচিয়ে রেখেছে এবং ছোট ছোট শিকড়ে গ্রাস করে ফেলেছে আস্তর। আমার সামনে এখন মস্তবড় একটা দরজা খা খা করছে। ভিতর থেকে হাতছানি দিচ্ছে সারথি। এখন কি করব আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আর একটি মাত্র ভূমিকম্পের অপেক্ষা। সারথি যে আমাকে ডাকছে—ভিতরে আয়! দেয়ালে দেয়ালে তার প্রতিধ্বনি। আয় আয় আয়।

আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই। আমি পা বাড়ালাম। একঝাঁক পায়রা কলকল করে উঠল। তাদের প্রত্যেকটি বকম-বকম দেয়ালে দেয়ালে ফিরে একেকটি ভূতের ঢিল যেন পড়ছে আমার গায়। আমার পা কাঁপছিল। আমি ভুলে গেলাম এখনও সন্ধ্যা হয়নি। এমন এক ভয়ংকর বিশালতার সামনে আমি কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি এখন!

তারও যে এমন একটি অতীত আছে সে কোনদিন বলেনি তো! তবে সারথির যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে এই বিশাল ধ্বংসস্তূপটির আমি মিল খুঁজে পাচ্ছি। কবুতরগুলি অনবরত বকবক করে চলেছে। অনেক উঁচুতে ঘরের ছাদ, আরো অন্ধকার ওখানে, ক্রমাগত বিষ্ঠাত্যাগ করে চলেছে। এখন বাইরে বিকাল, ঘরে সন্ধ্যা। একইসঙ্গে দেয়ালগুলিতে তবু কিছু আস্তর অবশিষ্ট আছে। একই সঙ্গে চারপাশে ঝুরঝুর করে পড়ছে সময়। যেদিন এই প্রপাত একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন কি হবে?

দেয়ালগুলিতে কত বিচিত্র ছোপ ছোপ। শিকড় বাকড় দেখা যায়। অনেকগুলি জানালা আছে এই ঘরে। খানে খানে কাঁচভাঙ্গা। সেই ফাঁকফোকর দিয়ে যতটা আলো হাওয়া আসে—আমি দেখলাম উত্তরের দেয়ালে মস্ত বড় বড় কয়টা ছবিও টাঙানো আছে। মাকড়সার জাল আর ঝুলে ছবিগুলি দুলছে মনে হয় এবং কিছুই বুঝা যায় না।

আরেকটা কথা মনে হল—এতবড় ঘরদুয়ার পরিষ্কার করার কেউ নেই। এতক্ষণ আমি সারথিদের দেয়ালে দেয়ালে হাঁটছিলাম। এখন আমার সামনে একটা ধবধবে সাদা টেবিল। অন্তত কুড়ি চেয়ারের টেবিল। কে যেন বলেছিল, অনুপই হবে—সব সাদা পাথরই শ্বেতপাথর নয়। গোল করে চেয়ারগুলি সব সিংহাসন মার্কা। সব ভাঙা—কোনটার হাতল নেই, কোনটার পিঠ। এককোণা ভাঙা টেবিল। এবার আমি একটা চেয়ার টেনে বসব ভাবলাম, কিন্তু ভীষণ ভারি।

এমন সময় ঘন অন্ধকার থেকে আবার ফিরে এল সারথি, বলল—বস। আসলেও আমার পা দুইটা কাঁপছিল—আমি ধপ্ করে বসে পড়লাম। এর একটা হাতল নেই। সারথিও চেয়ার টেনে বসল।

শাণিত দক্ষিণের দেয়ালে কয়টা বাঘ হরিণের মাথাও দেখল আর আড়াআড়ি করে ব্রিটিশ আমলের দুইটা বন্দুক রাখা আছে। সবই অস্পষ্ট অবশ্য। আধো অন্ধকার, বাস্তবের ধ্বংসস্তূপ আর কাঁপা কাঁপা কল্পনা। শাণিতের আরেকটা ভয়ের কারণ হল—এ ঘরে কথা বললেই ইকো হয়। তবে প্রশ্ন করার মত এখন আমার হাতে অনেক মেটার আছে। (এক) তুই কে রে সারথি — তোর ইতিহাস কি? (দুই) সারিবদ্ধ এই ছবিগুলো কার? (তিন) তোর আর কে কে আছে রে?

কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নটি বড় বেশি নাটুকে। তৃতীয়টি একান্ত ব্যক্তিগত। ফলে দ্বিতীয় প্রশ্নটি উচ্চারণ করলাম আমি — এই ছবিগুলি কার সারথি?

সে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে রেখেছিল। আমার দিকেও বাড়িয়ে দিল একটা। আমি নিলাম এমনভাবে যে উত্তরটাও লাগবে আমার। সে আগুন ধরিয়ে দিল সিগারেটে এবং প্রায় একইসঙ্গে দুই মুখ ধোঁয়া ছাড়লাম আমরা। আমি বসেছিলাম তার ঘরের ঘন অন্ধকার দিকে মুখ করে এবং সে বসেছিল পূবমুখী দরজা খোলা আলোর দিকে। উঠে দাঁড়াল সারথি, আমাকে ডাকল—আয়।

আমি গিয়ে তার পেছনে দাঁড়ালাম। সেও পেছনে দুইটা হাত নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আমার দিকে না ফিরেই বলে—এই যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছিস—এরা ফরাসি পর্যটক। ত্রিপুরায় এসেছিলেন ১৬৬১ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন একসময়। তাদের মতে ত্রিপুরায় সোনা আছে, তবে উন্নতমানের নয়। তার পরের ছবি কুমার উৎসব রায়ের। তারপর

জগৎরাম ঠাকুর আর ইনি রাজা মুকুন্দরাম রায় । কিন্তু এইবার যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছিস, সবচে' বড় ছবি, রঙ উঠে ধূলার আস্তরণে এখন আর কিছুই বুঝা যায় না । ইনি ত্রিপুরার মহারাজা ছত্রমানিক্য বাহাদুর । তোমাদের নক্ষত্র রায় । আমার পূর্বপুরুষ । যদিও আমি এই বৃক্ষটির একটি প্রশাখামাত্র ।

আর আমি হলাম গিয়ে শাণিত সেনগুপ্ত, আমার অস্তিত্ব জুড়ে এখন শুধু—জয় সিংহ, রঘুপতি এবং অবশ্যই নক্ষত্র রায় । যাবতীয় সংস্কার এসে ভর করেছে আমার শরীরে । কার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি ? আমিই বা কে ? তারপর সারথি আমাকে আবার হাত ধরে ফিরিয়ে আনে শ্বেতপাথরের টেবিলে ।

ফিরে আসা মানে কি — আমি যেন এখন ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছি । সারথির কাছে ফিরে আসারও চেষ্টা করছি ভীষণভাবে । ওকে একটা চারমিনার অফার করলাম । সে নিল কিন্তু নড়াচড়া করল না বিশেষ । আমি বললাম—রাজকুমার সারথি—তুমি বামপন্থী রাজনীতি করতে গেলে কোন দুঃখে !

হো হো করে যেন স্মৃতি-ঘোর কাটিয়ে উঠল সারথি আর প্রতিধ্বনিগুলি আমাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে গেল । কোন ঘোর নেই তবু তাকে চিন্তিত মনে হল আমার ।

—অনেক আগে থেকেই আমরা রাজদ্রোহী হয়ে গেছি হে প্রিয়পাত্র ? তবে গোটা ব্যাপারটাকেই তো আবার নতুন করে ভেবে দেখতে হবে !

—কি কি ভেবে দেখতে হবে সারথি ?

— ত্রিপুরার রাজা ও এলিট উপজাতিরা—আমরা, প্রজাকুলের শত্রু । তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে ক্রমাগত শোষণ করে গেছি । কিন্তু দিনকাল পাল্টে গেছে । বামপন্থীরাও আর ত্রাতার ভূমিকা পালন করতে পারছে না । এই অবস্থায় দরিদ্র উপজাতিরা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে যদি সমাজটাকে পাল্টাতে চায়, এতদিনের শত্রুতা ভুলে সাহায্যের হাত বাড়ায় আমাদের কাছে, একজন উপজাতি হিসেবে আমি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি ! মূল স্রোতে প্রবেশ করার এত বড় সুযোগ আমি নষ্ট করি কিভাবে শাণিত !

—সারথি, তোর মুখে তো সবসময় জাতি উপজাতি সম্প্রীতির কথা শুনেছি—তার কী হবে ?

নিভে যাওয়া সিগারেটে আবার সে আগুন ধরালো । ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ—আমারও তো একই প্রশ্ন রে ভাই শাণিত সেনগুপ্ত !

আমার দীর্ঘশ্বাস মাটি ছুঁয়েছিল । তারপরই অস্থির হয়ে পড়ি—ফিরে যেতে হবে । এমন সময় দূর অন্ধকার ফুঁড়ে একটি অতিকায় লণ্ঠন আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখি । মনে হয় শুধু আমিই দেখতি পাচ্ছি, সারথি স্বাভাবিক ধোঁয়া ছাড়ছে । আমার আরো যা যা প্রশ্ন ছিল সারথিকে করার, সবই এখন ঐ লণ্ঠনটার দিকে ছুটে যাচ্ছে । বাইরে যা'ও কিছু আলো ছিল এখন সবই শুষে নিয়েছে । হেলতে দুলতে ঠক্ করে বসল ঐ শ্বেতপাথরের টেবিলটার উপর । এবং তার পেছনে থালা হাতে এখন জ্যোতির্ময়ী যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাকে আমি মানবী বলতে পারি না কিছুতেই, কারণ আমার দেখা কোন নারীই এমন নয় । প্রকৃতই সুগন্ধযুক্ত কোন রমণী কি আছেন পৃথিবীতে ! লণ্ঠনটি রেখে দেওয়ার পরও কেন তার শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় ? ময়নাটির মত এবার আমারও মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়ে—রাজকুমারী ।

সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মূর্তিটিও রিয়েক্ট করল—না না, আমি লালিমা দেববর্মা । দাদার কাছে আপনার অনেক কথাই শুনেছি । আমরা নির্বান্ধব । আমি আর দাদা ছাড়া এ সংসারে আমাদের কেউ নেই । আপনি দাদার বন্ধু শুনে আমার খুব হিংসে হয়েছে । আমার বন্ধু নেই !

শাণিত যে কখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ! সারথি মুচকি হাসছিল । নমস্কার করল শাণিত । লালিমা তার হাত থেকে যে প্লেইটটা এখন টেবিলে রাখল—সেটাও কি শ্বেতপাথরের — ধবধবে সাদা । আর সবই ফলপসারি । পেস্তা বাদাম খেজুর একসাথে দেখে তার কি জানি একটা

গানের কলি মনে আসছে, আসছেও না—এই এক যন্ত্রণা, তখন নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে। এমন সময় লালিমার চিকন লম্বা হাতটা দেখে যাহোক কিছু শান্ত হল শাণিত। গানের কলিটা নিশ্চয়ই রাজস্থানী হবে। লালিমাও নমস্কার করল —আপনি বসুন। এই সামান্য কিছু ফল খেয়ে নিন। আমি জল নিয়ে আসছি —

আর শাণিত বসে রইল স্বপ্নের মধ্যে। সময় এখন মহাযান—তার পিঠেই চড়ে বসেছে। খিদেও পেয়েছে খুব। তাই লালিমার দেয়া ফলগুলি সে এক নিমেষে শেষ করে ফেলল। এবং অপেক্ষা করতে থাকল। চোখাচোখি হল সারথির সঙ্গে—শালা! শাণিত উঠে দাঁড়াল—আজ চলিরে সারথি, অনেক কাজ আছে। যেন সারথি বললেও এক মুহূর্ত দাঁড়াবে না। কিন্তু লালিমাকে আরো আরো অজস্রবার দেখার ইচ্ছা তার রইলই।

শাণিত চলতে শুরু করে দিয়েছে দেখে সারথিও তার পিছে পিছে যায়। —সময় পেলে রোজই চলে আসিস। সিঁড়িতে পৌছে শাণিত একবার দাঁড়াল। পেছন ফিরে দেখল—কেবল সারথি, না আরো পেছনে একটা থামে হেলান দিয়ে লালিমাও আছে। এগিয়ে আসে। একগ্লাস জল দেয়—আবার আসবেন। শাণিত জল খেতে খেতে থামে—এটা কি ফ্রিজের জল ? লালিমাও হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—না। আসবেন কিন্তু। লোকে যতই বলুক—আমরা বিশ্বাসঘাতকের বংশধর। আমরা তা নই।

শাণিত সিঁড়ি নামতে শুরু করে।

—দাঁড়া। এত তাড়াহুড়া করছিস কেন ?

—আচ্ছারে সারথি, তোদের বাড়িতে সাপের উপদ্রব খুব বেশি তাই না ? ?

— ওদের আশ্রয়েই আছি বলতে পারিস।

সে আমাকে বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে বলল—পারলে কাল আসিস একবার।

—তুই পত্রিকা অপিসের পার্টটাইমটা করিস নাকি এখনও ?

—করি। পয়সার জন্যে নয়। কাজটা আমার ভাল লাগে বলে করি। তোরও তো লেখালেখির বাতিক আছে—করবি নাকি কিছু একটা ?

—দেখি !

এখন আবার একটি উড়ন-খাটোলা আমাকে গণরাজ চৌমুহনীতে নামিয়ে দিয়ে গেল। আমার মনে পড়ে গেল জুঁইয়ের গালে চিমটি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলাম ঘর থেকে।

আমার পাশেই এখন গণরাজ পত্রিকা অফিসে খটাখট শব্দ হচ্ছে।

দশ

আগামীকালের কাগজে কি খবর ছাপা হবে ?

" রাত গভীরে সেইসব রাষ্ট্রনায়কেরা জেনিভায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক সেরে গোপন ব্যালটে বিশ্বনেতা নির্বাচন করেছেন।আগের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানই এখন পৃথিবীর পিতা। সংবিধানে স্পষ্ট করে লেখা– নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক তার সন্তান সন্ততির প্রতি পিতামাতার মত। মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, স্বাধীনতা ইত্যাদি সুরক্ষিত রেখেই প্রতিযোগীতার পথ প্রশস্ত করতে হবে। প্রতিযোগী অর্থনীতিই সর্বোৎকৃষ্ট। তবে যারা দুস্থ অসুস্থও তাদের দায়িত্ব সরকারের। অর্থাৎ সবাইকে কাজের উপযোগী করে তুলতে হবে। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রের সীমানা যেভাবে ছিল এখনও কমবেশী তাই থাকবে। তবে কোথাও যেতে আসতে ভিসা পাসপোর্টের দরকার নেই। সবই অবাধ। যার যেখানে খুশি বসবাস এবং কাজের অধিকার আছে। আর মানবতাব একনম্বর শত্রু যে বৈষম্য–ওদের খতম করতে হবে। কেন্দ্রের হাতেই থাকবে সেনাবাহিনী, বাকিরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রাদেশিক পুলিশ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে – ধর্ম্ম যদি ব্যক্তি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ না করে, পরধর্ম্মে সহনশীল হয় এবং বিজ্ঞানের বিরোধিতা না করে, তাহলে সরকার কখনও কোন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করবে না।"

– ইহা স্বপ্ন নয় তো!

– না তাও না। সময় সময় অশীনদার কথাবার্তা। একত্রে কোলাজ হয়েছে। তিনি নিজেকে একজন গণতন্ত্রী মনে করেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেন বার বার। সংখ্যাধিক্যের মতামতই শেষ কথা। অশীনদা একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক, একজন ট্রেডইউনিয়ন কর্মী। আর বেশীদিন চাকরি নেই তাব।

কিন্তু আমার ? আমার এখন সংগ্রহ সঞ্চয়ের সময়। অথচ দ্বিতীয়বার বেকার হয়ে যাব ভাবতেই পারিনি। ছোটবেলায় গ্রামের সামন্ত প্রভুদের দেখেছি–শহরেও তাদেব বড় বড বাড়িঘর। আর পড়াশুনা জানা বাবুরাই বাডি ভাড়া করে থাকেন। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী – কথাটি প্রচিন হলেও, ব্রাহ্মণ ভদ্ররা ব্যবসায়ীদেব হীন দৃষ্টিতে দেখতেন। আবার আমার চোখের সামনেই দিনকাল বদলালো। তিন চার ভাগ হল মধ্যবিত্ত। সম্পন্ন আত্মীয় কুটুম্ব যত না ঈর্ষার, তার চেয়েও বেশী হিংসুটে ছিলাম আমি বন্ধুদের প্রতি। ওরা নায়লন ডেক্রনের শার্ট, কর্ডের প্যান্ট আব কাবুলিজুতা পড়ত। কিন্তু মুখের হাসি ঠিক রাখতে হত আমার। আমি জানি তো অনেক বড়লোকের বাড়িতে গরীব ছেলেমেযেরা থেকে পডাশোনা করে। যে বা যারা দরিদ্র নারায়ণ সেবা দিয়ে থাকেন তাদের গলায় কত মোটা গামছা, হাত জোড় করা থাকে। রাধুনী ভদ্রমহিলা কখন সুখে থাকেন আমি জানি। জাতপাতের ব্যাপারটা আরো হাস্যকর। আমি মনে করি ওতে কেউই বিশ্বাস কবেন না। এটি একটি আর্থ সামাজিক সুবিধা-রাজন্যভাতা তুলে দিলে রাজারাও তো বেজায় গোঁসা কবেছিলেন। অবশ্য দুই তবফেই কিছু মুর্খ আছেন–ওদের কথা বলছি না। ধর্ম্মেও একই ব্যাপার।

কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির কাজকারবার আমি বুঝি না। মানুষে মানুষে যত না শত্রুতা, দেশে দেশে তাব চেয়েও বেশী। তোমার অবনতি না হইলে আমার উন্নতি নাই। এ কোন প্রতিযোগিতা নয়, এ তো গ্ল্যাডিয়েটর ফাইট –অবধারিত মৃত্যু মোকাবিলা করা যায় কিভাবে? প্রত্যেক সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র একে অন্যের প্রতি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষ নাকি পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ, শ্রীলঙ্কা নেপাল আর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্রপন্থী কার্যকলাপে মদত দিয়ে থাকে'? কথাগুলি আমি কি সত্যি বলে মেনে নেব?

– কী হল ? আবার তো সেই মনের কথা মুখে, জোরে জোরে পক্ষী দেববর্মার মত ! হঠাৎ কোথা থেকে অনুপ এসে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

শাণিত হাঁটছে আর ভাবছে — অনুপটা কি ? এই দেখলাম এই নাই ? ওরা এখন গণরাজ চৌমুহনী থেকে পূর্ব কতোয়ালির দিকে হাঁটছে।

প্রতিদিন ভোরের বাতাসে থাকে অপেক্ষারত একটি চিঠির গন্ধ, ভারত সরকারের মোহর লাগানো। অথচ বেলা বাড়তে থাকলে বিয়ে হয়ে যাওয়া প্রেমিকার মতই পুরণো চিঠি পুড়তে থাকি আমি। কারণ আমি যদি ভেঙ্গে পড়ি তাহলে আশ্রিতদের কি হবে ? ওরা হাসি খুশী থাকলে বুকের মধ্যে মেঘ যত ভারিই হউক না কেন কালো বৃষ্টি হবে না । তাই বলে কি উচাটন কমে ? মোটেও না । বেলা তিনটা চারটা বাজলেই আমি বেরিয়ে পড়ি । রোজদিনই বাইরে এসে প্রথমে একটা সিগারেট ধরাই । একমুখ ধোঁয়া ছাড়ি । নিজের বাইরে এসে আর সব কিছু দেখা বুঝার চেষ্টা করি । কিন্তু কোনদিনই বেশী সময় নির্মেঘ থাকে না আকাশ, কিছু না হউক শালা চিল শকুন তো থাকবেই দু/চারটা, রাতে পেঁচা । আজ চিলড্রেন্স পার্কে যেভাবে আমার সাথে হাতাহাতি হয়ে গেল !

—মাসীমা মেসো কেমন আছে রে ?

—ভাল না, তুইও তো যাছ্ না, সারাদিন কান্নাকাটি করে ।

—চাকরি নাই বলে তুমিও নিশ্চয়ই দুঃখী দুঃখী ভাব ধরে থাক ?

—তুই বিশ্বাস কর, আমি বরং সব সময় বিজলাই ।

—সেই যে খালপাড়ের খবর কিতা ?

—কোন্ খালপাড় ?

—কাবি না কার ভাই যেন ! জুইকে দেখলেই লাইন মারত শালা !

—ও নিরঞ্জন ! এখন আমি আর আগের মত সবদিকে নজর রাখতে পারি না । তুই একটু লক্ষ্য রাখিস অনুপ ।

শাণিত হঠাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দেখে, অনুপ তার হাত চেপে ধরল,. হেচকা টান মেরে বলল—চল, এবার আমাকে একটু এগিয়ে দিবি ।

শাণিত তার ভাড়াবাড়ির গেটটাকে এক বার দেখল, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাসও, কিন্তু খেয়াল করল না অনুপ । আবার গণরাজ চৌমুহনী ফিরতে হবে । সেখান থেকে নাক বরাবর পূর্বদিকে সোজা । তারপর বাঁদিকে, সেন্ট্রাল জেল থেকে আরো পূবে অনুপের ভাড়াবাড়ি । একটিও লোক নেই, কেবল কুকুরগুলি চলাফেরা করে । আর দু'একটা গরু যাদের বনও নেই বসতিও নেই এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়, শাণিতের মনে হয় জাবরকাটা ফাটা কিছু নয়, কেবল ঘর্ষনে দাঁতে মুখে একধরনের সুখ হয় ।

—আরে শালা! তুই তো একটা জব্বর গল্প লিখে ফেলেছিস, পড়লাম !

—কোথায় ?

—পাঁচ ছয় ক্রিতদাসের সংকলনে ।

—ও বেহুলা !

—কিন্তু আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি কেউই পছন্দ করছে না ।

—না করুক গিয়া । আসলে উত্তরপূর্ব ভারতের আদিবাসীরা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে । অসমীয়া মণিপুরী এদের কিছু কিছু উজ্জ্বল ইতিহাস থাকলেও অন্যদের বলার মত কিছুই নেই প্রায় । আর রাজবাড়ি কেন্দ্রীক শিল্প সংস্কৃতিগুলি প্যালেস কম্পাউন্ডই পার হয়নি । তারপর উত্তরপূর্বাঞ্চলে উদ্বাস্তদের সাহিত্য । কিন্তু মুসকিল হল এদের ভাষা বাংলা । এই ভাষায় নোবেল পুরস্কারও মিলে গেছে । ফলে বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে যে মানের সাহিত্য হওয়া উচিত তার থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে আছি আমরা । এতদিন এখানে শুধু শিক্ষামূলক প্রভৃতি গল্পের আদলে গল্প লেখা হত । ব্যতিক্রমও আছে তবে খুব কম । ফলে কি হয়েছে—এখন যারা মূলস্রোতে মিশে যাওয়ার জন্যে মরিয়া এদের ভাষা ওরা বোঝে না ।

শালা কথায় কথায় কেবল লেকচার মারে, চাকরি যাওয়ার আগে এমন ছিলনা ! অনুপ কিছু সময় চুপচাপ হাটে । শাণিতের ঘোর কেটে গেছে কিনা দেখে, একসময় বলে—আমার একটা কবিতা শুনবি ?

—ছাপা না নুতন লেখা ?

—নূতন ।

—শোনা ।

সেই যে শাণিতের হাত চেপে ধরেছিল অনুপ, এখনও ছাড়েনি । আবার টেনে টেনে সুখময় সেনগুপ্তের বাড়ির সামনে যে ল্যাম্পপোষ্ট তার নিচে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে । শাণিত দেখছিল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির লাগোয়া একটা দরজার বাইরে দুদিকে দুইজন মিলিটারি দাঁড়িয়ে হয়েছে, দুই সঙ্গিনে আলো পড়ে চিক চিক করছিল, এখন ইমারজেন্সি !

শাণিতের হাত ছেড়ে দিয়েছে অনুপ, একটা ফুলস্কেপ কাগজের ভাঁজ খুলতে গিয়ে শব্দ হয় !
'ঘড়িপাখি'

অতি সংবেদনশীল রাডার আর মেধাবী কম্পিউটারের পাশে যারা ঘোরাফেরা করে
আমাকে দেখে—
অশ্বত্থের গুড়ি, এমন কি
পুরনো দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুড়ে শব্দ করি
একটি পান পাতাকে যোনী বা হৃদপিন্ড কী যে ভাবি !
এ নিয়ে হাসিঠাট্টা করে ঘড়িপাখি
দরজা বন্ধ করে, বিছানায় ফেরে !

কবিতা শেষ করেই একদিনের বাছুর যেন বেমক্কা দৌড় দিল অনুপ । আমি এতটুকু বলতে পারলাম না—তোর কবিতাটা ! একেক সময় ভীষণ রাগ হয়, মনে হয় ঠান্ডা ভাতের মাড় শরীরে ঢেলে চলে গেল শালার শালা । সান্ত্রী দুইটা পিতলা চোখে আমাকেই দেখছিল । আমি এবাউট টার্ন হতে বাধ্য । হাঁটছি আর অনুপের ওপর রাগ ছিটিয়ে দিচ্ছি—এতে অবশ্য একটি লাভ হচ্ছে এখন—ঘরের প্রতি টান বাড়ছে আমার । প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত এই নরকযন্ত্রণা, এরই মাঝে একজন ভিন্সেন্ট লাগারডো বা পন্থী দেববর্মার মত ভাল লোক আমাকে কিছুই দিতে পারে না । আর পারি না মা ! তোমার চোখের সামনে অন্তত মন কালা করে রাখতে পারিনা ।

রাস্তা শুনশান এখন । মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে গণরাজ চৌমুহনী ছাড়িয়ে ঐ দূরে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির চূড়া দেখা যায় । কেউ নেই কিচ্ছু নেই । দু'এক জায়গায় কয়টা ল্যাটাজির শুধু রাস্তা পার হয় । জ্বল জ্বল করে নিভে যায়, চিকচিক করে । কিন্তু যে কয়টা কুকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌমুহনীতে তাদের হাবভাব মোটেই ভাল লাগছে না । একটা ঘেউ ঘেউ করে উঠলে আর চার পাঁচটা তার পাশে এসে দাঁড়ায় । শাণিত অবশ্য আলো ছেড়ে ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে । রাগ যত কমে যাচ্ছে, তত মনে পড়ছে বাজার—মাছ না হয় নিলাম না, কিন্তু সব্জি তো দরকার ছিল । মায়ের সাদাপাতা, বাবার লেগজেটিভ কী যে করব ! দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে । এখন ইমারজেন্সি । পরিমলদার দোকানও বন্ধ— এখান থেকেই তো দেখতে পাচ্ছি ।

চট করে পাশ থেকে একটা ঢিল তুলে নিল, আধলা ইঁট মত হবে । তারপর হাঁটাচলার মধ্যে একটা হাত, নইলে নাড়ু করে করে এগোয়—এ্যাই দেখ কিচ্ছু নেই !

কিন্তু আমার হাতটিকেই এখন বংশদন্ডের মত মনে হচ্ছে নাতো ? যে কুত্তাটা ঘেউ ঘেউ করছিল—দুই কদম এগোল। বাকিরা দাঁড়িয়ে রইল ঠিকই তবে ছিঁড়ে খুবলে নেয়ার প্রাক্ মুহূর্তগুলি । একটু এদিক সেদিক হলেই আর রক্ষা নেই ।

এবার কুকুরগুলি সম্মিলিতভাবে এগোয় । অনেকটা বনবাদাড় মানে না নিঃশব্দ নেকড়ের

মত। এমন গাব্ভু গাব্ভু কুকুর দেখলে কানু সান্যালেরও পাখি উড়ে যাবে। আর ল্যাম্পপোষ্ট থেকে আলোর ফলগুলি যেন টপ টপ করে পড়ছিল আমার মাথায়। আস্তিকমুনি দাদু বাবা মা মহাদেব, মাগো কালী রক্ষা কর গো মা!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শাণিত! না আর এক পাও এগোতে দেয়া যায় না! জয় মা কালী! হাতের আধলা ইট ছুড়ে মারে, কেঁ কেঁ করে উঠল সারমেয় শাবকেরা। অথচ চিলড্রেন্স পার্ক থেকে পাওয়া শাণিতের ঠোঁটের কোণে সেই ব্যাথাটা আবার চিন চিন করে এখন সে এমনভাবে ছুটছে যে তার নিজেরই মনে হল বিদ্যুৎ ঝলকের মত। আমাদের গেইটে সব সময় হুক লাগানো থাকে কিন্তু কিভাবে যে খুলে গেল! আবারও থমকে দাঁড়াল শাণিত—খুলল যে গেইটটা যেন বিকট চিৎকার করে উঠল—মা! সে শান্ত হয়ে গেল। ঠান্ডা মাথায় গেইট বন্ধ করল। তারপর ভাবল—এই চিৎকার শুনে ঘরে কের লেগে গেছে নিশ্চয়ই— এখন ইমারজেন্সি!

নিজেদের এই পথটুকু পার হওয়ার সময় যেতে আসতে শাণিত কোন দিনই অন্য কথা ভাবে না কারণ বেরিয়ে এসে বা ঢুকে পড়ার আগে তো অনেক কিছুই ভাবে মাথা মুণ্ডু নেই, আব কেন? এবার অন্ততঃ ঘরে ফেরা যাক্। গেইট থেকে সোজা যে ঘরটা — সেটা সব সময় বন্ধ থাকে। মালিক সতীশ সাহা বাংলাদেশ থেকে এলে বাইরের আলোটাও জ্বলে। রাতের নিঃসঙ্গ অংশটুকু আলোকিত থাকে সব সময়। যদিও অভ্যাসের পথ আলোর চেয়ে কম পরিষ্কার নয়। বরং আলো থাকলেই অসুবিধা হয়। এক চোখের মালিক মনে হয় জেগে রয়েছে।

এবার উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে দুই ঘরের চিপাটা আরো অন্ধকার। স্বাভাবিক ভাবেই গতি শ্লথ হয়, সাপখোপও দেখে চলতে হয়। আস্তে আস্তে অন্ধকার থেকে গলা বের করে শাণিত, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পুছ থিনার মাখা আলো লেগে গেল তার মুখে, সে দেখল বহু পুরনো একটা রান্নাঘর, কত ভাড়াটে এর মধ্যে রান্না করল, খেল চলে গেল। এখন মা বাবা জুঁই তিনজনই এমনভাবে কান খাড়া করে রেখেছে, মা হরিণ বাবা হরিণ মেয়ে হরিণ। বুড়ো হরিণ কথাটি কোনদিন শুনেনি শাণিত—

— কিচ্ছু না, আমি।

জুঁইয়ের হাতেই একটা গ্রাস ছিল, একবার থেমে, আবার মুখে দিল। বাবা কাঁচালঙ্কা টেপাব মত করে বুড়ো আঙ্গুলে চেপে বসে রইল থালা, আবার চোয়াল নড়তে শুরু করল। মা বড় বাটি থেকে আরেক হাতা ডাল বাবাকে দিতে যাচ্ছে। শাণিত ঘরে ঢুকে পড়ার আগেই জুঁই চিৎকার করে বলল-দাদা, আজ কুমড়া পাতা দিয়ে সিঁদল বড়া। শাণিত ভাবল- উপরের পাতাটাকে যদি একটু বেসন দিয়ে ভাজা না হয় তাহলে তিতা তিতা লাগে। লুঙ্গি পরে নিয়ে জাঙ্গিয়া খুলতে গিযে একটুকরো লোল পড়ে গেল মাটিতে। মুহূর্তে মুছতে গিযেও কিন্তু মনে হল দুষ্টুটা রান্নাঘরে আছে। বাথরুমে গিয়ে শুধু পায়ের মধ্যে জল ঢালল একমগ, [illegible] করেই মুখে দিল না — ঠোঁটের কোণে সেই ব্যাথা! দৌড় দিয়ে এসে দুই হাতে কান ধরে উঠ বস শুরু করে দিল রান্না ঘরের সামনে।

— ওমা ওমা - একি বিভুতি আভুতি!

— ভুলে গেছি মা—

— কি?

— চাল ডাল তেল মশলা, জিরা মেথি ধন্যা, পান সুপারী সাদাপাতা চুন, আমার মা বাবা জুঁই—

— অইছে অইছে।

বাবাও দুইটা ঢেকুর তুলে আবার খাচ্ছে। শানু এক কোণায় কুচিমুচি করে বসা জুঁইয়ের পাশেই গিয়ে বসল ক্যাজাকেজ্জি করে। সে একটু আপত্তি করল — এটা কি মা? একেবারে গায়ের উপর কেন! কিন্তু কিছু করার নেই, এত ছোট পাকঘর। তাছাড়া বাবা এখনও সেই বাংলাদেশী পিঁড়িতে

বসে খায়। মায়ের সেবাটুকু পায় আগের মত। আস্ত ফুলকপি সিদ্ধ ঘি দিয়ে, মাছের মুড়ো, বাটি ভর্তি দই এসব আর কই পাওয়া যাবে। ফলে বাবার বুক থেকে মাংস কমে গেছে তবু কত বড় খাচা ছিল এখনও বুঝা যায়। আর একটা ধ্বংস স্তুপ যদি দেখতে চাও আমার মাকে এসে দেখে যাও সবাই। সারা মুখে এক টুপলা তেল-সিঁদুর আর গলার কণ্ঠি কত প্রকট হয়। আমার ছোট বেলায় মায়ের চুলা ফুঁ, চুঙ্গা, পাটা পুতার সঙ্গে থাকে যে সুপারী খোলের চাছনি—এগুলি খুবই টানতো আমাকে, আর দুই চোখের সঙ্গে এদের একটা আড়াআড়ি ছিল, ছুঁতে ধরতে গেলেই ছালি, ধুয়া, শুকনা লঙ্কা এসব লেগে যেত। এখনও আমাদের রান্না ঘরে একটা শিকা আছে। শিকা সম্বন্ধে যদিও মোহভঙ্গ হয়েছে সেই করিমগঞ্জ থেকেই, তখন নাড়ু গোপালের ক্যালেণ্ডার পাওয়া যেত খুব। পাতিল উল্টে ননী মাখন চোর, আমিও একদিন রান্নাঘরে বড় বড় পিড়ি যেভাবে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাঁশের খুটিতে, তাদের উপরেই পা রেখে শিকা ছিড়ে মাটিতে পড়ে যাই, পাতিল ভেঙ্গে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে পিঁয়াজ রসুনের লাল সাদা বাকল, শুকনা মাছের কাঁটা আর ছোট বোনটার জন্মের আগে নাকি সাদাপাতা খাওয়া বারণ ছিল মায়ের, তাই পাতা নেই শুধু শির দাঁড়া সহ কয়েকটা ডালপালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এখনও যত ছোট রান্না ঘরই হউক না কেন, জিরা মেথির শিশি থেকে শুরু করে ডেগ কড়াই থালা বাসন সবই ঝকঝকে তকতকে। তবে এ বাড়িতে যখন ভাড়াটে এলাম আমরা, মা রান্না ঘরের দেয়ালে যেসব মশলার দাগ লেগেছিল তা পরিষ্কার করতে চাইল না নিজের হাত দিয়ে, আমাকে বলল— তুই আমার চুনের পাতিল থেকে টুকরো বাঁশে করে চুন এনে লাগিয়ে দে এই জায়গাটায়। আমি কিছু বুঝলাম না। তাছাড়া ভেন্টিলেটারের কাছেও যত কালো কালো ঝুল, কত যে ভড়াটেদের রান্না হয়েছে— মা সেগুলিও পরিষ্কার করল না, শুধু বলল—ছোট ঘরতো, এক টুকরো কাপড় টাঙ্গিয়ে দে উপরে। এরকম হলে আমি অনেক সময়ই মাকে বুঝতে পারি না। উপরে যে বাল্বটা জ্বলছে সেটাও কালি মাখা—কম আলো দেয়। বাবা যে খাচ্ছে এখন চোয়াল দুইটা অশনি সংকেতের মত তেল চিক চিক করছে। মা প্রায় জুঁইয়ের মাথার উপর দিয়েই হাতা নিয়ে বাবার পাতে ভাত দিল আরেকবার, বাবার মুখে একটা গ গ আওয়াজ হল। আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই বলে — বাবার খাওয়া খুব সুন্দর, আমিও মানি কথাটা কিন্তু এখন আমার ভাল লাগছে না কারণ বাবা ঝর ঝরা সাদা ভাত একগ্রাস মত টেনে টেনে আনে, পাতে লবণের অভ্যাস নেই। কিন্তু সিঁদল বড়াটাকেও একই জায়গায় রেখে একটু একটু করে ছিড়ে আনছে দেখে আমার রাগ হল - ভিতরের মশলাটা কি থালে লেগে যাচ্ছে না কিছু কিছু। আমি নুন মেখে বাবার মতই সাদা ভাত মুখে দিচ্ছি তবে বড়াটাকে প্রতিবারই দাঁতে কেটে নিচ্ছি একটু একটু করে, ষোল আনা লাগে আমার। জুঁইয়ের খাওয়াটাও লোভনীয়, অন্তত বাবার চেয়ে বেশী স্বাদ লাগবে আমি সিওর, সে বড়াটাকে ভেঙে এক টুকরো ভাতের সঙ্গে মেখে নেয়, একছিটা লবণ দিয়ে মেখে লাড্ডু লাড্ডু করে মুখে পুরে দেয়—আমার মনে হয় তার সারা মুখে সমস্ত শরীর দিয়ে উপভোগ করছে জুঁই। যা! লাইটটা এবার চলে গেল, এমন সময় রোজই অবশ্য একবার যায়। আমাদের যার যার ভঙ্গি ঠিক রেখে মনে হয় আমিই শুধু মুখের গ্রাস ফিরিয়ে এনেছি থালে। জুঁইয়ের পাতে কয়টা লাড্ডু আছে পরে দেখা যাবে।

চুলার কিনারে দেশলাই খুঁজছিল মা — আমি মানা করলাম — চুপ করে বসে থাক, এক্ষুণি আলো এসে যাবে।

—দেখিস তো, পেন্সনের টাকা জমা পড়েছে কিনা ব্যাঙ্কে? প্রায় চারপাঁচ মাস গেল গিয়ে! দুই আড়াই হাজার হবে সর্বমোট। তোর মাকে কয়টা চীনা হাঁসের বাইচ্চা কিন্যা দিছ।

— না আমার লাগতো না। ডুবা নাই, পুকুর নাই। করিমগঞ্জের ভাড়া বাড়িতেও যা সম্ভব ছিল। শানু তোর ছোট সময় একবার যে আমরা দেশের বাড়িতে গেছলাম — মনে আছেনি? বার বাড়ির দিঘি, ভিতর বাড়ির পুকুর, ডুবাখানা কয়টা আছিল জানছনি - পাঁচটা। তোর অবশ্য মনে থাকার কথা না। তারচে আমি বরং গামছা বানাইমু পুরনো শাড়ির পাড় থাইক্যা সূতা

ছাড়াইয়া একরকমের গামছা বানাইতে পারি আমি — শুধু তিন চাঁইর টুকরা চাছা বাঁশ লাগব আর কিছু না। বুড়া তো বইয়া শুইয়া মরতাছে কেবল। তারচে আস্তে আস্তে হাঁইট্যা আড়তদারের কাছে বেইচ্যা আইলে কামের কাম অইব।

— মা একটা কতা কইবায়নি?

— কিতা কছ্না।

— না কও কইবায়নি, আমার মাথা ছুঁইয়া কও। মা চুপচাপ বসে থাকে। শাণিত বাঁ হাত দিয়ে মায়ের একটা হাত হাতড়ায়, পায়ও। মা'ই সরিয়ে নেয় ঝট্ করে কারণ ওটা আইটা হাত। তার বাঁ হাতটা নিরুপদ্রবে আমার মাথা ছুঁয়ে ফেলে, আমি জানি মা বহুদূর থেকেও গন্ধ পায়।

—মা, তোমার কি একটাই বিয়ের আলাপ এসেছিল? নাকি আরো ছিল?

— বুচ্ছি বুচ্ছি! বিটলামি আরম্ভ অই গেছে গিয়া, বাত্তি জ্বালাও।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুরা বোর্ডের আলো জ্বলে উঠল। এখন আরো বেশী পাওয়ার। প্রথমেই চিৎকার করে উঠল জুঁই — আমার ডিম নাই, দাদা চুরি কইরা খাইলাইছে গো মা!

— তোরা কিতা আরম্ভ করলে!

শানু আড় চোখে দেখতে গেলে আরো বিপত্তি হল, আবারও চিৎকার করে উঠল— এবার বাজে কথা বলবে মা গো! জুঁইটা খেতে বসলেই সে হাগু পাদুর কথা বলতে শুরু করে আর ফড়িং তিড়িং তিড়িং লাফায়।

— দাদা, লম্বা চওড়া কে জানি একজন ঢুকল রে আমরার ঘরে!

শাণিতও পেছন দিকটা দেখল—এত রাতে কে? কিছু সময় বসুক! ধুয়া ওড়া গরম ভাত আর কুমড়াপাতার সিদল বড়া হলে মাংস পোলাও ছুবে না শাণিত। শেষ মেষ থাল থেকে টেনে টেনে বুড়ো আঙ্গুলে সিঁদল ভাতের ক্ষীর খায়। তারপর বড় গ্লাসে এক গ্লাস জল নিঃশেষ করে কলতলায় ছুটে যায়। তার আগেই জুঁই পৌঁছে গেছে।

— মা দাদা ভাল করে কুলকুচি করছে না। সিঁদল বড়ার স্বাদ নাকি চলে যাবে?

— দূর হ অসভ্যটি!

পরনের লুঙ্গি দিয়েই মুখ মুছতে মুছতে সে কুঁজো হয়ে ঢুকছিল ঘরে। তা নাহলে নিচে জাঙ্গিয়া পর্যন্ত নেই! এই এক আরাম! যখন সদ্য শুকনো গরম গরম থাকে তখন পরে নিলে কত সুখ হয়! আবার বাড়ি ফিরে একটান মেরে খুলে ফেল্লে—আরো ভাল লাগে। আসলে উলঙ্গ থাকার সুখ পোষাক আসাকের চেয়ে বেশি। কিন্তু মানুষ অনেক কিছুই ভোগ করতে পারে না।

একদিন মা বাবা ওরা শাণিতকে ঘুমে রেখেই, সকালের খাবার টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে, দরজা ভেজিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গিয়েছিল। গুরুদেবের জন্মতিথি।

ওরা চলে গেলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই সিদ্ধান্ত নিল সে। এমনিতেও সারাদিন কিছু করার থাকে না তার। আজ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দিন কাটাব। তার পরও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল তবে মনে মনে একেবারে লেংটা। পুরুষ মানুষের শরীরে কয়টা পয়েন্ট তাকে খুব ভাবায়। গলা থেকে ঘাড় কাঁধ ও বাহুর সন্ধিস্থলে মাংসপিন্ডগুলি, কনুইয়ের উল্টো দিকটা চ্যাপ্টা, কোমর থেকে পায়ের মাসলগুলি যেখান থেকে গাছের শিকড় গজায়?

সেদিন গায়ে গেঞ্জি ছিল না তার। তারপর দুই পায়ে কসরৎ করে পরনের লুঙ্গি খুলে ফেলে শুয়ে শুয়েই। সে গুণ গুণ করে। ঘুম ঘুম চোখ, জানে তাকালেই এখন যে আলো দেখা যাবে তাতেগুলে রয়েছে ঘড়ি। অন্তত প্রাতকৃত্য সেরে ফেলা যায় না ঘরে। সে উঠে দাঁড়ায়। এখন উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, তার চুলের ছাট, হাত পায়ের নখগুলি সবই পরিমার্জিত। এমনকি লিঙ্গমূলে চুলগুচ্ছ তাতেও তেল সাবান পড়ে, আলো পড়ে চিকচিক করে। শরীরে বুনো গন্ধ নেই, চুলে শ্মশ্রুতে জটা নেই, গরুর ঘা-কুঁজোতে ক্ষুদে পোকা নেই, পিচুটি প্রবাল নেই চোখে। সেই সঙ্গে আবার একটা চারমিনার সিগারেট ধরালে প্রকৃত পুরুষের মৃত্যু হয়ে যায়। ঘরটাকে মনে

হয় কংক্রিটের সুরঙ্গ।

একদিন এখানেও গুহাজল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জীবনের আস্তরণ ছিল সবুজ শ্যাওলা। এক আঁজলা জল সব সময় জমে থাকত এক কোণায়, মাঝে মাঝে চোখে মুখে ঝাপটা, কনুই দুইটাকে এককোশ এককোশ করে ধুঁয়ে দিতাম, পা না ডুবিয়ে শুধু সুকতলায় তরল প্রকৃতি ছুঁয়ে দেখতাম কেমন লাগে এবং আমার কান দুইটা তখন পাতাবাহার গাছের মতই হিল হিল করে উঠত।

এখন সবই খড়খড়ে। এমনকি শ্যাওলার নিচে শুধু যে বালু থাকে জানা গেল। চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে গেল একটি রিফিউজি যুবক। এবং তার অনেকগুলি পুষ্যি। ফলে যৌনাঙ্গ ছুঁয়ে সেদিন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু কাঁদছিল। নিজেকে বড়ই অসম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল তার।

এখনও সে নিচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জুঁই এসে উপরেরটায় দাঁড়াল। ঘরের আলো বাইরে পড়লে যেন কার্পেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা।

—তুই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁত খুচাছ, আর সেই লোকটা কতসময় ধইরা, চিন্তা কর— সঙ্গে সঙ্গে শানিতের হাত থাইক্যা খইরকা পইড়া গেল গিয়া। ইয়া লম্বা লম্বা ঠ্যাং বাড়াইয়া, একসিঁড়ি ডিঙাইয়া ঢুইক্যা গেল ঘরে।

বাবা বিছানায় বসে, তখনও চটির মধ্যে অর্দ্ধেকটা পা। দুইহাতে কিনার ধরে রেখেছে শক্ত করে ৷ গেঞ্জি হাতলের নিচে রগগুলি খুব স্পষ্ট। মেরুদন্ড সোজা তবু, দুইটা চোখ চটিতে। আজকাল যদিও বসে বসে ঝিমায় না— ডাক্তার মানা করেছে, যে কোন পতনই নাকি বাবার পক্ষে খারাপ হবে। আমরা জানি খাওয়া দাওয়ার পরে শুধু ঢেকুর তোলার জন্যে হা পিত্তিস করে বসে থাকে বাবা। কাজ হয়ে গেলে—দয়াল দীনবন্ধু, শুয়ে পড়ে।

শাণিত আরেকটু এগিয়ে যায়। তার টেবিল চেয়ারের পিছে পর্দার পাটিশন সরিয়ে দেখল— সিগারেট খাচ্ছে না তো লোকটা! আমারই খাতার পেছনে আঙ্গুল চালিয়ে গোল গোল করছে। আবার থেমে গেল। শীতের সাপ রাস্তা পার হলেও যেন শব্দ পায় সে। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায়। যেন আগে থেকেই হাত জোড় করা ছিল। মুখে বলল— নমস্কার। আমার নাম পঙ্কজ তলাপাত্র। আজ রাতটুকু শুধুমাত্র থাকতে দিন। কাল ভোরের আগেই চলে যাব। বাইরে পুলিশ। আমাকে হাতে পেলে আর কোর্ট কাছারি নয়, একদম মেরে ফেলবে।

— আমাদের বাড়িতে একটা তক্ষক আছে।

—হ, শুনতে পাচ্ছি তো।

শাণিত সাবধান হবার আগেই বাবা সূতা ধরল- কে? তুমি কেরে বা?

— পঙ্কজ তলাপাত্র, গণচিত্রকর।

—ইটা আবার কিতা?

— আমি ছবি আঁকি। আপনাদের সময় চারণকবি ছিলেন না মেসো —অনেকটা সেরকমই। ঘুরে ঘুরে দেয়ালে দেয়ালে ছবি —

— দেখরে বাবা, আমরা বড় ঝামেলায় আছি, আমাদের একমাত্র ছেলের চাকরি খাইলাইছে ইমারজেন্সি। আর নুতন ঝামেলা পাকাইওনা—তুমি যাও গিয়া—

— দাঁড়াওতে, তোমার গ গ আওয়াজ বাইরে শুনা যায়। পঙ্কজ বাড়ি কই তোমার? মা আছেন নি?

— আমি আমতলী থাকি মাসিমা। মা নাই।

— কি দোষ করছ বাবা?

— তুমিও চুপ কর মা, উনিতো কাল ভোরেই চলে যাবেন।

— আইচ্ছা রে বাবা। তোমরা যা ভাল বোঝ! পঙ্কজ তুমি খাইয়া আইছনি?

— হ মাসিমা। কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। মিনিট খানেক আর সাড়াশব্দ নেই। তারপর মায়ের

বিছানায় ওঠার শব্দ মট মট করে। আরেকটা বালিশ নিয়ে এল জুঁই।

— এ্যাই, দুই কাপ চা খাওয়াবি?

— এখন আবার কি? রাত বারোটা বাজে!

পঙ্কজও না না করে উঠল — আমি চা খাই না। আমার মনে হল এই প্রথম জুঁই পঙ্কজকে দেখছে ভাল করে — তার চোখে মুখে।

পঙ্কজ বয়সে আমার চেয়ে বড়ই হবে। মাঝে মাঝে দু'এক গাছা পাকা চুল দাড়ি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গোঁফটা কেচি ছাটা। সাধারণত এখান থেকে শুরু হয় না চুল, বেশকিছু উপরে উঠে গেছে কপাল। হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরনে। গায়ের রঙ পরিষ্কার। লোকটা মোটা না হলেও ফোলা ফোলা। আর অসভ্যগুলি সবসময়ই শান্তিনিকেতনি ঝোলা রাখে। এখন ইমারজেন্সি। লম্বাচুল, গোঁফদাড়ি বই ব্যাগ ইত্যাদি দেখলেই তো সন্দেহ করবে পুলিশ।

এতক্ষণ সে পঙ্কজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। এখন একটু সরে এসে টেবিলের ড্রয়ার টান দিল, তালাচাবি তুলে নিল, বেরিয়ে গেল কোন কথা না বলে।

ঘরে আলো জ্বলছে। শুয়ে পড়েছে সবাই। শুধু রাস্তার কুকুরগুলির ঘুম নাই বিরাম নেই চিৎকারে, ইমারজেন্সির হাতেও একলব্যের মত ধনুর্বান নাই। কিন্তু পুলিশি বুটজুতা শব্দ থেকে থেকে সচকিত করে।

শাণিত ফিরে এসে চাবিটা টাঙিয়ে রাখল ক্যালেণ্ডারের হুকে। তারপর বিছানা টান টান করল। পঙ্কজের নামে বালিশ রাখল বাঁদিকে কিনারে। আলনা থেকে লেপের ওয়ার তুলে বিছানায গড়গড় করে একটা কোলবালিশ রেখে দিল মাঝখানে লম্বালম্বি। তারপর বাবার ধুতি এনে দিল —পরে ফেলুন। দরজার কপাট থেকে টান মেরে গামছা দিল—চলুন আমার সাথে। কলতলার আলো জ্বালিয়ে ঘরেরটা অফ করে দেয়ার সময়ই স্বস্তি বোধ করল—আমি জানিতো জুঁই এখনও জেগে রয়েছে।

পঙ্কজ তার গা থেকে শার্ট খুলে ফেলেছে। খালি গেঞ্জি গা। তার উপর ধুতিটা পেঁচিয়েছে লুঙ্গির মত। এবার শাণিতের সংকেত ফলো করে কলতলার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। একঝলক মনে হল তার মুখটা থমথম করছে।

কিন্তু আমি যে কি মুসকিলে পড়েছি!

কাল সকালে যদি পুলিশ আসে? আজওতো আসতে পারে! ভদ্রলোক কলতলা থেকে ফিরছেন দেখে শাণিত বলল—পঙ্কজদা, গামছাটা দরজায় রেখে চলে আসুন, বারান্দায় একটু বসি, আজ হাওয়া আছে।

আকাশে অসংখ্য তারা অথচ আমরা অন্ধকারে আছি। কলতলার আলো এই একটুমাত্র দেখতে পাচ্ছি। পঙ্কজদা গামছা রাখতে গিয়ে দেরী করছে মানে হল ঘরে আরো অন্ধকার, রীতিমত টেনশন হচ্ছে আমার, ওকে ডাক দিতে যাব এমন সময় বেরিয়ে এল। মনে হল শার্ট বা পেন্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই খুঁজে পেতে যত দেরী হচ্ছিল। ঝোলা ব্যাগে রাখলেই হত। তার মানে এই মুহূর্তে ঝোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলাম। যাইহউক ছেলেবেলা থেকেই আমি বিরক্তি প্রশমিত করি বিনয়ের সঙ্গে।

—পঙ্কজদা, একগ্লাস জল দেব? পানও খাওয়াতে পারি, মা খায়—

— না থাক। শাণিত আমি তোমাকে চিনি। তোমার গল্পের পাঠক। ভাল লাগে। লোকটা যেন কদমগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বাঁশি বাজানোর মত করে বসে পড়েছে। এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই হাতে ধরে রেখেছে। নিচে রেখে দিচ্ছে না কেন? লোকটাকে কি আমি কোথাও দেখেছি? মনে হয় না। তার গায়ের রঙ পরিষ্কার হওয়ায় আলোতে লক্ষ্য করেছি শিরা উপশিরাগুলি নীলাভ। ইনিও কি কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের মানুষ? হয়ত না। কারণ ওদের মধ্যে এমন একটা কাঠিন্য থাকে! তখন মায়ের কাছে লোকটা গণচিত্রকর বলে পরিচয় দিয়েছিল। গণসঙ্গীত শিল্পী

শুনেছি কিন্তু গণচিত্রকর শুনিনি। তাছাড়া যারা গণগণ করে সবসময় তারা কঠিন কোন দল নিশ্চয়ই করে না। এই বামপন্থী লোকগুলোকে নিয়ে মুসকিল হয়েছে। যদিও আমার আদর্শ ওদের সঙ্গে কিছুটা মিলে। কিন্তু আমি যখন বছরের একটা সময় মাইগ্রেটরি পাখি আসতে দেখি ত্রিপুরায় তখন কেমন লাগে! মনের সঙ্গে জলের সঙ্গে মুক্ত বিহঙ্গ। আবার ননীদার মতে পাখিগুলো হল মুক্তির দূত। ওরা কোথা থেকে আসছে— জানা আছে কিছু? সে-ই সা-ই-বে-রি-য়া থেকে।

— তুমি কি একজন কমিউনিষ্ট বিরোধী ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া কিছু কিছু প্রশ্নের কোন জবাব হয় না। যেমন শাণিত কমিউনিজমের পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়। তাহলে তো বলতে হয় — আমি কমিউনিষ্ট নই। এই কাটু কাটু উক্তির মধ্যে কি প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা আছে? তাই নিরূপায়ভাবে এখন চুপ করে থাকে। কলেজ জীবনে আমি উদাত্ত লোকেশকে দেখেছি — ওরা নকশাল করে। চাকরিতে ঢুকে ননীদা ওদেরে পেলাম। কিন্তু এই লোকটা কে? ওর ঝোলার মধ্যে কি পিস্তল আছে ? তখন কলতলা থেকে ফিরে অন্ধকারে এত দেরী করছিল কেন পঙ্কজ? এখনও ধুতির প্যাঁচে লুকিয়ে রেখেছে নাকি মালটা? তা নাহলে অপরিচিত জায়গায় এত সাহস পায় কি করে ?

পঙ্কজ এবার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নামিয়ে রাখতে না রাখতেই সে ছোঁ মেরে তুলে নিল। বড্ড খচমচ করে, রাংতা ছেঁড়ার শব্দ হচ্ছিল অস্বাভাবিক। ফস করে জ্বলে উঠল আগুন। মনে হল শাণিত্যা নিজেই এবার পুড়ছে। তবু আলোর মধ্যে পঙ্কজের মুখচ্ছবি পাওয়া গেল না, কারণ ধুঁয়া। তারপর দেশলাই কাঠিটাও নিবে গেল। দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

— আমি কখনও কারো পক্ষে রাজনীতি করিনি পঙ্কজদা। বিরোধিতাই বা করব কেন?

পঙ্কজ হো হো করে হেসে উঠল—তুমি শত্রুতা করলেও আমাদের কিছু যায় আসে না। শোনো সেনগুপ্তবাবু, আমরা হচ্ছি গিয়ে অর্গেনাইজড ফোর্স। আবার হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই সরিয়ে নেয়।

ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক ছাড়া প্রতিদিন এভাবে কত পাঁঠা বলি হয়!

— তুমি ক্ষমতাসীনদের কথা কিছুই লিখ না ?

ওরে শালা ! এবার বুঝেছি কি রাজনীতি কর তুমি সোনার চান্দু !

— আমি পলিটিক্স করি না পঙ্কজদা। তাছাড়া শাসকদলগুলি কবেই তো পচে গেছে। ওদের স্বাধীনতা সংগ্রাম গোছের জারিজুরি আর কোন কাজ করেনা।তবুও শাসন ক্ষমতায় অনেকদিন টিঁকে থাকা যায়।

— মানলাম। কিন্তু পরিবর্তনের চিন্তাও তো করতে হবে!

কি কবে হবে দাদা — বিকল্প শক্তি নাই যে! কেবল জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করে যারা এক ছাতার নিচে জড়ো হয়েছে — ওরা কারা ? একদল থেকে আরেকদলকে আলাদা করে যায় কিভাবে? শুধু কিস্‌সা কুরশিকা লিখলেই হবে ? কে প্রকৃত গণতন্ত্রী ?

—কিন্তু শত্রুপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ তো নিতেই হবে ভাই !

— ভাল কথা, ভারতীয় বামপন্থীদের গণতন্ত্রীকরণ আমার খারাপ লাগে না। ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল কবাই তো উত্তম। আমাদের সংবিধানটিও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। তাছাড়া তোমার মনে যদি আরো ভাল কিছু থাকে — সংশোধন করে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যাবে! তা না করে সর্বহারাদের ক্ষমতা দখলের লড়াই ফড়াই—এসবের কি মানে থাকতে পারে? কেন ক্ষমতাভোগীদের হাতে আরো বেশি অস্ত্র তুলে দেয়া? সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হলে ভোটের বাক্সে বিরোধীদের বেশী লাভ হবে মনে হয় কেন ? বামপন্থীরা যদি মৌলিক অধিকার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলেই ক্ষান্ত হত তাহলে আখেরে লাভ হত তাদেরই। অসহিষ্ণুতার মত শোষণওযে একটি কুপ্রবৃত্তি- এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে তোলা উচিত। আত্মশুদ্ধির

পথ খুঁজে পাওয়ার অর্থ কি আধ্যাত্মবাদী হয়ে যাওয়া ?

যাই হউক একদল লোককে শোষক, আরেকদলকে শোষিত আখ্যা দিয়ে—বিষয়বস্তুটির ষোলআনা ব্যাখ্যা না করে বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, যত অর্দ্ধসত্য ম্যাজিক দেখিয়ে রাজনীতি করার সুবিধাবাদ আর চলবে না দাদা ! তার চেয়ে যারা বিশ্বাস করে — মানুষ মেরে কেটেই একদিন ক্ষমতা সর্বহারাদের হাতে তুলে দেয়া যাবে — ওরা ভুল স্বর্গে বাস করলেও নরকবাসীতো নয় !

পঙ্কজ হাততালি দিতে থাকে রাতজাগা পাখির মত কর্কশ। আর থামে না। কোন কথাও বলে না —

এরকম সময় ভীষণ অস্বস্তি হয় । মনে হয় আমি তো মুচ্ মুচ্ শব্দ করে ঘাস খাচ্ছি, গলায় জবাফুলের মালা, কপালে সিঁদুর আর যেকোন মুহূর্তে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে খাড়া।

—যাত্রাপালা ভালই তো কর। সঙ্গে যদি প্রকৃত পড়াশুনা থাকত ! শুনো শাণিত —

হউক না রাতের পাখি কর্কশ ! ভ্যাম্পায়ার বাদুড় বা প্যাঁচা। তবুও তো একটি পাখি এসে বসেছিল আমাদের কাপড় টাঙানি তারে! এবার পঙ্কজের কথা শুনে উড়ে গেল। তার প্রতিটি ডানা ঝাপটানি টের পাচ্ছি আমি বুকের ভেতর। আকাশে এত তারা অথচ এতটুকু আলো নেই।

— এই যে সেনগুপ্তবাবু, তুমি যা খুশি করতে পার। ক্ষমতাভোগীদের পক্ষ নিতে পারো। সংশোধনবদীদের দলে ভিড়ে যেতে পারো । অতিবাম করতে পার বা একজন প্রতিক্রিয়াশীল হলেই বা আমাদের কি যায় আসে ? শাণিত ভাবে—এই প্রতিক্রিয়াশীল কথাটিকে আমি একদমই হজম করতে পারি না । ইদানিং তাদের অভিধানে আরো কিছু শব্দ সংযোযিত হয়েছে যেমন, 'অপসংস্কৃতি' ।

—গল্পে তুমি যে চরিত্রগুলি আঁকো—ওদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দল করেন এমন কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে কেন ? কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ধাম পর্যন্ত ? শোন শাণিত সেনগুপ্ত আমরা তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি । তোমার 'বড়গাছ' গল্পটিও পড়লাম । তুমি নাম বদল করে কমরেড সুশান্ত দত্তের নামে যে যে কেচ্ছা গেয়েছ—কাজটা ভাল করোনি ।

—পঙ্কজদা, সুশান্ত দত্ত লোকটা সত্যি দুশ্চরিত্র আপনি বিশ্বাস,—ঠাস করে, থাপ্পড়টা প্রথমে বুঝতেই পারল না শাণিত । একটা সিগারেট নিতে পঙ্কজের দিকে ঝুঁকেছিল । আরো ঝুঁকে পড়ে নাকে মুখে ছুঁয়ে ফেল্ল বারান্দা। কনুই ভরসা । আবার ফিরে এসে ঠেস দিয়ে বসল । জলে ডুবতে ডুবতে ভেসে ওঠা আর কী !

—তুমি কি জান কমরেড সুশান্ত ত্রিপুরার পাহাড়ে কত সংগ্রামের সঙ্গী ? আর কিছু না হউক লোকটা কতবার জেল খেটেছে তুমি জান নাকি ?

শাণিত এবার দেখল আকাশের তারা আরো উপরে উঠে গেছে । পঙ্কজের হাত পা মোটা মোটা । তার চোখে চোখ রাখতে পারছি না কিছুতেই। বাবা একবার কাশি দিলে সে দুইবার উত্তর করতে গেল । একদলা কফ এসে ভরে গেল মুখটা । তবু মাথাটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে রেখেই থুক করে ছুঁড়ে দিল । এ বাড়ির উঠোনে কোন ঘাস নেই । ফলে পাতলা পাতলা হাটা চলা করলেও শব্দ হয় ।

পঙ্কজ এবার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিলে সে শান্তভাবেই নেয় । কয়টা কাঠি বেশি জ্বালায় যদিও, ধরিয়ে ফেলে । একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎই যেন ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে, বলে—উঠে পড়ুন পঙ্কজদা ! ভোরের আগেই তো চলে যেতে হবে আপনাকে। আসুন, পেচ্ছাপ সেরে ঘরে ঢুকে যাই ।

কলতলায় মাত্র পনেরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে । তার পাশেই মানকচু তলায় ঘুট ঘুইট্যা অন্ধকার । সকাল হলে দেখা যাবে মা আংরা আর ছাই ফেলে ফেলে কচুগাছটার গুঁড়ি আরো মোটা করে ফেলেছে । বাড়িতে ছোট মাছ এলে এখান থেকেই আবার ছাই নিয়ে মাছ কাটা হয় ।

লাউগাছে পোকার আক্রমণ হলেও ছাইগাদা থেকেই বিষ ছিটায় মা।

এখন শাণিতের মগজটা গবেষণার বিষয়। একটু আগে সে একটা চড় খেল। ছেলেটার কি কোন মান আপমান জ্ঞান নেই ? আজ সন্ধ্যা থেকেই দুরমুজ খাচ্ছে বার বার অথচ এখন আবার শি-কাটাকাটি খেলতে শুরু করেছে। যার সঙ্গে, সে এসবের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছে না। তাছাড়া বয়স কত হল তার ? ফাঁপা ছাইয়ের টিবি, শি পড়ে পড়ে শব্দ, কিছু উড়ছেও বোধ হয় অন্ধকারে।

লকলকে ছাই উড়ার দৃশ্য ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে আসে। আলো জ্বালবার আগে সে শুনল পঙ্কজের পা থেকে হাওয়াই চপ্পল ছুড়ে ফেলার শব্দ। সুইচবোর্ড অনুমান করে টিপ দিল। দেখল মশারি টাঙানো হয়ে গেছে। টেবিলে একগ্লাস জল ঢেকে রাখা হয়েছে পুরনো পোষ্টকার্ড দিয়ে। এ দুটো কাজ যিনি চুপি চুপি সেরে গেলেন তিনি কি আমার শত্রু ? মিত্র তো নিশ্চয়ই নয় কারণ প্রয়োজনের বেশি ভালবাসা বিষ লাগে। তাছাড়া এত এত পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। এবং এমনও তো হতে পারে —এইসব আমার জন্যে নয়—পঙ্কজের ! তাহলে আমার ভিষণ ঈর্ষা হবে গো মা ! জুঁই তুই বিশ্বাস কর !

তখনও পঙ্কজকে বিছানায় বসে থাকতে দেখে আমি মশারিটাকে চুপি তুলে জলের গ্লাসটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। সে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে কোন রকমে আমার হাতে দিয়েই শুয়ে পড়ল। —আমি কি তোর বউরে শুয়োরের বাচ্চা ! ছোটবেলায় আমাদের মেয়ে বন্ধু কম ছিল। আমরা যৌনতার পাঠ নিয়েছিলাম এভাবে—অঞ্জন আমাকে বলল—তুই ঐ ঘরে যা, আমি এখানে বিছানায় বসে থাকব, তারপর ফিরে এসে হুদ্দা হাত বাড়িয়ে বলবি—চা ধরো !

শাণিত হাতের গ্লাসটা টেবিলে রাখল। করিমগঞ্জ থেকে লেখা বড়পিসির পোষ্টকার্ডে জল লেগে গেল কয়েক ফোঁটা। সে লুঙ্গিতে মুছে নিল। বড়পিসি নাকি একদিন আমার মাকে মুখপোড়া বানর বলেছিল। মার সেই দুঃখ আজও যায়নি।

এবার শাণিত ঢুকতে গেল ভেতরে। এখানেও মজা আছে। মশারি কতটা ফাঁক করলে ভেতরে ঢোকা যায় আবার মশা ঢুকবে না এই অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে দীর্ঘদিনে। বালিশগুলি ঠিকঠাকই ছিল তবু সে এদিক ওদিক একটু নাড়াচাড়া করে দেখল। মশারির ভেতর থেকেই আঙুলের খোঁচা দিয়ে অফ্ করে দিল সুইচ। আলো নিবে গেলেও সাধারণত বালিশেই এসে মাথা ঠেকে। আজ বার বার হাত দিয়ে অনুমান ঠিকঠাক্ করতে হচ্ছে ? কি এক দুশ্চিন্তা নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা রাখল সে।

ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকে যাবতীয় অন্ধকার এখন মশারির ভেতর জমছে। কুয়াশা ঘেরা একখন্ড ভূমি। একটা দ্বীপ। তার মধ্যে ছোট্ট ভেলায় আমি মরা, আর একটা সাপ, আমরা কোথায় ভেসে চলেছি ? একেক সময় নিজেকে প্রস্তর যুগীয় কোন প্রাণী মনে হয়—লাষ্ট স্পেসিস্। আর বহুদূর থেকে মালবাহী জাহাজ বা কুমীরও হতে পারে এখন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে যেন। পেছনে বিস্তীর্ণ বালুচর, চোরাবালি, যত গর্ভবতী কচ্ছপের হিংস্রতা।

তাই শাণিত এক টুকরা ঝিনুক এখন চুপচাপ পড়ে রয়েছে বালুচরে। নট্ নড়ন চড়ন নাথিং। এমনকি চোখ দুটিতে পলক পর্যন্ত পড়ে না। না — আমি প্রতিবাদ করবই। এতদিনেও কেন মাথা গোঁজার ঠাঁই হল না আমাদের ? আগামীতে বাঙ্গালী জাতিকে দুইভাগে ভাগ করা হবে—একদল স্থায়ী বাসিন্দা থাকেন বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গে। আরেক দল যাযাবর—যেখানেই যায় খেদা খায়। কেউ কেউ বলেন—আপনারা পশ্চিমবঙ্গে চলে যান না কেন—ওটা তো ভারতবর্ষের মধ্যেই বাঙ্গালীদের বাসস্থান।

কিন্তু কি করে যাব ? কেন যাব ? আমরা কি পশ্চিমা ব্যবসায়ী যে রোজগার করতে এসেছি এখানে ? একদিন নিজের জায়গায় ফিরে যাব !

শাণিত পাশ ফিরে শোয়। এমন সময় টিনের চাল আর ছাতের মাঝখানে একটা হুড়হুড়ি

শব্দ হয় । পরিচিত শব্দ। পাশের বাড়ির সাদা বেড়াল রোজই জালালী কবুতর খেতে আসে । তারও অধিকার বোধ এবং বাস্তবজ্ঞান নিয়ে ভাবে শাণিত । এদের কারফিউ ইমারজেন্সি নেই । কবুতরগুলি আমার ঘরে জন্মালেও বিড়ালেরই অধিকার বেশি । একে চুরি বলা যাবে না । ডাকাত পড়েছে বলতে হবে। ক্রমাগত ডানা ঝাপটানি আর চিঁ চিঁ শব্দ । দুই হাতে কান বন্ধ করলেও কিন্তু শব্দ বন্ধ হয় না । শেষমেষ নিজেরই নাভি খামচে ধরল সে । আর কোথা থেকে একটা জোনাকি ঢুকে পড়েছে ঘরে । বুদবুদের মত একটাই শব্দ মনে হচ্ছে এখন আমিত্ব । তার আগে পিছে আর কিছু মনে পড়ছে না । শব্দটি ব্যঙ্গার্থেই মনে হল নাকি তুচ্ছার্থে —বুঝতে পারলাম না । তাছাড়া জোনাকিটা উড়ে এসে শরীরে পড়লে আবার অস্বস্তি হচ্ছে আমার । ঘামের ঘন্ধ, বেঁচে থাকার শব্দ সবই যেন ঘৃণার বস্তু ।

হঠাৎ পঙ্কজের একহাত আশ্বাস এসে পড়ল শাণিতের বুক ও পেটের ঠিক মাঝখানে । আরেকটি বেলুন ফেটে গেলেও কিন্তু সে মটকা মেরে পড়ে রইল—নো ডানা ঝাপটানি । অসভ্যগুলির সঙ্গে আবার কি কথাবার্তা ! পঙ্কজটা যে এতক্ষণ কনুইয়ে ভর রেখে সারসের মত গলা বাড়িয়ে রাখবে কে জানতো ? এই অন্ধকারেও অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ না করেই ঠোটের উপর সে চুমু খেতে পারল ! তৎক্ষণাৎ মনে হল— শাণিত সেনগুপ্ত নয়, অতসী সেনগুপ্ত অর্থাৎ আমার মায়েরই মৃত্যু হল এই মুহূর্তে । আশ্চর্য —পঙ্কজ কি করে বুঝল যে এখানেই ঠোট জোড়া আছে ? তাহলে এতক্ষণ সে আমার শ্বাস প্রশ্বাস ধরে উঠা নামা করছিল নিশ্চয়ই দাগী চোর !

আর আমি এক খাবলা ডালডা গুলে যাচ্ছি এখন ফুটন্ত কড়াইয়ে । আমার আশা আকাংখা সবই কর্পূরের মত হওয়া হয়ে যাচ্ছে । ক্রমাগত মিলিয়ে যাচ্ছে মায়ের মুখ বাবার জুঁইয়ের ।

পঙ্কজের হাত এবার আমার বগলতলা দিয়ে ঢুকে বুকের লোমকূপে বিলি কাটতে শুরু করেছে । কৌতুহলী শিশুর মত জ্বালা ধরিয়ে টানতে টানতে লোমগুলি ছিড়ে ফেলবে নাকি শালার শালা ! বীভৎসতা নাকি একটি রস । তোর সুখের নিকুচি করেছে শুয়োরের বাচ্চা !

সাপটা আবার আমার শরীর সীমান্তের ওপর দিয়ে পিচ্ছিল কষ ফেলে এগোয় । পেট ও পিঠের সংযুক্তি ধরে কটি দেশে হাত রাখে । আমার সঙ্গে যারা এক রিক্সায় বসেছে— সবাই কম্পলেন করেছে কোন না কোন দিন—তোমার এই জায়গাটা ভীষণ খোঁচা দেয় ।

—শোন শাণিত, আগামী দিনগুলি আমাদের । তুমিও দলে ঢুকে যাও । তোমার রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্পষ্ট না হলে রাষ্ট্রের কাছে কোন মূল্য নেই । আর সবই আগাছা । কোন নিরাপত্তা নেই সমাজে । পুলিশই বল বা বিচার বিভাগ তো প্রমাণের গোলাম । তোমার হয়ে কে সাক্ষী দেবে ?

পঙ্কজ ততক্ষণে শাণিতের কুলুঙ্গিতে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে— সে উত্তর দেবে কি ? আলগা গরম একটা হাত, একটু সময় আঙ্গুল গড়িয়ে ঘাম পড়ে টপ্ টপ্ করে ।তারপর তো সিন্নি মাখার মত সব কিছু কচলাতে শুরু করে দিল । সবই তেল সাবানের মত পিছলা, থকথকে, খিৎখিৎ ।আর শাণিত জলীয়বাষ্প হয়ে কেটলির মুখ ঠেলছিল শুধু । পঙ্কজ যদিও মাঝে মাঝে প্রসাধনী প্রলেপের মত তাকে আদর করছিল । আজই হয়ত হাতে পায়ের নোখ কেটেছে, ধার ধার অথচ আঁচড় লাগে না । আঙ্গুলডগা দিয়ে শাণিতের বুকে তলপেটে যত লোমকূপ এখন বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে দিচ্ছিল । আমার মনে হচ্ছিল শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরাগুলিতে বড় মাপের নকুলদানা পথ খুঁজে পাচ্ছে না । এখন সে চিৎকার করে কাঁদছে, অথচ শোনা যাচ্ছে যেন শৃঙ্গার সুখে গোঙানির মত ।

ওমা ! ও বাবা ! কই গেলায় গো তোমরা ! পাঁঠাটা একদিকে চিৎকার করছে, আরেক দিকে কুকুরকুন্ডলী একটান মেরে চিৎ করে ফেলেছে পঙ্কজ । এইবার মুখে চোখেই বিলি কাটতে শুরু করেছে সে । বদ্ধ ঘরে আগুন লেগে গেলে যেভাবে হুড়োহুড়ি ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় ।মাঝে মাঝে এগাল সেগাল টিপে দিচ্ছে । আঙ্গুল দিয়ে চোখের পাতায় গুঁড়িগুঁড়ি করছে পোস্ত ।

কী আরাম ! হাল পাল সবই কেলায় কেলায় । তবু ডাঙ্গার মাছ লাফাতে লাফাতে আবার লাফিয়ে উঠে । জুঁই রে তুই অন্তত একবার উঠে আয় এখানে। মেয়েছেলে দেখলে বন-বাঁদড় পাহাড়ী নদীর গতিপথ হয়ত বদলাতে পারে ! আলো জেলে দে । মেয়েদের চিৎকার চ্যাচামেচিতে অনেক সময়ই কাজ হয় । লোক জড়ো হয় দ্রুত । যদিও ওরা রিঅ্যাক্ট করার আগেই ওর খেলা শেষ হয়ে যাবে । প্রতিরোধ ক্ষমতা বলতে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই । উল্টো সহযোগিতা শুরু করে দিয়েছি । এবার পঙ্কজ আমার কপালের চামড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলছে । জ্বলছে গো মা ! চুল ধরে টানছে !

ধারালো নখে ঘষে ঘষে তুলে দিচ্ছে খুসকি । এমন কি পঙ্কজের মুখ থেকে এখন একটি মাকড়সা আমার মুখেও সূতা জড়িয়ে ফেলছে । জিহ্বায় জিহ্বা । দাঁতের কাজ কি সব ভুলে যাচ্ছি । আরাম হ্যবাম । বেনোজলের তোড়ে আর কত আল ধরে রাখতে পার তুমি অরনি ! এক্ষুণি প্রাণটা ভক্কাত্তি বেরিয়ে যাবে । তাই পঙ্কজ তাড়াতাড়ি আমাকে বিবস্ত্র করে নিল । তারপর হোস পাইপের মত ঘাড় ধরে মটকে দিল যাবতীয় অহংকার ।

এগারো

পঙ্কজ তলাপাত্র যখন বিছানা থেকে নামল তখন, মানে ভোর হয় হয়, মসলিন কাপড়ের মত তিরিতিরি বাতাস, অঘুমার রোগী হলেও তোমার চোখের পাতা ভারি হবে। আগেকার দিনে সিঁধেল চোর তো এমন সময়ই গৃহস্থকে ফাঁকি দিত। ফুল পরিপূর্ণ ফোটার পরে গন্ধ, সূর্য উঠার আগে শীতলতা, সাপের খোলস ফেলে রাত্রি পালিয়ে যায়।

বড় পাখি ডেকে উঠার দরকার নেই। অনেক আগে থেকেই শিশুরা কিচিরমিচির শুরু করেছে। ঘুলঘুলিতে আলো অন্ধকারে ঠেলাঠেলি। পঙ্কজের শরীরে কিছু উপছে পড়েছে। অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে সে ব্যায়াম করার মত প্রথমে এক পা, তারপর আরেক পা ঢুকিয়ে জাঙ্গিয়াটা পরে নিল। পেন্ট পরতে পরতে ধুতি রাখল চেয়ারের হাতলে। শার্ট গলিয়ে, বোতাম লাগাতে গিয়ে এখন আর অন্যকোন দিকে তাকাচ্ছে না। হাত দুইটা গুটাবার সময় একবার দিব্যেন্দুবাবুর বিছানা, একবার শাণিতের বিছানার দিকে দেখল কি দেখল না। বাঁ হাতে দরজার ছিটকিনি ছুয়ে ফেলেছে। কুট্ করে শব্দ হল। এইবার অন্তত মুসকিলে পড়বে বাছাধন—দরজা খোলা এবং ভেজানো —এদুটো কাজে তো সবচে বেশি শব্দ হয়। যদিও পঙ্কজ সময় নষ্ট না করে দৃঢ় হাতে দরজার একপাট খুলে ফেলল— কোন শব্দ হল না। শেষে ভেজাবার সময় কিছু কাইকুঁই করলেও পাত্তা দিল না সে।

যেন বাইরে এখন কতটুকু আলো এবং অন্ধকার — সবই তার জানা আছে। মুহূর্তে বুকের ভেতর কেঁপে উঠলেও মুখে ছায়া পড়তে দেয়না পঙ্কজ। ওকে দেখে ঘরের চাল থেকে এবার পেঁচাটিও বুঝতে পারল—ফিরে যাবার সময় হয়েছে। ঠিক নিচের সিড়িটাতে শাণিত দাড়িয়ে রয়েছে। লম্বা হাতা গেঞ্জি, লুঙ্গি, খালি পা, চুলগুলি খিগরাইল।

হ্যালো! চাপা উচ্চারণ করে পঙ্কজ যদিও এগিয়ে গেল তবু শানিতকেইতো ফটকের তালা খুলে দিতে হবে! দিতেই হল! তারপর পঙ্কজ মোটর স্টেণ্ডের দিকে পা চালিয়ে দিল হনহন করে। সেদিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শানিত, ধীরে ধীরে নিজে বাঁক নিল বাঁ দিকে—গণরাজ চৌমুহনীর দিকে।

তবে যদি আসাম আগরতলার রাস্তা ধরে চলে যাওয়া যায়, অন্তত সেই নক্সাল দুইটার কাছে গিয়ে কওয়া যায় সব কথা! কিন্তু পাত্তা পাওয়া গেলে তো! উদাত্ত লোকেশের কোন খোঁজ নেই। তারচে বরং পশ্চিম দিকটাই এখন বেশি নিরাপদ। লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, রাজবাড়ি, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন এবং দুষ্টক্ষতের মত চিলড্রেনস্ পার্কও আছে। ওসব ছাড়িয়ে ডানদিকে কর্ণেল চৌমুহনী, কর্ণেল বাড়িটাকে একপাশে ফেলে রেখে সারথি দেববর্মাদের ধ্বংসস্তূপও আছে। আসলে তার নির্বিকার ডেমকেয়ার ভাবটাই আমার বেশি ভাল লাগে।

কিন্তু শাণিত এখন ইতস্তত করছে। সে কোনদিকে যেতে চায়? পূবে অনুপ পশ্চিমে সারথি— কোনদিকে?

অনুপ রিফিউজি পরিবারের ছেলে। শাণিতের মত তারও ইণ্ডিয়াতে কোন ঠিকানা নেই। তিন তিনটে ছোট বোন—পড়াশুনায় ভাল, তাতে তো সমস্যা আরো বাড়ল! তাছাড়া এই রাক্ষুসে সময় ক'জন তরুণীর নিরাপত্তার বর্ম হতে পারে সে! সারাদিন ঢোঁড়া সাপের মত শুধু ফোস্ ফোস্ করে। অহংকার অভিমান এসবও আছে, আমি কবি। আসলে কি—যত্ত কাঠিন্যের আড়ালে সে একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ — তলে তলে কেবল পুনর্গঠনে ব্যস্ত। তার কাছে প্রতিকার চাইতে যাওয়ার অর্থ—নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ডিফেন্স সিস্টেমটাকেই আরো শক্ত করা। অথচ এই মুহূর্তে ঠিক তার উল্টোটাই দরকার ছিল!

সারথি অনুপের চেয়ে যেমন লম্বায় বড়, তেমনি শক্তপোক্ত। দাপট আছে। স্থানীয় আদিবাসী এলিটদের ঘৃণা করে। বামপন্থীরা তো সাধারণত রসিকতা বোঝে না আর নির্দয় হয়। এবং সে

রাজবংশী বলেই হয়ত তার কিছু উল্টো পাল্টা ব্যাপারও দল মেনে নিয়েছে।

মনে রাখতে হবে এ জায়গাটা চৌমুহনী— তার চারটি মুখ আছে। পূবে পশ্চিমে অনুপ সারথি, দক্ষিণে পূর্ব কতোয়ালি আর সুমিত ঘোষের বাড়ি আছে উত্তরে—তার কাছেও যাওয়া যায়!

না, ব্যাপারটা হল লালবাহাদুর ক্লাবের পাশে সুমিতের বাড়ি আছে—ঠিক আছে। কিন্তু ওকে কোনকিছু বলার অর্থই হল—রক্তারক্তির জন্যে তৈরী থাকা— এটা তো বড় মুসকিল! অন্য আরেকটা পথও খোলা আছে অবশ্য—দক্ষিণ দিকে কতোয়ালী, তুমি যদি সেখানে চলে যাও, খুলে বল গিয়ে সব কথা বা তোমার পেট থেকে ওরাই সব টেনে বের করে নেবে। একজন নক্সালপন্থী বন্দিনীর মুখে শুনেছিলাম—ভারতবর্ষে সমকামিতার ঘটনা সবচে বেশি ঘটে থানায়, হাজতে।

শাণিত শুরু থেকেই পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, ফলে সেদিকেই পা বাড়াল। তার মুখ চোখ দেখে যদিও বোঝার কোন উপায় নেই এখন কী নির্দেশ জারি করছে মগজ—কেন ডান পা না বাড়িয়ে সে বাঁ পায়ে প্রথম পদক্ষেপ দিল? অন্য কোনদিকে নয় কেন?

বনমালীপুর ধলেশ্বরে এজি অফিসের অনেকেই থাকে বাড়ি ভাড়া করে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই গণরাজ চৌমুহনী, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, রাজবাড়ি হয়ে আস্তাবল চৌমুহনী যায়। কেউ কেউ আবার লালবাহাদুর ক্লাব, আকাশবাণীর কিনারে কিনারে এজি অফিসে পৌঁছে যায়। আর শাণিতের তো এখন কোন আপিস নেই— সে আরেকবার বেকার।

গতকাল বিকেলে এই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিল—মন্দ লাগে না কিন্তু ইতিহাস জাবর কাটতে কাটতে! এ পাড়ার একটা বাচ্চা ছেলে, সেভেন এইটে পড়ে, রূপক দেবনাথ একদিন শাণিতকে বলেছিল—কাকু, আমি ত্রিপুরার রাজা ছেংথুমফার বউয়ের নাম জানি। মা বলেছে আপনিও ইতিহাস ভালবাসেন—বলেন তো দেখি নামটা?

—আমি জানি না। শুধু একজন পর্তুগীজ ছেলে ভিন্সেন লাগারডোকে জানি যার পূর্বপুরুষেরা বঙ্গোপসাগবে দস্যুগিরি কবত। আরেকজন আনোয়ার মিঞাকে জানি যাদেরকে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশ্য ত্রিপুরার অস্পষ্ট ইতিহাস থেকে কালু কামারকেও পাওয়া যায়—যিনি উনকোটি দেবতার মূর্তি গড়েছিলেন। তারপর আর থামার প্রয়োজন নেই—ইতিহাসের পাতা উল্টে উল্টে সবশেষে পাই—রতন মণি নোয়াতিয়ার নাম। এখনও চিৎকার করে কথা বললে হয়ত তিনি শুনতে পাবেন। শুনেছি সাধু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আমাদের রতনমণি নোয়াতিয়া। তুলসির মালা পরতেন গলায়, গান গাইতেন, বাঁশি বাজাতেন, আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন মাঝে মাঝে।

শাণিত শুয়োরের মত গোঁৎ গোঁৎ করছে আর এগোচ্ছে। এখন ভোর বললে ভোর, নইলে রাতের শেষও বলা যায়। রাস্তার আলো নিবে যায়নি, তবে পাওয়ার কমেছে। আর রাতের শব্দ যেমন টিনের চালে দালান বাড়ির ছাতে শোনা যায়, তেমনি এখন আবার গাছে গাছে। পুরুষবৃক্ষ বা বাঁজাগাছ একটিও মনে হয় না —সবই ফলন্ত।

আগেই তো বললাম — গতকালও এই রাস্তা ধরে বেড়াতে বেরিয়ে ছিল শাণিত। ঠিক বেড়ানো ঘোরানো নয়—একটু শ্বাস ফেলতে। কিছুটা সময় যদি সবই ভুলে থাকা যায়—ঘর সংসার, বেকারত্ব। তবু দেখবে তোমার সঙ্গ ছাড়বে না যত সুন্দর মুখশ্রী, বেতরঙ্গী শরীর, বাল্যস্মৃতি ইত্যাদি ঘুরপাক খেতে খেতে কোন্ ফাঁকে যে আবার সেই মাধ্যাকর্ষণের টানে নরককুণ্ডে এনে ফেলবে। আর বাচ্চা কুকুর যেভাবে বারবার উঠতে গিয়ে বারবার পড়ে যায়। শাণিতও পরিত্রাণ খোঁজে ত্রিপুরার ইতিহাসের মধ্যে। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে। তবু একটা মজা আছে, গোলক ধাঁধা। কোথায় মহাভারতের যুদ্ধ, কোথায় ত্রিপুরা! একদিকে রাজা ত্রিলোচন আরেক দিকে ছেংথুমপা। চন্দ্রবংশীয় যাগযজ্ঞ নাকি বাঁশপূজা?

এ পথেই আরেকটু এগিয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবন। গেলকাল ত্রিপুরার শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে একটি আলোচনাচক্র ছিল এখানে। তারো আগে শ্যাওলা পড়া অনেকগুলো ছাতাঘর নিয়ে আছে শিশুউদ্যান। সেখানে বৃষ্টি ওরা থাকে। দেরী করে করে পোষাক আষাক খুলে লাগায়। আর যত বকাইট্যা পোলাপান বেঞ্চিতে বসে বিড়ি খায়, খুক খুক করে। এদিকেই দূর্গাবাড়ি লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির সামনে পূণ্যার্থীদের ভিড় লেগে থাকে সবসময়, বরযাত্রীদের। তার আগে ওমেন্স কলেজের দেয়াল ঘেষে কুখ্যাত খেজুর গাছ আছে দুইটা। তাদের পাশাপাশি একজন রাজবংশীর বাড়িতে গতকাল মেয়ে বিয়ে গেল। আদিবাসীদের বাঁশের তৈরী তোরণ সত্যি দেখার মত। অথচ এতসূক্ষ্ম কাজ যারা করেন—সবাই জঙ্গলে থাকেন, পাহাড়ে। সেখানে জুম নেই। ফলমূল বন্যশূয়োর কিছুই নেই। শূন্য হাত। কোন কাজ নেই তবু ভোতা টাক্কাল থাকে হাতে।

গতকালও এমনই দুইজন বিচরণ করছিল এখানে। পাহাড়ি দাদু নাতিভাই। বুড়ার কথা বাদ কারণ তার শরীরে শুধু আনুগত্য আর সহ্যশক্তি। কিন্তু যুবকটি অন্য রকম—চোখ চিবুক দেখে যা বোঝা গিয়েছিল, অনেক কিছুই সে মেনে নেবেনা। ক্ষুধা তৃষ্ণা চেপে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজ না থাকলেও তার হাতের টাক্কাল কাঁধে লক্‌লক্‌ করতে থাকে। যদিও চোখের পুতলিগুলি মাঝেসাঝে এলোমেলো হয়। হয়ত শত্রু চিহ্নিত করতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে। কে ওয়ানচা? চৌধুরীরা? নাকি রাজবংশী? তারপর কিছুই করতে না পেরে দাদু-বুড়ার চোখে মুখে বিড়ির ধূয়া ছুড়ে ছুড়ে মারছিল। পাহাড়ে আমরা যে লাল টুপি প'রি, চৌধুরী আর মহাজন বেটাও দেখি হেই টুপি প'রে! টিলা থেকে নামলেই বাজার। যানবাহন শহরে যায়।

বাঘের চোখ গাড়িগুলো পাশ কেটে যাচ্ছে। রাতের কুকুর যত হিংস্র, ভোরের কুণ্ডলি কুণ্ডলি দেখে তত মনে হয় না। এখন তার হাঁটার মধ্যেও বিশৃঙ্খলা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশও। তারপর গণ্ডারটা সময় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। রাস্তার পাশে সটির ঝোপ থেকেই যেন শব্দ হয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখল— ঝোপের মধ্যে দুই পা ছড়িয়ে একটা টেলিফোন পোষ্টে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে পঙ্খী। সাধারণত তার গায়ে যে চটের পোষাক থাকে—এখন নেই। এ পাড়ারই একজন উকিলবাবু, রতনের বাবার একটা ছেঁড়া আলখাল্লা শীত চাদরের মতই গায়ে জড়িয়ে রেখেছে এখন। কোমর থেকে খোলামেলা। পঙ্খী দেববর্মার গায়ে কত রক্ত আছে—ক্রমাগত চুইয়ে চুইয়ে ধুলোবালি মাখামাখি। অন্য আরেকটি কথাও মনে হয়—পৃথিবী, তুমি রমণীয় যত রক্তস্রাবেই কি উর্বরা হয়েছ?

যুবকটির ভাবভঙ্গী দেখেও মনে হয়— সে পঙ্খীকে মুক্তি দিতে চায়—কিন্তু কিভাবে? তার হাতে তো আর আসল টাক্কাল নেই। তাই প্রার্থনা করে—তুই মর, মরে যা! তারপর আবার হাঁটতে থাকে। ক্রুদ্ধ নলরাজার শরীরে কলি ঢুকেছে।

প্রতিদিন ঘুম ভেঙে গেলেই একবার মনে হয়—ইস্‌, আজ যদি ইমারজেন্সি উঠে যায়! ত্রাসের রাজত্ব। অন্তত ব্যাপারটাকে জাষ্টিফাই করা যায়নি—কেন এই ইমারজেন্সি? জয়প্রকাশজী প্রতিদিনই ভারতবর্ষের এ-কোণা থেকে ও-কোণায় ছুটে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের শরীরও খারাপ। অশীতিপর মোরারজীভাই, চরণসিং সবাই জড়ো হয়েছেন একই ছাতার নিচে। অনেকদিন পর আবার ওদেরে রাজনীতির মঞ্চে দেখে সাধারণ মানুষ কি ভাবছেন কে জানে? তবে অবিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তির ইচ্ছাও তো জন্মগত ব্যাপার। যাইহউক ইমারজেন্সি উঠে যায়নি। আগরতলার ভোর যথারীতি কাকেদের দখলে। শাণিত এগিয়ে যেতে থাকে।

পায়রার ডানাঝাপটানি যেভাবে সচকিত করে, তেমনি কাকের বাতাস আবার গায়ে সয় না। এই বনমালীপুর—বড়লোকের জায়গা ছেড়ে অনেকদূর চলে যেতে হবে। শুনেছি জিবি হাসপাতালের দিকে ইন্দ্রনগর জগৎপুরে ঘরভাড়া কম। ভাড়াটেদের যদিও অনেক অভিজ্ঞতা। নুতন কোন পাড়ায় গেলে প্রথমেই লোকটাকে আবিষ্কার করা হয়—সিলেইট্যা নোয়াখাইল্যা

এভাবে। অথচ দেশভাগ হয়েছে কবে!

প্রকৃত ভারতীয় হয়ে ওঠার আগেই চাকরি খুইয়ে ফেলেছে শাণিত। স্বপ্ন চুরমার। আর একটা মাত্র লাভ হয়েছে—এখন সে যে কোন সময় কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে। নাটক করলে আরো ভাল হত! তখন হঠাৎই যেন গুলিবিদ্ধ হল সে— নিচে নামছে ভোকাট্টা, নিচে নামছে ভোকাট্টা।

তাছাড়া ইন্দ্রনগর জগৎপুরে গেলে শাণিতের ছোট বোনটারই বেশি অসুবিধা হবে। কতদূরে কলেজ ! যখন তখন যানবাহনও পাওয়া যায়না। তাছাড়া পয়সার শ্রাদ্ধ। আর বাড়ি পাল্টাতে পাল্টাতে মায়ের মুখ তো তোতাভোতা। ইন্ডিয়াতে আর নিজস্ব ঠিকানা হল না। ছেলের বউ নাতি নাতন। তিনি দুই হাত প্রসারিত করে অর্দ্ধচন্দ্রাকারেও সম্পূর্ণ পৃথিবী বোঝাবার চেষ্টা করেন— এতগুলি লাগে। খোঁয়াড়ের শূকরী বা কুক্কুরীর কথা মনে পড়বে তখন—তাদের অনেকগুলি স্তনের বোঁটা থাকে। আর দিব্যেন্দুবাবুকে দেখলে মনে হবে মেলানকুলি হিকেইড—যার কোন স্বপ্ন থাকতে নেই। নেই কেন? হয়ত আছে। ঘসা কাঁচের নিচে কি আছে? এই লোকটাকে যদি একটা বড় ইজিচেয়ারে বসিয়ে রাখ, তারপর চারপাশে আঁক ড্রয়িংরুম। কয়টা কাঁচের বুক সেলফ। সে' টার টেবিল। একটা ভাঁজ করা পত্রিকা আর এক কাপ গরম চা দাও তার হাতে।

বাড়ি একটা বানাতে পারলে কিন্তু অতসীদেবী শাণিতকেই জ্বালাতন করবেন বেশি। —বাবানু ভালারে শাণু, একটা চিঠি লিখ না কেন করিমগঞ্জে—তোর পিসীকে, একবার এসে ঘুরে যেতে বল।

—কেন গো মা, বড়পিসী না তোমাকে মুখপোড়া বানর বলেছিল !

আরেকটা অস্ত্র আছে অতসীর—হাউ মাউ করে কান্না। আমার কথা শিয়ালমূত্রী পাতার সমান!

—আইচ্ছা গো মা, আইচ্ছা।

তবু ছাড়বেন না অতসী। বাড়ি ঘরের প্রতি একটুওএ খেয়াল নেই তোর—সারাদিন কেবল ঘুরাঘুরি। মাঝে মাঝে পাহাড়েও যাওয়া পড়ে নাকি রে?

—কেন, আবার কী?

—না মানে তখিরাই খুমতি ওদের কথা বলছিলাম—দুর্দিনে এসেছিল, এসময় যদি কয়টা দিন কাটিয়ে যায়—

এইবার আর শাণিতের কোন কথা ফুটবে না মুখে। খুমতিবেও কি কালু কামারই বানিয়েছে পাথর কেটে কেটে? শাণিতের এই ড্যাবড্যাবে ব্যাপার স্যাপার জুঁই ঠিকই বুঝতে পারত। এখনও যে তার মাথা নুইয়ে পড়ে, মানে হল বাড়ি যদি একটা করতে পারি তাহলে গৃহপ্রবেশের দিনই শিলচর থেকে এলো চুল এষা বা করিমগঞ্জেব পম্পি—যে মেয়েটি সাদা ডেক্রনের জামা পড়ত, সেও মাথা নুইয়ে রাখত সবসময়—ওদের নেমতন্ন করব।

মূলে নাই ঘর পূবে দিয়া দুয়ার। এই ফাঁকে শাণিত অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কোন লাভ নাই ভাই। বাল্যস্মৃতি ইমারজেন্সি এসব ফেলে তুমি কোথায় যাবে? রাজনীতিয়ে খাইল দেশটাবে। কিছু লোককে কিছু দিলে তোমাকে সমর্থন করবে। কিছু লোককে কিছুই না দিলে বিরোধিতা। আরো কিছু দিলে বিরোধী দল ভেঙে তোমার হয়ে যাবে সব।

ফলে একদিকে রাজনৈতিক বৃশ্চিক, আরেক দিকে প্রতিকার চাইতে হলে তোমাকে সারথি দেববর্মার কাছেই যেতে হবে কারণ তার মরার ডর নাই। সবাইকে চিনে জানে ছেলেটা। একটা দুষ্ট লোককে মেরে ফেলা তার কাছে কোন ব্যাপারই না।

গণরাজ চৌমুহনীর সুমিত ঘোষেরও সৎসাহস আছে, তবে কোন কথাই পেটে রাখতে পারে না অসভ্যটা। লোক জানাজানি হবেই। একবার কথায় কথায় নিরঞ্জনের কথা সুমিতকে বলে ফেলা হয়েছিল। কি দোষ ছিল তার? কিছু না। জুঁই নাকি পেছন ফিরে তাকালেই হাবাটাকে দেখতে পায়। তাই সুমিত ঠিক করল—ওর চুল দাড়িগোঁফ ভুরু সবই কামিয়ে মাথায় ডিম ভাঙতে হবে, তারপর নগর কীর্তন। কথাটা শুনেই আমরা লম্বা হয়ে ওর পায়ে পড়ে গেলাম—ওকে ছেড়ে দে

সুমিত, লোক জানাজানি হলে জুঁইয়ের ক্ষতি। গুরুর স্টাইলই আলাদা। তখনও আমরা তার পায়ে ধরে আছি, সে চোখ বুজে আছে, তারপর আমাদের কাকুতি মিনতি শেষ হলে সে প্রথমে শব্দ করে হাতজোড় করল—ক্ষেমা দে। তাহলে আমার কাছে এসেছিস কেন? আর যদি কোনদিন এসব নিয়ে আসিস! সুমিত পা তোলার আগেই আমরা সরে পড়েছি।

আজ সারথি দেববর্মার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পেছনে অনেকগুলি কারণই আছে। শুধু যে পঙ্কজের প্রতিকার চাইতে যাচ্ছে এমন নয়। সারথি যদিও এজি অপিসে চাকরি করে তবু আগে পরে অনেকগুলি পার্ট টাইমই করত একসময়। অভাবে নয় স্বভাবে। এখন পত্রিকা অপিসের কাজ ছাড়া বাকি সবই ছেড়ে দিয়েছে। তবু সারথির কাছে গেলেএকটা না একটা পথ পাওয়া যাবে।

অনেকখানি এগিয়ে গেছে শাণিত। ওমেন্স কলেজ পার হয়ে প্রথম যে রাস্তাটা রাজবাড়ির দিকে গেছে, এখন যার একটা অংশ বিধানসভা ভবন। সে আড়ালে চলে যাওয়ার আগে আরেকবার তার উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা লুঙ্গি, খালি পা চোখে পড়ল। গেঞ্জিও গায়ে ছিল অবশ্য।

যেন একটুকরো কাগজ ঘূর্ণি বাতাসে ছুটে যাচ্ছে। আবার রাজবাড়ির দীঘির পাড়ে থেমে গেল। বসল। সামনে জগন্নাথের চূড়া। বাঁয়ে একসারে দুর্গাবাড়ি লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি। সঙ্গে একটি পড়ো ছাতাঘরও আছে। রাতের বেলা এখানেও ছায়ারা এসে মিলিত হয় শুনেছি। পেছনে কালিবাড়ি, ডাইনে রাজার দরবার ছিল একসময়। এখন দীঘির জলে সূর্য এসে পড়েছে মানে জলের চামড়ায় এক বিচি তূলা বা একজোড়া টুনটুনির পালক খেলা শুরু করে দিয়েছে।

তারপরই তার মনে হল পঙ্কজ একটি বোয়াইল্যা জোঁক—তার লিঙ্গ পথেই শরীরে ঢুকে পড়েছে। শালার মুখে লবণ বা চূণ কিছুই দেয়া যাবে না। এমনকি চুলকোতে পারছে না শাণিত। একটা ন্যাকড়া পোড়া গন্ধ কল্পনা করতে থাকল। জোঁকটাও ক্রমশ বড় হতে হতে শাণিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। রাজনীতির ছকে আরেকজন পঙ্কজ তলাপাত্র হয়ে যাবে শাণিত।

আর মানুষ থেকে বিষাক্ত মাকড়সা হয়ে যাওয়া—এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে বাবা দিব্যেন্দু সেনগুপ্তের রিঅ্যাকসন কি হবে? —আমি হলাম গিয়ে অগ্নিযুগের মানুষ, আর আমার ছেলে কিনা ছুঁচো হল! অতসীর কথা হল—সবই বীর্যের দোষ। জুঁইয়ের নো কমেন্ট।

এসব কোন ব্যাপার নয়। এখন নিজের প্রতি শাণিতের নির্দেশ হল—আজ থেকে নতুন কোন কাজ শুরু করা যাবে না—যা যা অর্ধসমাপ্ত আছে সে সবই তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে? ভাবতে ভাবতে শাণিতের কান্না পায়—একচোট কেঁদে ফেলে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ভাবে—তবু মানুষ ওঝা ডাকে কেন? তাতেও কাজ না হলে খাদ্যাখাদ্য সঙ্গে দিয়ে নদীতে ভেলা ভাসিয়ে দেয় কেন?

এবং সে ভাবে—পরিত্রাণের আর একটি মাত্র পথ খোলা আছে এখন—একটি আনকোরা যোনী! ভুল কথা—নারীদেহ হবে হয়ত। তাও ভুল—নারী মন হবে।

হতে পারে। আসলে দুষ্ট রাজনীতি আর সমকামিতা থেকে যে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

—তাহলেও হে পার্থ, তোমাকে সারথি দেববর্মার বাড়িতেই যেতে হবে। রমনীয় রূপে ডুবতে পারবে যত, পঙ্কজের হাত আলগা হবে তত।

—দেবী বুড়িবক, আমাকে সাহায্য কর, সাহায্য কর!

— আচ্ছা, আমাদের লালিমা দেববর্মাকে কেমন লাগে তোমার? —আমার এই পার্থিব সুখ সৌন্দর্যের কল্পনা লালিমাকে অতিক্রম করতে পারে না। আমি আরেকটা কথা বলি কমরেড—একজন শাকচুন্নী মেয়ে না কি বন্দিনী রাজকুমারী—কে বেশি দুঃখী আমি জানি না। পঙ্কজের মত একভাগ ডাইনে রেখে, এক ভাগ বাঁয়ে—এভাবে আমার দ্বারা হবে না।

যাই হউক, সারথিদের বাড়ির সিঁড়ি বাওয়াও শক্ত কাজ। পুরনো থামগুলি ভেঙে উল্টেপুল্টে রয়েছে। ছোট বড় ফাটল এড়িয়ে হাঁটা কম কথা না। তাছাড়া শূয়োরটাকে তো বাড়িতে পাওয়াই

মুসকিল। এখন এই দীঘির পাড়ে বসে মনে মনে সারথিদের ঘরে ঢুকতে গিয়েও ইতস্তত করছে। আমার স্বপ্নের ঘরে ঢুকব কি ঢুকব না।

এটা নক্ষত্ররায়ের বংশধরদের বাড়ি। তিনিও একদিন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন — এই কথাটা যেন সবাই ভুলে যেতে চায়। আর লালিমার কথা হল—চক্রান্ত। সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের নাম ও নিশান মিটিয়ে ফেলতে চাইছে ওরা। বুদ্ধিজীবিদের মাথা কিনে নিয়েছে, যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ। কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই লালিমা হাসতে থাকলে—হলঘরের ছাদে মানে শাণিতের মাথার মধ্যেই এখন জালালী কবুতর ওড়াওড়ি শুরু করে, বিষ্ঠা ত্যাগ করে।

ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্রেরও একই অভিমত। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরদের কাছে যে রাজমালা আছে তাতে লেখা—নক্ষত্ররায়ের রাজা হবার ইচ্ছে শুনে মহারাজ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন। আবার ছত্রমাণিক্যের বংশধরদের কাছে যে রাজমালা পাওয়া যায় তাতে লেখা আছে—এক ভয়ানক যুদ্ধের পর গোবিন্দ মাণিক্যকে পরাজিত করে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করেন নক্ষত্র রায়। পরবর্তীকালে ইতিহাস পর্যালোচনা করে কৈলাসচন্দ্রেরও মনে হয়েছে--নক্ষত্ররায়দের রাজমালাই সঠিক। তিনি আরো দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে—গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরেরা ছত্রমাণিক্যের ইতিহাস বিকৃত করে চলেছেন ক্রমাগত।

পঙ্কজ, যুগে যুগে পঙ্কজ তলাপাত্র এবং ! শাণিতের দীর্ঘশ্বাসে এখন দিঘীর পাড়ে কিছু শুক্‌নো ঘাস কেঁপে উঠল শুধু। সে কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে অনবরত। বিড়বিড় করছে অনুপের কবিতা—'একটি পান পাতাকে যোনী বা হৃদপিণ্ড/কী যে ভাবি আমরা!'

বার

প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে রাজবাড়ির গম্বুজগুলিতে। তারপর ঘুল ঘুলি দিয়ে ব্যক্তিগত পালঙ্কে পালঙ্কে যায়। রাজবাড়িরই এক অংশ এখন আবার বিধানসভা হয়েছে, ক্ষমতা লোভীদের দরবার গৃহ। এখানেও পেয়াদার মতই দাঁড়িয়ে থাকে ভোর। এই যে প্যালেস কম্পাউণ্ড, ইদানিং টুকরো টুকরো বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। নব্য বনেদীয়ানা অন্যরকম ব্যাপার। আমাদের 'উত্তর পূর্ব' পত্রিকা অফিসটার জানালা কখনও বন্ধ হয় না, পর্দা টানা থাকে শুধু। তবে ঘরে কৃত্রিম আলো জ্বালিয়ে কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে ভোর ? একসময় এমনভাবে চুপসে যাবে টুকবো সূতোর মধ্যে আগুন আর চোখেই পড়বে না।

এ সময়টা তন্দ্রা তন্দ্রা। পাতলা চাদরের মত হাওয়া। সে প্রথমে তার বাঁ-হাতটা টেবিলের উপর লম্বা করে দেয়, তারপর বাহুতে মুখ রেখে টুপ টুপ ঘুমিয়ে পড়ে। দুই আঙ্গুলের ফাঁক থেকে ঝর্ণা কলম পড়ে যায়। সে শব্দ শুনে হয়ত—এর বেশি কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তবে হাত ও মাথার নিচে ক্লিপবোর্ডের মধ্যে সাইজ করে কেটে রাখা এক তাড়া নিউজপ্রিন্ট মাঝে মাঝে খসখস করে। মাঝে মাঝে পুস ডোর ঠেলেও কে বা কারা আসে যায়।

শাণিত আরো আরো ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে চায়। গভীর ঘুম বলতে সে নিম্নগামী গভীর মনে করে। যতই থপ থপ করে নামতে থাকে সিঁড়ি ততই ভূত প্রেতের মুখোমুখি হয়—বাড়ি ভূত, চাকরী ভূত। আবার গাঁজার ঘুম সিলিং-এর দিকে টানতে থাকে। তথাকথিত, উচ্চাকাঙ্খাও নয়, উপরে ওঠার দুই নম্বরী সিঁড়ি ডিসটার্ব করছিল শাণিতকে। ফলে এখন মনে হয় প্রকৃত ঘুম সমান্তরাল পথেই আসে যায়। তার মাথা থেকে সমান্তরাল বেরিয়ে যাচ্ছিল একটার পব একটা ডিস্ক আর শেষ প্রান্তে বসে কে পুরনো দিনের গ্রামোফোন বাজায় লালিমা দেববর্মা নয় তো? আবার ঝাপসা মনে হয নলীদার মত কে বিড়ি ফুঁকছে ? না না, লোকটা আরো মোটা, ঝোলা ব্যাগ আছে সঙ্গে। কে তবে? প্রতি শনিবার দিন সন্ধ্যার দিকে পত্রিকা অফিস পার হযে যে নিম গাছ তার নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে একটা পার্টি অফিসের গাড়ি।

এখন আবার কে পুশ ডোর ঠেলে ? অনুমান করে শাণিত, সকালের চা নিয়ে নিশ্চয়ই কানাই। আরেকটা কথা এসব গঞ্জিকা'ফঞ্জিকা দিয়ে কোন কাজ হবে না। শালা বাংলা মদের নেশাই আলাদা। পাহাড়ী লাঙ্গী হলে তো আরো ভাল। মুখে যা খুশি চিৎকার কর— পঙ্কজ তোর ডিম ভাজা করে খাব। কিন্তু ঘুম তবু আসবেই। মাথাটা মাথায় থাকবে না, শবীরটা শবীরে নেই মানে কী -—সাময়িক মৃত্যু? আমি তাই চাই।

কিন্তু কানাইটা এল, অথচ তার যাওয়ার শব্দ হল না কেন? মুখে বলল না—চা, এঁটো কাপগুলি তুলে নিল না শব্দ করে করে। ফিসফিস করেও বলেনি—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাবু। কোন কোন দিন দু'একটা ঠেলাও দিয়ে যায় কানাইয়া।

ইদানীং পত্রিকা অফিসে কাজের বহর বড় বেশী। গতকালও সারা দিন গলি ঘুপচি করে শাণিত যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে প্রায় সাতটা। মেয়েগুলোকে সে আইডেনটিফাই—করতে পেবেছে ঠিকই। কয়দিন ধরে একাজই তো করছে সকাল সন্ধ্যা। ওদেরে এক জায়গায় একত্রে রাখা হয়নি। মাঝে মাঝে শাঁখা সিঁদুর পরা দু'একটাকে দেখেছি। সঙ্গে বেটা মানুষও আছে। কিন্তু এত আড়ষ্ট কেন ? মুখের মধ্যে গাইয়া উৎকণ্ঠা ! আবার শরীরি নিপীড়নের আশঙ্কা বা হয়ত সে নিপীড়িত হচ্ছেই। মাগী ভাইগ্যা আইছস্ কেরে ? স্বদেশ স্বজন ফালাইয়া? আরেকটা কথাও মনে হয়— কোন মুসলমান মেয়েকে যদি হিন্দু বউ সাজিয়ে রাখা হয়—তাহলেও আড়ষ্ট হবে কিন্তু !

চোখ বুজেই শাণিত ভাবছে আর হাসছে—এসব ব্যাপারে দেখি ইমারজেন্সী বাবাজি কোন কাজ করেন না ? সব শালা ফালতু, ধোঁকা। এখনও মেয়েপাচারকারী চাঁইটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে

না। ইনফরমারদের পয়সা দিয়েও লাভ হচ্ছে না কোন। বুঝা যায় কত লম্বা চওড়া হাত ! শুনেছি আগরতলার গ্যাং-লিডার একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। তবে মটরস্ট্যাণ্ডগুলোতে আমার লোক আছে। পাচারের আগে ঠিকই টের পেয়ে যাব। বিভাস ওদেরেও দেখেছি এদিকে ওদিকে। প্রফেসনেল সিক্রেসি, কেউ তো কিছু বলবে না তোমাকে। তাছাড়া পত্রিকা অফিসগুলি ঝগড়াটে সতীনের মত। খবরটা প্রথমে ফাঁস করল বোম্বের একটি দৈনিক। গালফ্ কান্ট্রিগুলিতেই নাকি পাচার করা হয়। আগরতলার থানা বিশেষ কোন খবর রাখে না। তবে পুলিশেরা সাধারণত যেসব খবর দিয়ে থাকে, ওতে ওদের কোন লাভ লোকসান নেই বুঝতে হবে। হাসপাতালগুলিতেও আমাদের ইনফরমার আছে।

কানাইটা কি চা না দিয়েই চলে যাবে? ঘুমন্ত মানুষকে সবাই মরা ভাবে। আবার কী ? শাণিত তো মরাই, স্রোতের বিরুদ্ধে চলতে গিয়েই তার এই হাল হয়েছে। অথচ বাইরে যে খুবই প্রতিবাদ মুখব ছিলাম— এমনও নয়। আমি ভাবতাম তলে তলে সৎ হৃদয়বান ঠিকই আছি। এখন দুষ্ট লোকের সঙ্গেও ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে কিছু সময় কাটিয়ে দেয়া যাক। তারপর শক্তি সঞ্চয় হলে আবার আত্মপ্রকাশ করব। ভুল, ভুল শাণিত সেনগুপ্ত। কেমফ্লেজ করা অত সোজা কাজ নয়, তাছাড়া তুমি কি মনে কর সততা বা হৃদয়বৃত্তির বাতিক—তথাকথিত দুষ্টদের মধ্যে নেই? আসলে তোমার মধ্যে এডাপটেশনের অভাব আছে।

আছে নয়, ছিল। শাণিতের তো ঘুম আসেনি শুরু থেকেই, এখনও একই রকম পড়ে রয়েছে মাথা ফেলে, চোখ বুজে, শুধু একটা মাছি না মশা কি জানি নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আচ্ছা আজ কি কি কাজ। কি বার ? পরশু শনিবার গেল—গভীর রাতে কি অবস্থায় তুমি পত্রিকা অফিসে ফিরেছিলে—মনে আছে। তবে গতকাল কিন্তু ভাই আমার কোন দোষ ছিলনা। কম্পোজিটার মেয়েটা অনেকদিন ধরেই অসুবিধা দেয়। কাজের অছিলায় বারবার চলে আসে আমার কাছে। কত বলেছি—সুবোধ বাবু তো প্রুফ দেখবার জন্যই আছেন —তুমি উনার কাছে যাও না কেন ? সে আমার কথা শুনতেই পায় না—আবো গা ঘেসে দাঁড়ায়। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।উসখুস করতে থাকি। আসলে গুড সেলফ্ একেবারে মরে যায়নি তো! পত্রিকা অফিসে কম্পোজের কাজে আসে যেসব মেয়েরা — ওদের প্রথমেই নষ্ট কবে ফেলা হয়। মাত্র শ'দেড়শ টাকায় কাজ শুরু করে। তাবপর তো মুখ চিনে মুগের ডাল। ম্যানেজার থেকে শুরু করে কোন কোন কম্পোজিটারকে দেখেছি মালিকও ফেভার করেন। ওরা তখন অন্য মেযেদেব উপব ছড়ি ঘোরায়। লিলিও ঐ রকমই। তবে আর আমাকে যন্ত্রণা দেয়া কেন'? না, এটা অন্য ব্যাপাব। মালিক তো সবই কিনে নেয ওর কাছে থেকে। ফলে তাকে আর কেউ ডিসটার্ব করবে না পত্রিকা অফিসে। উল্টো লিলি করে। যেন মনটা তার একার—সে যাকে খুশি দেবে, যাকে খুশি না। তাছাড়া শাণিতকে দেখলেও মনে হয়—তাব চাল নেই চুলো নেই, যেখানে রাত সেখানে কাৎ একটা মানুষ।

এবং আমি বার বার সরে যাচ্ছি দেখে রেগে আরো গা ঘেসে আসে লিলি। আমার কাজ করা হাতের কনুই ছুঁযে রাখে তার শরীরে—চাপা স্বরে গজগজ করে—সুবোধবাবু—যেভাবে নাকের লোম টেনে ছিঁড়ে ফেলেন—কী নিষ্ঠুর ! ঠিক তখনই আমরা একে অন্যের দিকে তাকাই। তারপর কাল বেশি রাত করেই কাজ শেষ হলে আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মাছিটা এবার নাক ছেড়ে কানের কাছে ভুতু ভুতু করছে। শাণিত চোখ বুজেই হাই তুলল, চুটিও মাবল দুইটা—একটা শব্দ হল। তবু, চোখ বুজে থাকল। ইদানিং তার কালেকসনগুলি ফার্স্ট লিড্ যায়। সম্পাদকের ঘরে ডাক পড়ে যখন তখন। একদল লোক সবসময়ই অর্ধচক্রাকারে বসে থাকে জগদীশদার সামনে। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেও বাহ্ বাহ্ করে—দারুণ হচ্ছে শাণিত, চালিয়ে যাও। এসবের কি উত্তর দেবে সে—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে বা ঠোঁটের কোনে হাসি রেখে ফিরে আসে টেবিলে। যেন ভীষণ লজ্জা পেল শাণিত ! শালা তেলুয়া পার্টি। জগদীশদাকে খুশি করার প্যাচপাইচ্যা। নরকের কীট ছাড়া আর কিছুই ভাবে না সে. কেউ হয়ত

অফিসের তহবিল তছরূপ করেছে। একজন আবার মদ্যপ বিচারক—রোজ রাতে বউ পিটিয়ে পাড়া এক করেন। বিশেষ করে সরকারি আমলারাই জগদীশদার কাছে স্পেশাল অ্যাটেনসন পায়। সরকারি ফাইলে কি লেখা হয় না-হয় সবই তিনি জানেন। তার টেবিলে পাঁচ পাঁচটা টেলিফোন আছে নানা রঙের । এটা ঠিক, শাণিত জগদীশদাকে ভাল বুঝতে পারে। মন্ত্রী ব্যবসায়ী বা কোন হোমড়া-চোমড়াকে নিয়ে কিছু একটা লিখে প্রথমে জগদীশদাকেই দেখায়— দাদা ছেপে দেব? নাকি টেলিফোন করবেন একবার ?

—দেখি কি করা যায়।

তারপর শাণিত সুবোধ বালকের মত নিজের টেবিলে ফিরে আসে।

এখন যেমন ইচ্ছে করলেই সে চোখ মেলতে পারে। পিঁচুটি নেই, কিচ্ছু নেই। কিন্তু খুলছে না। এই এক তামাশা। আগের চেয়ে বেশি লোকজন ঘরে ঢুকছে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে আলাদা আলাদা ভাবে। ফলে কোন কথাবার্তাও নেই। কেউ কি জানালার পর্দা সরিয়ে দিল। চোখের পাতা বোজা থাকলেও কিন্তু আলোর খেলা রীতিমত টের পাওয়া যায়। মনে মনে ডায়রীর পাতা উল্টাতে থাকে। আজকের করনীয় কি ভাবতে থাকে ঠোঁট কামড়ে। মন্ত্রীর বউয়ের স্টেটমেন্টটা আরেকবার আওড়ে নেয়—"আমার স্বামী অন্য কোন মহিলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখেন না। সবই বিরোধী দলের অপপ্রচার।"

— সত্যি, আপনি এখনও দারুণ দেখতে !

—আরেক কাপ চা খাবে ভাই ? তুমি তো এমনিতেও আসতে পারো মাঝে মাঝে—

শাণিত ভাবে লেখাটা শেষ করে ফেলতে হবে দ্রুত। তারপর একদিন যাব। আর মজার ব্যাপার কী —এখন সরকারি চাকরী পাওয়ার কোনই লোভ হয় না। ছোটমোট একটা বাড়ির জায়গাও কিনে ফেলেছি জগৎপুরে। যে বাড়িটাতে এখন ভাড়া আছি—তার পাশেই প্লট, সুতরাং ভদ্রমহিলার কাছে আপাতত আমি কিছুই চাইব না। তবু একবার যাব।

কিছুক্ষণ পর আপনা আপনি খুলে গেল শাণিতের চোখ, যেন বাইরে থেকে ঘরের পর্দা তুলে দিল কেউ। তাতে কি বুঝা গেল? বুঝা গেল শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তোমার ইচ্ছার দাস নয়। সূর্যালোকের প্রভাবই বেশি। কাঁচের জানালা পর্দার ফাকে এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে গরম গরম ধূয়া। পাতা সেদ্ধ কষা গন্ধ। তার তেষ্টা পেয়ে যায়। শাণিত মাথা তুলে দেখে — আরেক কাপ চা শিয়রের পাশে ঠাণ্ডা সর পড়ে রয়েছে। —তখন ডাক দিলি না যে কানাই ! তোর ভয় কী! আমি তো ঋণী এক চুমুক চায়ের কাছেও । আসলে মদারু গেঁজেলদেরকে সবাই ভয় পায়। ওদের মাথার ঠিক থাকে না তো ! হয়ত ডাকলি কেন বলেই চড় থাপ্পর বসিয়ে দিলাম দু'চারটা।

এখনও ভোর । কোন কিছু শুকোতে দেওয়ার মত রোদ নেই। থাকলে আমার অতীতটাই মন্দ কী ! মাঝে মাঝে পত্রিকা অফিসের ছায়ায় বসে থাকি আর রোদ পোহাতে থাকে বাল্যকাল, সরকারি চাকুরি জীবন, ইউনিয়ন এসোসিয়েশন এবং দুষ্ট রাজনীতির খেলা, সূর্যটা এখনও স্নান সেরে মায়েদের কপালে তেল সিঁদুরের মতই প্রতীক। কিন্তু পলকে পলকে ভোর সকাল হয়ে যাবে, সকাল গড়াবে দুপুরের দিকে, পিচগলা রাস্তার দিকে আর হাওয়াই চপ্পল রোজই আটকে আটকে যায় । সে যদিও অনেক পরের কথা । বাইরে একটা পাম্পস্টোভ অনবরত শব্দ করে চলেছে। ধুঁয়ার কুণ্ডলী কুয়াশার মতই দরজা জানালা ঝাপসা করে। একটু আগে টেবিলে মাথা রেখে শাণিত শুনছিল ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিল—এতক্ষণ কোন ঘন্টা বাজছে না কেন ? আবার দেখে নিল—প্রায় আটটা, পাঁচ মিনিট বাকি। একি ! তাহলে কি ভুল ভোর দেখেছি আমি ! রাইট অ্যাট এইট বস্ এসে চেম্বারে ঢুকে। চেয়ারে বসেই বেল বাজিয়ে দেয়। তারপর ঢাকনা খুলে জলের গ্লাস তুলে নেয় হাতে।

আমাদের রুমটাও বসের চেম্বার থেকে বেশি দূরে নয়। সবসময় অস্বস্তি উসখুস। কারণে অকারণে ডাকাডাকি করে। পার্সনেল কথা নয়। দু'একদিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে। ইদানিং

বসতে বলেন জগদীশদা। টিউশনি করি কিনা জিজ্ঞেস করেন। মা কেমন আছে? বাবা? জুঁই কোন ক্লাশে পড়ে?

ঘরটাতে তিন তিনটা ফ্যান ঘুরছে। সমীর মনীষ ওরা চলে গেলেও ঘুরছে। প্রতি টেবিলে পিন কুষন, পেনস্টেন্ড, পেপারওয়েট ছাড়াও একতাড়া টেলিপ্রিন্টারের কাগজ কেটে রাখা আছে। আরেক কোণে ফিলটার। তার উপর গ্লাসের তলানিতে আয়রণ জমেছে খুব। কয়দিন আগে একটি আর্টিকেলে পড়েছি—ত্রিপুরার জলে গলস্টোন, ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশি। আমাদের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখাও গেছে—এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। ফিলটারের পাশে দুটো কাঠের আলমারি, আরেকটা স্টিলের। তাদের মাথায় উত্তরপূর্বের পুরনো কপি আছে। মাঝে মাঝে বেশি দামে বিক্রি করা হয়।

আবার ঘড়ি দেখে। আজও আউটডোর আছে তার। তবে বস্ একবার ধরতে পারলে রক্ষে নেই—মিনিটে মিনিটে ডেকে পাঠাবে, না হয় হাতে একটার পর একটা স্লিপ ধরিয়ে দেবে। এই কৃষ্ণগুর্খার চোখ দুটি দুষ্টের হাড়ি, মিচকি বান্দর, পান খায় সব সময় এবং চূণের দিকে চোখ রেখে চিবিয়ে কথা বলে। কৃষ্ণকে বাগে আনতে না পারলে মুশকিল আছে।

যাই হউক এই মুহূর্তে কৃষ্ণ নয়—কানাইটাই ডোবাবে বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে জগদীশদা নিজেই চলে আসেন আমাদের ঘরে। সবই তার নাটক। সবাইকে তটস্থ দেখে ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠেন—আবার কী, কথা বলছিলে, বল না! আমিও তো আড্ডা মারতেই এসেছি। মোটমাট শাণিতের এখন টেনশন হচ্ছে। আরেক কাপ চা বানাতে কত সময় কাটানো উচিত?

—কইরে বেটা টিউব লাইট?

—হই গেছে মামা।

—ভাগিনারে ভাগিনা —

তোর বাপের ডরে হাগিনা।

যদি হাগি লুকাইয়া

তোর বাপে খায় তুকাইয়া।

তবু কিন্তু শেষরক্ষা করা গেল না। চায়ে চুমুক দেবার আগেই এসে উপস্থিত হল কৃষ্ণ।

—তুমিও নেবে তো! কানাই আরেক কাপ। বেটাকে বাগে আনতে হবে। বসের ইন্টারনেল এরেঞ্জমেন্টের চাবিকাঠি, যত নষ্টের গোড়া—শালা ফাঁসুড়ে।

—সাহেব আপনাকে ডাকছে।

—যাই। এই ফাঁকে তুমিও একটা কাজ কর ভাই—এক প্যাকেট চারমিনার এনে দাও। বলতে বলতে একখানা দশটাকার নোট বাড়িয়ে দিল তার দিকে—বাকিটা তোমার কাছেই থাকবে, আমি চাইলে দিও। আর শোনো! একটু পরে যাব—ম্যানেজ কর কিন্তু। বড্ড ঘুম পেয়েছে—বলতে বলতেই মাথা ফেলে দিল টেবিলে। চোখ বুজার আগেই দেখে নিল—কৃষ্ণধনের হাতে দশ টাকার নোট, সে সিগারেট আনতে যাচ্ছে—এই যে, ফিরে এসেও একদম ডিসটার্ব করবে না, ড্রয়ারে রেখে দিও।

জগদীশদাকে অবশ্য আমরা একেক জন একেক নামেই ডাকি। তবে সবই কোড ল্যাংগুয়েজে। ইনসাবরডিনেশন একদমই সহ্য করবেন না তিনি। প্রথম প্রথম হেসেই উড়িয়ে দেবেন—আরে না না, ওতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমরা জানি—তলে তলে চোয়াল শক্ত হবে অথচ তার চোখ মুখ দেখে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।

সমীরের মতে তিনি একজন মাফিয়া, পাড়ার গুন্ডা মস্তান থেকে শুরু করে সবাই জগদীশদাকে তোয়াজ করে। আমলাদের আনাগোনা, ইউনিয়ন এসোসিয়েশন করুয়াদের ভিড় লেগে থাকে। তিনি নিজেও ব্যবসায়ী সমিতির একজন হোমড়া চোমড়া।

আগরতলার কলেজটিলাকে আগে ত্রিপুরার মাথা মনে করা হত। জগদীশদা যদিও কোন গুরুত্ব

দিতে চাইতেন না কথাটির। এবং এখন দিনকাল কত বদলে গেছে। এই ইমারজেন্সির বাজারেও পত্র পত্রিকার রমরমা। হাজার হাজার কপি বিলি বিক্রি হচ্ছে। কাজের চাপও বেড়েছে কয়েক গুণ— জগদীশদাই এখন ত্রিপুরার এক নং ইন্টেলেকচুয়েল। আজকাল স্কুল কলেজের অধ্যাপকেরাও অবসর পেলে উত্তর-পূর্বে খবরাখবর লেখেন—চা চানাচুর খেয়ে আড্ডা মারেন বসের সঙ্গে।

কিন্তু রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আর তার দেখা পাওয়া ভার। দরজায় আলো অনবরত জ্বলে নিভে। মাঝে মাঝে পেঁ পেঁ শব্দ এবং টুলের উপর বসে কৃষ্ণ তখনও খৈনী থেকে শুকনো চুন ছাড়ায়। এসময়টা তিনি মন্ত্রী মিনিষ্টারদের নিয়েই থাকেন।

ইদানীং কিছু কিছু উগ্রবদী সংগঠনও এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজনীতিতে জাতীয় দলগুলির ব্যর্থতাই এর কারণ হতে পারে। আমরা যেমন উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রীয় অবজ্ঞা অবহেলার কথা বলি, তেমনি ওরাও বলেন—উপনিবেশবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আমাদের সুস্থিতি বিনষ্ট করতে চায়। রাজ্যে রাজ্যে অসন্তোষের সূত্র ঢুকে পড়ে। অর্থ অস্ত্র সস্ত্র ইত্যাদি জোগায়। অর্থাৎ কার কথা সত্য কার নয় বুঝা বড় মুসকিল! মোদ্দা কথা—শরণার্থী আগমনের ফলেই হউক বা সম্পন্ন উপজাতিদের অপশাসনেই হউক — আদিবাসীরা এখানে কোণঠাসা। দল ভেঙে ভেঙে উগ্রবাদী হয়ে পড়ছেন অনেকে। এমন অনেকগুলি সংগঠনের সঙ্গেই জগদীশদার অর্থাৎ উত্তরপূর্বের যোগাযোগ ভাল। ওদের কর্মসূচী আমাদের পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হল। দু'এক জনের সঙ্গে শাণিতেরও সম্পর্ক আছে। একদিন গভীর রাতে—পালকের টুপি পরা কয়জন নেতার আমন্ত্রণে— পত্রিকা অফিস থেকেই রওয়ানা দিয়েছিল সে কচুয়া রঙের এম্বেসেডারে চড়ে। রীতিমত পুলকিত বোধ করছিল।

রাতের চোখ। কালো কাঁচের জানলা, গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। চালককে দেখা যাচ্ছে না, মাঝে পর্দাটানা। সেখানে পৌঁছে গিয়েও অস্বস্তি। উনারা ত্রিপুরার বিদেশী সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। শাণিতকেও খাতির যত্ন করছিলেন খুব।

ফিরে আসার পর সমীরই তাকে প্রথম প্রশ্ন করেছিল—দাদা ওদের আস্তানাটা কি পাহাড়ে? নাকি বাংলাদেশে? আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি—শুরু থেকেই তো নজর বন্দী ছিলাম!

অর্থাৎ উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আমাদের লেটপেটের কথা সবাই জানে। কিন্তু যে সম্পর্কের কথা সমীরও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না, সন্দেহ প্রকাশ করে কেবল— ত্রিপুরায় তো চোরা-কারবারীরাই সব, ওদের সঙ্গে জগদীশদা ও তার পত্রিকার সম্পর্ক কতটা? কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি—আছে। থাকতে বাধ্য।

তেমনি জগদীশদাকে যারা চেনে, তার নিন্দুকেরও কিন্তু অভাব নেই—ও জগদীশ্যা, এক্কেবারে ফক্কা মাল। বেটা কি করে যে কি করল বুঝতেই পারলাম না তো! হঠাৎ দেখি —তার পাঁচতলা বাড়ি, গাড়ি চাকর বাকর সবই আছে। তিনি নাকি কবিতাও লিখতেন একসময়। এখন যদিও তার অন্য রকম বিচার। ত্রিপুরায় আবার লেখালেখি হয় নাকি? শাণিত —বুঝতে পারে না— এখানকার সাহিত্য কিভাবে জগদীশদা বা তার প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী হল! নাকি বাঘ নাই বনে তিনি শিয়াল রাজা হবেন?

হঠাৎ কেউ বড়লোক হয়ে গেলে— কয়দিন মুখে মুখে খুবই নিন্দা কন্দনা হয় তার। আগে আরো কিছু কথা শুনা যেত—বিধবার সম্পত্তি —বা সরল সোজা কোন মহিলাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ইত্যাদি। জগদীশদা কিভাবে বড়লোক হয়েছেন জানি না, তবে তার বন্ধু বান্ধব কয়জন সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাদেরই একজন হলেন দেবব্রত। ভদ্রলোকের গদ্যলেখার হাত খুব ভাল ছিল। উত্তর পূর্বের যখন দুঃসময় তিনি নাকি বউয়ের গয়না বন্ধক রেখেও জগদীশদাকে সাহায্য করেছিলেন। পরে বস্রে মুখেই শোনা—নীতিগত প্রশ্নে প্রাণের বন্ধুকেও তিনি ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন। আরো বলেছিলেন এই পত্রিকাটি তোমাদেরই, যেমন অভাবে অভিযোগে আছো, থাক। আখেরে—লাভ হবে।

এখন ইমারজিন্সি ! আমাদের জগদীশদা একজন বিপ্লবীও বটে। কয়দিন আগে একটি অবাঞ্ছিত সম্পাদকীয় লেখার জন্যে তার হাজত বাস হয়েছিল। আগরতলার জনতা ১৪৪ ধারা অমান্য করে দাবী জানিয়েছিল—সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলবে না, সম্পাদকের মুক্তি চাই।স্বাভাবিক খুশি হয়েছিলেন জগদীশদা। জেলের ভেতরেও তার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে—তাতেও তিনি খুশি।

হঠাৎ ঢোক গিলতে গিয়েই গলায় খোঁচা লাগল শাণিতের। গেলবার রাজ্য সভার নির্বাচনেও শাসকদলের প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন জগদীশদা—ওরা দিল না। আরেকবার উত্তর পূর্বের প্রেসে স্কুল কলেজের পাঠ্য বই ছাপানোর জন্যেও টেন্ডার দিয়েছিলেন তিনি। প্রায় পচিশ ত্রিশ লাখ টাকার কাজ—আলটিমেটলি এ কাজটিও আমরা পাইনি।

তবে তার কলমের ধার আছে। এছাড়া জগদীশদাকে ভয় পাওয়ার আর কী কারণ থাকতে পারে ? দেখতে শুনতেও তেমন গাট্টাগোট্টা না। তবে সারথির কথা হল—শালার বেটা এক নম্বরের ব্লেকমেইলার। কেউ কি জানে —মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কত কেচ্ছা ছাপা হয় —উত্তর পূর্বে। আর কাকের মাংস কাক খায় না। এক পত্রিকা আরেক পত্রিকার বিরুদ্ধে কিছুই লিখবে না। একমাত্র প্রবীরই পারে জগদীশদাকে ভিন্ন ভিন্ন সম্বোধনে ডাকতে —হ্যালো বস্, হ্যালো কিংমেকার, আর আমাদের সম্পাদক মিঠা মিঠা হসতে থাকেন।

ঘুমের নামে টেবিলে অনেকক্ষণ মাথা ফেলে রাখলেও একটা তীরের ফলা দুই ভুরুর মাঝখানে খোঁচা মারছিল। খাওয়া দাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই, তার উপর এই হাবি জাবি। সবই এসিড হয়ে গেছে মনে হয়। এরকম হলে আগে ইচ্ছে করে বমি করে নিত। এখন সে সুখও গেছে। ভাব করবে অথচ হবে না। তারপর নিজে নিজেই ডাক্তারি—এনজাইম এন্টাসিড কিনে গপ্ গপ্ করে গিলে ফেলবে শাণিত।

এখন আবার গোর্খার ফিরে আসার সময় হয়েছে। অর্থাৎ বসের সঙ্গে নমঃ নমঃ সেরে বেরিয়ে পড়তে হবে দ্রুত। আজ তোলা পাওয়ার দিন। কি জানি ছাড়া পাবে কিনা সে। জগদীশদা একটা কাকড়া বিছা !

গতকালও শাণিত গলি ঘুপচি করে সন্ধ্যা পার করে ফিরেছিল। এমন কি এক সিপ মাল পর্যন্ত টানার সময় হয়নি তার। আর শিশি একটা সারাদিনই ঝোলার মধ্যে ছিল। কর্ক লাগেনি ভাল করে। ছলকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল মদ। এবং মাঝে মাঝে ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তরল শির শির ছোবল নিচ্ছিল সে।

আবার অফিসে ঢোকা মাত্রই, তখনও চেয়ারে গিয়ে বসতে পারেনি—দেখে পুস্-ডোর ঠেলে সেই যমদূত। রাগে দুঃখে চিৎকার করে উঠেছিল—প্রেজেন্ট স্যার। এক মুহূর্ত থতমত থেমে গিয়েছিল কৃষ্ণ। যদিও বসের মত তারও ঠোঁটের কোণে পিচ্ছিল হাসি থাকে। এবং আমি একটি ভেজা বেড়াল—পিছু পিছু যাই, অর্থাৎ আমার থাবা থেকে তখন অপমানের চিহ্ন দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছিল মেঝেতে, এই আবহাওয়ায়।

বসের ঘরের দরজাটা আবার অদ্ভুত—ঠেলা দিতেই কে যেন গলাধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। অর্থাৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। অবশ্য তিনি সব সময়ই চোখবুজে থাকেন বা আমার যাবতীয় দুর্বলতারই খবর রাখেন হয়ত। গতকাল সন্ধ্যায়ও তেমনি ঠোটের কোণে অশ্লীলতা ছিল। আরেক কোণায় বসেছিল প্রবীর।

তারপর রাতের কয়েক ঘন্টা বাদ দিলে, আজ এই সকাল বেলাতেও সে বসের সামনে বসে আছে—টেবিলে হাত, আঙুলে আঙুলে লক করে—প্রবীরটা কি রাতেও ঘুমায় না নাকি ? যাইহউক, এখন নাটক করছেন আসলে জগদীশদা। গতকাল হয়ত তারও ঘুম হয়নি। রিভলভিং চেয়ার এপাশ ওপাশ দুলছে—তবু তোমার মনে হবে তিনি চিন্তা দুশ্চিন্তার ভাণ করে —আসলে ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন একচোট। আর শাণিত কোন রিস্ক নিতে চায় না। প্রবীরও এখন তার দিকে তাকাচ্ছে

না। কারণ জগদীশদা ভীষণ সন্দেহবাতিক। এবার তিনি চোখ বুজেই শাণিতকে বসতে ইশারা করলেন। উপরে ঘুরছে ফ্যান। একজষ্ট দুটি অচিরেই মাকড়সার ঘরবাড়ি হয়ে যাবে! দুই পায়ে নরম কার্পেট চেপে দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগছে না। কিন্তু কোন উপায় নেই অস্বস্তি হলেও বসতে হবে।

প্রবীর শাণিতকে দুইচোখে দেখতে পারে না। সবসময় তুলনা করে। আমি হলাম গিয়ে হার্ডকোর জার্ণালিষ্ট। আমার কাছে বেকাতেরা কিছু নেই। নো চান্স ওফ এম্বিগিউটি।

প্রবীরের বিরুদ্ধে শাণিতের অভিযোগ অন্যত্র। ছেলেটা এত গর্ব করে বলে কিভাবে—আমি বাংলা জানি না। তবু সে স্মার্ট এটা মানতে হবে, বা হয়ত তার ইংরেজি জ্ঞান, আদব কায়দা দিয়েই বাঙ্গালীর ভীরুতা চেপে যায়। খবরের কাগজে এমন লোক দরকার। অবাঙ্গালী সুলভ লম্বাচওড়া, চেপ্টা মুখ এবং ম্যানলি। নিজেকে সবসময়ই একজন আবেগ বর্জিত মানুষ বলে প্রচার করে। এটা ফাঁকি। আর একখান গলা বটে আমার বন্ধুর—যাকে বলে বাঁজখাই! তার পতনও হবে এজন্যেই! এমন কি জগদীশদা পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাকে সাব-সাইড করতে পারেন না।

আর যার তার সঙ্গে যখন তখন গায়ে পড়ে ঝগড়া করে প্রবীর। আমি পারি না—আমার সবসময় মনে হয়—সে ঠিক, শাণিত বেঠিক। ওর কথাগুলি যেন ঝড়—যত মিছিমিছি সৌধ আমার সবই ধ্বসে পড়ে। হে প্রভুরা—আমাকে বাঁচতে হবে তো! আমি বিরোধী রাজনীতি, ইউনিয়ন এসোসিয়েশন থেকে অনেক কিছুই শিখে নিয়েছি।

বন্ধু সারথি প্রথম যেদিন জগদীশদার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে—দাদা বলেছিলাম যে শাণিত সেনগুপ্ত! সেদিনও শালা প্রবীর বসেছিল বসে্র সামনে। একটি নীল কাঁচের জানালা চিঁড়ে রোদ এসে পড়েছিল তার মুখে।

—তোমাকে ভীষণ চেনা চেনা লাগছে! আগেও কোনদিন এসেছিলে নাকি ?

— না দাদা।

তারপর জগদীশদা আমাকে বসতে ইশারা করলেন। আমি থুকুনুকু করছি, আমার জোড়হাত ভাঙিনি তখনও, সারথি আরেকবার পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি প্রবীর। একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিনিধি, আমাদের উত্তরপূর্বের সঙ্গেও যুক্ত।

সে হয়ত আগেই দেখে নিয়েছিল আমাকে। আর ফিরে তাকাল না। তখন যত না অস্বস্তি, তারচে সারথির কথাই মজা লাগছিল ভীষণ। সে যদিও কথায় কথায় বলে —আমি লোমের রাজকুমার! তবু এই হাতজোড় করে কেবলার মত দাঁড়িয়ে থাকা সারথি মেনে নিচ্ছে না আমি জানি। হঠাৎই হ্যাঁচকা টান মেরে প্রবীরের পাশে বসিয়ে দিল আমাকে। তারপর নিজেও গেটছে বসল।

— তোমার লেখা গদ্য পড়েছি শাণিত। সারথি দিয়েছিল। ভালই তো। তবে আমাদের কাজটা অন্যরকম। একেবারে কাঠখোট্রা। অবশ্য অস্তিমজ্জাও জুড়তে হয় মাঝে মাঝে—তুমি পারবে তো?

শাণিত ঘাড় কাৎ করে এবং একই সঙ্গে গম গম করে উঠে প্রবীর —ফালতু চীজ! জগদীশদার চোখেও দেখি দুষ্টুমি—

— হাবিজাবি যত কবি সাহিত্যকরাই—আমাদের দেশে পত্রিকার মান এত নিচে নামিয়ে দিয়েছে। কী সব ছাই পাশ লিখে! আরে বাবা—খবরের কাগজে কাজ করে যদি পয়সা রোজগার করতেই হয় কড়চা, রবিবারের পাতা ইত্যাদি খুব করগে যাও।

সারথি আমাকে একদিন বলেছিল—ত্রিপুরা রাজ্যে দুইজন মাত্র পাশ করা জার্ণালিষ্ট। — একজন উত্তর পূর্বের জগদীশ, আরেকজন এই প্রবীর। কিন্তু এখন আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন। তুমি গাছের গুড়ি কেটে নিচ্ছ আর আমি একইরকম বসে থাকব আলগোছ, ঝড়ো বাতাসের অপেক্ষা করতে থাকব—তা হয় না।

—আপনার কথা মানি না প্রবীর। জবর জবর খবর জোগাড় করলেই কেবল চলে না। উপযুক্ত

পরিবেশনাও দরকার। এফেকটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ চাই। আমি অবশ্য আপনার বাংলা লেখা কখনও পড়িনি।

—নো — আই ডোন্ট লাইক ইট।

— এজন্যেই বলছি—আমার প্রয়োজন আছে।

হা হা করে হেসে উঠছিলেন জগদীশদা। হাসতে হাসতেই আদেশ করেছিলেন—স্টপ ইট। তুমি কাল থেকেই চলে এস শাণিত। আর দমকা হাওয়া যেন বইছিল ঘরে। তবু প্রবীরের দিকে আমি ফিরে তাকাইনি। কারণ আমার বাঁচার প্রশ্নটাই তখন বড়—ওকে আঘাত করা নয়।

প্রফেসনাল বন্ধু বন্ধু শত্রু শত্রু। আজ এই সকাল বেলায়ও সে বসে রয়েছে। একই ভাবে চোখ বুজে আছেন জগদীশদা। তবু নিজেদের মধ্যে আমরা কোন কথা বলছি না। অনেকগুলি নিকোটিন রঙের আঙ্গুল দেখছি শুধু।

—বাবুজী। দল ছেড়ে দিচ্ছি দিলাম করে করে যত ক্ষতি করছেন, সারাদেশ ঘুরে বিরোধীরা তত পারছেন না কিন্তু ?

—কারণ হল ৭০/৭৫ জন অনুগামী এম পি-ও আছেন তার পেছনে।

—ঠিক আছে—তুমি তাই লিখ। আর শাণিত শোনো—কেলেংকারি টেলেংকারি কিছু একটা অ্যাঙ্কোর করা দরকার।

সময়ের সদব্যবহার করল প্রবীরও—আমার কাছে অনেক ম্যাটার আছে—লাগলে নিও।

— নো থ্যাঙ্কস্। করিডোরে পা দিয়েই, তখনও প্রবীর বেরিয়ে আসেনি, শাণিত শব্দ করে উঠল—মচকাব না বন্ধু, মরে গেলেও না।

আবার সেই আধা-সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ফিরে উরুতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কতসময়। আজও কি দিন রাত দুটোই মাটি হবে? বাড়ি ফেরা হবে না তার? ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ে। গলা কাটা মাথা টেবিলে ফেলে রাখে—লোমের চাকবি না করলে কী !

তারপর জলে ডুবে বুরবুরি ফুরিয়ে গেলে এইবার ঘামতে শুরু করে শাণিত। কাল মা কেন জুঁইকে নিয়ে এখানে এসেছিল ! লাখ্ মানা কবলেও শোনে না। আমি কি কচি খোকা ! জগদীশদা মা ওদেরে তার চেম্বারে নিয়ে গিয়ে চা মিষ্টি খাইয়ে ছেড়েছে।

তুমি এতই পুতুরপুতুর মা – একবেলা ছেলেকে না দেখে থাকতে পার না—গরু খুঁজতে বেরিয়ে গেছ ! জুঁইকে নিয়েছ কেন সঙ্গে ? আর জগদীশ্যা—তোর মূলা কুচি কুচি করে সেলাড খাবরে শালা !

টেবিলে একদিকে মাথা গুঁজে রেখেছে শাণিত আরেক দিকে ডায়রীর পাতা ফ্যানের বাতাসে ফরফর করছে। গাঁজাখুরি গপ্পো—যত কেচ্ছা কাহিনী আব কত ! তবুও লিখতে হবে।এখানে কর্তা ইচ্ছা কর্ম—সর্বত্রই তো !

এই মুহূর্তে বস্ যাদের প্রতি রুষ্ট—সেই সব নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী—সবাইকেই এখন কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করাল শাণিত। এদের মধ্যে একজন আমলার নারীঘটিত কেলেংকারীর জের হল কলকাতায় ট্রামের নিচে পড়ে এক যুবতীর আত্মহত্যা। ধূস্ শালা—এসবে চিড়ে ভিজে না আজকাল। এমনকি ধর্ষণের খবরও খবর নয়—যদি না ডিটেইলস্ থাকে। মনে মনে ডায়রীর পাতা উল্টাতে থাকে। একজন ডাকসাইটে নেতার বি এ পাশ সার্টিফিকেট জাল। কাজটা সেআগেই করে রেখেছিল। আরেকবার চেক করে কম্পোজে দিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু মুসকিল হয়েছে তখন সাধ্যসাধনা করেও যাকে পাওয়া যায়নি—সেই ঘুম ভারি পাথর দুই চোখের পাতা চেপে রেখেছে এখন। ঘুমের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠারও স্বভাব আছে তার। জুঁইকে নিয়ে মা পত্রিকা অপিসে এসে ভাল করেনি ! দেখতে দেখতে মেয়েটা লম্বা হয়ে গেল, চ্যাপ্টা, গোল। এখন আবার কে পুসডোর ঠেলছে ?

—চা হয়ে গেছে মামা।

সঙ্গে সঙ্গে কুক্কু পাখীটাও ঘর ছেড়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। গুণে গুণে ডেকে উঠল নয়বার। তারপর ঘরে ঢুকে আবার ঠাস্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। আমাদের কানাইটাও কি এই দৃশ্যে উপস্থিত ছিল ? আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

—ভাগিনা রে ভাগিনা !

পুসডোরটা বার বার শব্দ করতে লাগল। আমি ঘুমিয়ে রয়েছি দেখে হয়ত ফিরেই গেল কানাই। আর এক কাপ চায়ের জন্যে হায় হায় ! মশা মাছিও ডিসটার্ব করছে এখন। এই রুমটা ঠিক নালার পাশে। শাণিতের হাতগুলি একবার নাকে, একবার কানে—এতক্ষণ এই চলছে। হঠাৎই শূন্যের মধ্যে খপ্ করে ধরে ফেলে বিষ্ঠা মাছি।

যেন একঘর কাঁচের চুড়ি চূণ চূণ শব্দে অনেকক্ষণ ধরে ভাঙছে। ঝড়ো হাওয়া অথচ গমকে গমকে হাসছে মুনিয়া ঝাড়ুদারনী। অন্ধকারের কী এত রূপ ! তার উপর সস্তা জড়ির কাজ করা ব্লাউজ পরেছে। মুনিয়ার তোড়ের মুখে এখন সবই তুচ্ছ। আরেকবার আড়মোড়া ভাঙলেই তো আমি শেষ। হঠাৎ দেখি তার হাতে একটি মাছরাঙা পাখির পালক লুকিয়ে রেখেছে—

—শালী আমি বনেদি কাইত, তুই মেথরানী। —আমার সঙ্গে দিল্লাগি করতে আসিস কোন সাহসে ? লাথি দেব নাকি একটা !

ঝট্ করে থেমে যায় মুনিয়া । মেঝে থেকে শলার ঝাড়ুটা তুলে নেয়। নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় পুসডোর ঠেলে—

তেরো

অতসীর অসুখের সময়ই আনা হয়েছিল ওয়েলক্লথটা। একদিক সবুজ আরেকদিক লাল। বেশ ভারি ডাক্‌বেগের। আমরা যাকে বলি পানিকাপড়। বাহ্যি পেচ্ছাব সবই তখন বিছানায় করতে হয়। আর ছেলেটা চিরদিনই নিষ্কর্মার ঢেঁকি। তার গদাই লস্করি দেখলে তোমার পিত্তি জ্বলে যাবে। সারাদিন কাজ করলেও মনে হবে কিছুই করেনি।

তবে আমরা বুড়ো হয়েছি—প্রতিটা জিনিষ সেই আদ্যিকালের দৃষ্টি দিয়ে দেখি। স্বাভাবিক ভুল ভ্রান্তিও হয়। একদিন অতসী আমাকে বলেছিল—নাগো, আমাদের ছেলেটা হল হাঁসের মত। আমরা যারা খুবই কর্মঠ জাহির করি নিজেকে—সারাদিন কাজ করি, সেইসঙ্গে কাজের ধকলও ধরে রাখতে ভালবাসি। শানুটা কিন্তু সেরকম নয়। আগবাড়িয়ে কিছু করে না ঠিকই। তাছাড়া করবেই বা কি? হাট বাজার তুমি কর। রান্না বান্না করি আমি। বরুণের মা আছে। টুকটাক ঘর সাজিয়ে রাখে জুঁই। আর কি চাই তোমার? তবে দরকারে সব পারে। কেবল কামলা কামলা ভাবধরে থাকে না বলে — তোমরা আমার ছেলেটাকে বল নিষ্কর্মা। নিজে কিতা — কোনদিন ভাইব্যা দেখছোনি ?

দিব্যেন্দু আবারও জিব কাটলেন। আমি হলাম গিয়ে বাউলা পাবলিক—আমার সঙ্গে কী তুলনা ! সত্যি কথা বলতে কি ঘর সংসার করাই আমার পোষায় না। তরুণ বয়সে একবার যাত্রাগানের নেশায় পেয়েছিল। সেখানে গিয়েও দেখলাম—একই ব্যাপার। সব সহঅভিনেতাই মনে মনে নায়িকার প্রেমে পড়ে। আরেকবার এক আখড়ায় ক'দিন কাটিয়েছিলাম মোহন্তদের সঙ্গে। কুটিরে তিন বৈরাগীনি আর গোঁসাই সহ আমরা তিন বৈরাগী। যথারীতি সন্দেহ হল—এখানেও কি মোক্ষ লাভ হবে? সেবাদাসীরা রোজই আমাদেরে কয় সিঁড়ি উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করতেন। দোতারায় বাজাতেন কৃষ্ণলোকের সুর। আর আমরা রোজই তাদেরে নিশুতি প্রভুর পায়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে আসতাম। আমাদের গোঁসাই গান করতেন না, পান খেতেন এবং সারা শরীরে তার জিহ্বা চিহ্ন মোটা মোটা তিলক ছিল। তারপর চরণ শীতল করে জল খেতাম আমরা। এখনও উদগার আসে। আসলে আমি হলাম গিয়ে ফড়িং শ্রেণীর মানুষ। কোন খানেই মন বসে না আমার। আবার সব খানেই ঠোকর মারা স্বভাব। এমনকি রাজনীতি করুয়াদের তল্পিও বহন করেছি কিছুদিন।

কিন্তু আমার ছেলে তেমন নয়। সময়ের দোষ। এখন আর এগিয়ে রাজনীতি করার দিন নেই। রাহুটাই গ্রাস করে ফেলে। শানুর চাকরি গেল। তারও আগে থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর খুব ছাপা হত পত্রিকায়। একদিন ইমার্জেন্সি জারি হয়ে গেল সারাদেশে। তখন ফিসফিস করে কথা বলাও বারণ ছিল। অকারণে পক্ষে বিপক্ষে ভাগাভাগি হয়ে গেল মানুষ। আমরা শুধু ছিপি বন্ধ শূন্য বোতলের মত একপ্লাশে পড়ে রইলাম। একাত্তর সালের যুদ্ধের সময়ও এভাবে চোখ কান বন্ধ করে পড়েছিলাম। আর অপেক্ষা করছিলাম শুধু। তেমনি ইমারজেন্সিও উঠে গেল একদিন। দেশে সাধারণ নির্বাচন হল । একটি নুতন রাজনৈতিক দল ভারতের ক্ষমতা দখল করেও শেষরক্ষা করতে পারল না। নিজেদের মধ্যে গদি নিয়ে খেয়োখেয়ি করে ক্ষমতা তোলে দিল সেই কংগ্রেসের হাতে। আমার ছেলেটা কি আর চাকরি ফিরে পাবে ?

তার মায়ের অসুখের সময় ওই ওয়েলক্লথটা কিনে এনেছিল সে। আর আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম কিভাবে মায়ের বাহ্যি পেচ্ছাব ঘন ঘন পরিষ্কার করছিল শানু। প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম হার্ট এ্যাটাক হয়েছে অতসীর। পরে বুঝেছি মৃগীরোগ। দুঃসময় যখন আসে, একের পিঠে চড়ে আসে আরেক। তার অসুখ ধরা পড়ার কয়দিন আগে থেকেই খুব টেনশনে ছিলাম আমরা। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দরখাস্ত বিচার বিবেচনা শেষ হয়েছে সবে। তদন্তের কাজও শেষ। এবার ফল বের হবে। তাছাড়া পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে—যাদের দাবি সঠিক নয়

বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে—আইন অনুসারে তাদের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা দুইই ভোগ করতে হবে। সেই লালচে বাদামি রঙের ওয়েল ক্লথটাকে এখন একটা বালিশের উপর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। চিং হয়ে শুয়ে সেখানেই মাথা রেখেছে শানু। বুকের নিচ মাথার নিচ হয়ে প্রপাতের মত বাকি ক্লথ গিয়ে ঢুকেছে একটা বালতির মধ্যে। আর মোড়ায় বসে অতসী ধনুর মত শানুর গলায় গামছা ভাজ করে দিচ্ছে।কান ঢেকে দিচ্ছে। যেন বহুদিন পর গর্তে পড়েছে মত্ত হাতি। গত দেড় দুই বছরের মধ্যে কদিন বাড়িতে থেকেছে কড়ে গুনে বলা যাবে। জুঁইকে জিজ্ঞেস করলেই হয়। মুখস্ত। আমাদের পারিবারিক অভ্যাসটাই বদলে দিল শানু। আগে কেউ বাকি থাকলে গিন্নিও বসে থাকত না খেয়ে। শেষমেষ মেয়েটার চেষ্টাতেই এখন আমরা কেউ কারো অপেক্ষায় থাকি না। বুড়ি হাল ছেড়েছে। তবে ঝাল ঝাড়ে আমার উপর। অকথা কুকথা গালাগাল করে। আমি কেন কিছুই রেখে যেতে পারিনি সন্তানাদির জন্যে। তাহলে নাকি ছেলেটা এভাবে বখে যেত না।

সুন্দর কথা! সত্যি কথা! আমি কাজের মানুষ হই আর না হই, দেশ ভাগ না হলেই তো চলত। ভাল মত চলে যেত ছোট্ট সংসার। তিন ফসলা জমি, অজস্র গাছ গাছালি, কতগুলি ডোবা পুকুর।

যাই হউক গত পরশুদিন রাত এগারটা বারোটা হবে এমন সময় আমরা শুয়ে পড়েছি তাও ঘন্টা দেড় দুই হবে, দরজায় টোকা শুনে আমিই গিয়ে খুলে দিলাম। শানুও জানে আমার রাত জেগে থাকার কথা। সঙ্গে আরো দুইজন এসেছিল পত্রিকা অফিসের গাড়ি করে। দাঁড়াতে পারছে না অপরিণামদর্শী। কপালে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। একজন শুধু বলল—অনিয়মের মধ্যে, গরম পড়েছে তো খুব, বরফে জমা কোল্ডড্রিংকস খেয়েছে। আরেকজন বলল—কাশি হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম সঙ্গে পেটও খারাপ নাকি?

— না।

এখন জগ দিয়ে ক্রমাগত জল ঢালছে অতসী শানুর মাথায়। চুলের গোড়ায় গোড়ায় আটকে ফুলে ফুলে উঠছে—সবই মায়ের মমতা যেন। ছেলেটাও কত শান্তিতে ঘুমাচ্ছে এখন।ডাক্তারের কথামত আজই তার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার কথা ছিল। কেবল দুর্বলতা থাকবে। বাড়িতে বিশ্রাম নিতে হবে ক'দিন। আর অষুধ লাগবে না।

এতক্ষণ দিব্যেন্দুবাবু আসলে ছেলেকে দেখছিলেন না। দেখছিলেন তার মাকে। আবার ছেলেকেও দেখছিলেন। ওর মধ্যে আগের টেনশন নেই কেন? তার বাল্যকাল, চাকরি পাওয়ার আগে পরে সবসময়ই লক্ষ্য করেছেন দিব্যেন্দু, মাত্র ক'দিন ধরে দেখছি সেই ভাবখানা নেই। অথচ নিরাপত্তার অভাব তো এখন বেশী হওয়ার কথা। সরকারী চাকরি চলে গেছে। প্রাইভেট কনসার্নে মালিকের ইচ্ছা অনিচ্ছাই সব। তাছাড়া মুখের মধ্যে আগের কমনীয়তা নমনীয়তা নেই। কাঠখোট্টা। আসলে সংবেদনশীলতা কমে যাওয়ার অর্থ চামড়া ভারি হওয়া। রেখাপাত করে কম।

আগে দেখেছি ছোট ছোট সুখ দুঃখে কেঁপে উঠত ছেলেটা। তার চোখের নিচে চামড়ায় ক্ষুদে শিরা উপশিরাগুলিও দপ্‌দপ্‌ করে উঠত। আর আমরা মা বাবা এসব দেখে চিন্তিত হতাম যেমন মজাও লাগত খুব। সেই ছেলেএখন কী নির্বিকার! শক্ত চোয়াল।কোন কিছুতেই ঘাবড়ায় না। আগে যেমন কথায় কথায় আশ্চর্য হত, এখন সে বাতিকও নেই। সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। জন্ম মৃত্যু সব। এই গুমট পরিবেশে অতসীর কি মনে হয় জানি না— আমার তো বড় ভয় করে। এত নিশ্চিন্তি এল কোথা থেকে? আগরতলার মত জায়গায় একটা পত্রিকা অফিস আর কত টাকা দিতে পারে? সারা জীবনই তো শুনলাম পত্রিকা অফিসগুলি কর্মচারীদের নিংড়ে নেয়। দেয় খুব কম। তাহলে আর কি কাজ করে শানু? এত টাকা পায় কোথা থেকে?

আমি কি রত্নাকরের বাবা? ওর পাপকাজে কি আমার অদৃশ্য হাত নেই? আদ্যিকালের বিচার বদলাতে হবে। শানু জুঁই ওরা আবার আমাকেই শুনিয়ে বলে বাতিলের মূল্যবোধ। যাই হউক কদিন ধরে এ সংসারে ঝলমলি লক্ষ্য করি আমি এবং নূতন একটি উপসর্গ হয়েছে আমার আমাশয়।

মাঝে মাঝে পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তারপর চোরা ঘাম ঝরে, টের পাই। কী করব আর! কত অষুধ খাব? অর্থব।

এখন এই ইজিচেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে। এটা শাণিত সেনগুপ্তের বাড়ি। ইণ্ডিয়ায় এই প্রথম আমাদের পারমানেন্ট এড্রেস হল। জাঁকজমকপূর্ণ গৃহপ্রবেশের পর অন্তত ত্রিশটি চিঠি লিখেছি আমার আত্মীয় স্বজনকে। লালকালি, কালো কালি দুটোই ব্যবহার করেছি। সেই অনুষ্ঠানের দিন অবশ্য পত্রিকা অপিসের লোকজনই বেশি নিমন্ত্রিত ছিল। শিলচর করিমগঞ্জ থেকেও তার বন্ধু বান্ধবী আসার কথা ছিল। তবে সময়াভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বান্ধবী আবার কী! যতসব নষ্টামি! নিকট আত্মীয় ছাড়া নারী পুরুষে তো একই সম্পর্ক— লোহা চুম্বকের। যদি বল— হেঁ তাই তো। তাতে কী হয়েছে! তাহলে আমাব কিছু বলার নেই। শৃঙ্খলা বলতে একটা ব্যাপার আছে। যৌন রোগ আরেকটা। আন্দামানের জারুয়ারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। নুতন জন্ম নেই। যারা বেঁচে আছে সবাই রোগী।

সেদিন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এ জি অপিসের অনুপ ছাড়া আর কেউ ছিল না। এটা ভাল লাগেনি। এসোসিয়েশনের হোমরা চোমরা বাদ দিয়েছিস, ঠিক করেছিস। ওরা সর্বনাশ করেছে। কিন্তু অন্য সহকর্মীরাতো মাসে মাসে চাঁদা তুলে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল আমাদের। তাছাড়া তুই আর চাকরি ফিরে পাবিনা, আমি এখনও ভাবতে পারি না রে শানু!

সেদিন বিদঘুটে বিদঘুটে আরো কিছু লোকজন এসেছিল। আমার তো চেনার কথা নয়। কেউ পরিচয়ও করিয়ে দেয় না কোনদিন। বাতিল মানুষ।

একটু জোরেই হেসে ফেল্লেন দিব্যেন্দু। জিব কাটলেন। ওরাও কাজ করছিল। যে যার অবস্থান থেকেই দেখল আমাকে। একটি অরিজিনেল ভ্রুকুটি। বাকি দুটি কার্বন কপি। আর আমি আমার ভীমরতি দেখলাম।

সেদিন আমিও বলেছিলাম ওকে—তোর পত্রিকা অপিসের লোকগুলো অসভ্য। তৎক্ষণাৎ রুখে দাঁড়িয়েছিল শানু। অনুষ্ঠানের দিন যে পোষাক পড়েছিল তার নাম নাকি সাফারি। সঙ্গে বাদামি চিক্ চিক্ বুটজুতা। দাড়িগোঁফ একবারে কামিয়ে ফেল্লে মাকুন্দা লাগে ওকে। কটমট করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। হাসি চাপতে পারছিলাম না আমি। সেও বলেনি কিছু। তবু দুঃখ হল —আমি যেন ওদের গলার কাঁটা।

কত নুতন নুতন ফ্যাশন হয়েছে আজকাল। কেথাও খাবার দাবার ব্যবস্থা হলে, শেষে সরবৎ কোল্ডড্রিংকস না হয় আইসক্রিম খেতে হবে। অবশ্য আমি তো কোথাও যাই টাই না। সবই জুঁইয়ের মুখে শোনা বা ওরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। বাড়ি ঘরে কোন অনুষ্ঠান হলে আমি ভিতর ঘরে বসে থাকি। সেজেগুজে থাকলেও নাকি চেহারা থেকে আমার দৈন্যদশা ঘুচে না। অথচ বিয়ের পর শাশুড়ি ঠাক্‌রাণের মুখেই শুনেছিলাম আমার আনবান নাকি রাজপুত্রের মত। ওঘরে বসে বসেই তো সেদিন শুনেছিলাম খিলখিল হাসি। গ্লাস বোতলের টুংটাং। থ্রি চিয়ার্স।

আবার মুখ গুমড়া দেখলেও ওরা ছাড়বে না তোমাকে। রাগ করেছ কেন বলতে হবে। এঘরে ওঘরে উঁকিঝুকি দিতে হবে। তবে আনস্মার্ট কোন কথা বলতে পারবে না, সেকেলে সেকেলে। কী যে বিপদে পড়েছি!

এই যেমন ইজিচেয়ারে বসে আছি এখন। আদেশ আছে। নাহলে মন খারাপ বুঝা যাবে। — - নিজে তো কোনদিনই কিছু করে দেখাতে পারলে না। এখন আমাদের মুখে স্বস্তির ছায়া সহ্য হচ্ছে না তোমার। হিংসুটে। —ঠিক আছে বাবা ঝগড়াঝাটির দরকার নেই। চুপচাপ বসে থাকি সভাসুন্দর বা আমি তোমাদের দুঃসময়ের স্মৃতি, আমাকে দেখলেও নাকি সুখ আরো আরো অনুভুত হয়।

হতে পারে। ঠিকই বলে ওরা—আমি কিছুই করতে পারিনি। আমাদের সময়টাই আসলে ঢিলেঢালা ছিল। আরো বেশি প্রাকৃত। তখন সামন্ত প্রভু ছাড়া কথা বলতে পারতো না কেউ।

প্রতিবাদ করবে কে ? শহুরে বিপ্লব, সংগ্রাম ওসব পাড়াগাঁয়ে ছিল না। নাপিতবাড়ি ধোপাবাড়ি ছিল।সব বাড়িরই পথ গিয়ে শেষ হত বড়বাড়ির দরবারে। অনেকে কাছারিও বলত। গ্রামের যত বিচার সেরে ফেলা হত এখানেই। আর আমার দাদুকে ডিঙিয়ে অর্থাৎ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইত যদি কেউ সহরের কোর্টে—তার দফা রফা শেষ।

সময়টা ছিল কাকাবাবু এবং পিসীমাদেরও । আজকের ছেলেমেয়েরা সেসব চিন্তাই করতে পারবে না। সেই অর্থে কাকাবাবুরা কোনদিন উপার্জন করেননি কিন্তু সবকিছু দেখাশুনার দায়িত্ব থাকত তাদের উপরই। বাল্য বিধবা পিসীমাদের জন্যেই তখনও হেসেলে নিরামিষের দাপট ছিল সমান তালে। তেমনই এক পরিবারের ছেলে আমি। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি—একগ্লাস জল ভরে খেতে গেলেও নাকি কলসি মারা পড়ে আমার হাতে। শানুটাকেও সবাই বলে-–'বাপ কা বেটা, সিপাই কা ঘোড়া। কুছ নেহি তো, থোরা থোরা।'

আরো কথা আছে। স্বর্ণলঙ্কা যদি বা রূপকথা হয়, সোনার বাংলা কোন কল্পনা নয়। ত্রিপুরায় যেমন একধরনের সচেতক শুকনো বাতাস আছে—মাঝে মাঝে গা পুড়িয়ে জীবন চিনিয়ে যায় — পূর্ব-বাংলায় তেমন নয়। ভুলভ্রান্তিও বেশী হয় সেখানে। সরস কৌতুক আবেগ প্রবণতা সবই বেশি বেশি। সব বাতাসই শীতল জল বহন করে। পৃথিবীতে এত সূর্যালোক এত ছায়া একসাথে কোথায় পাবে? যেদিকে চোখ যাবে শুধুই সাগরের ঢেউ । কেউ দূর থেকে ডাকে। কেউ হাতছানি দেয়। কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে কোলের কাছে। শ'য়ে শ'য়ে নদনদী যেন দরদী পাড়া পড়শী। এত টাপুর টুপুর শব্দ । মেঘ গুড় গুড়। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। তারপর রামধনু উঠবে। সোনাব রঙে সোনার জলে ছেয়ে যাবে বাংলাদেশ। সারাদিন নাকি ঝি ঝি ডেকে ডেকে অতিরিক্ত সূর্যতাপ পান করে। ফলে সন্ধ্যায় চাঁদ স্নিগ্ধ হয়। আবার ম্রিয়মান হলে জ্বলে উঠে জোনাকি। তারপর বাংলাদেশের মাটি—আমি বাজি ধরতে পারি— আমি তো জিহ্বা দিয়েও চেটে দেখেছি কী সুস্বাদু ! এত উর্বরা !

তারমধ্যে ক্ষতস্থানটি আমরা চিনতে পেরেছি অনেক পরে। এত দেরি হযে গেছে যে! দুই তিনশ বছরের বাড়ি ঘরে চৌকাঠে কড়িবর্গায় ঘূণ ধরেনি বলে যে গর্ব ! মেহগনি কাঠের আসবাব পত্রগুলি এমনিতেই পোকায় কাটে না। আর দাদুর হাতে পেতলের গোলবাট ছড়িটাকে দিন কে দিন চক্ চক্ করতে দেখেছি। বাড়ির ত্রিসীমানায় সামান্য শব্দ হলেও তার অজস্র প্রতিধ্বনি হত। তবু পাহারাদারদের লাঠির ঠক্ঠক্ আমাদের বুকে সাহস জোগাতে পাবেনি। ছেলেবেলায় নিজেদের মধ্যে হাসি কান্না কম ছিল না তবু গ্রামবাসীদের কান্না কখনই শুনিনি বলে অস্বস্তিও ছিল।

এবং চিন্তা করে দেখলাম—ধর্ম্ম আমাদের যত ক্ষতি করল, লাভ তারচে অনেক কম। যতদিন সে শিক্ষাগুরুর কাজ করেছে ততদিন আমরা তার পরম ভক্ত ছিলাম। আর নিজেও জানতো না হয়ত, আমার দাদুর মত একদিন তারও জমিদারি চলে যাবে। ফলে কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্যেই এখনও হানাহানি হয়। ধ্বংসের বীজ পুঁতে রেখেছিল দাদু বাবা আর যত সামন্ত প্রভুরা। তবুও মন্থনের সময় অমৃত পেলনা নর নারায়ণ । তাদের হাত থেকে কুম্ভ কেড়ে নিয়েছিল এই ভেদবুদ্ধি ধর্ম্ম। এবং একই যাদুদণ্ডে আমাদেরে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান বানিয়ে দিল।

দিব্যেন্দু হাসছেনও ভাবছেনও। সেই মহাবলী কিন্তু অনেকদিন ধরেই রাজনীতিকরুয়াদের তল্পি বহন করেন। আমার মত তিনিও আদর্শের দিক থেকে নিঃস্ব।

বাইরে কোথাও ধোঁয়া দেখা গেলে আমাদের বাংলাদেশী মন। আজও পোকার মত ছোটে—দাউ দাউ আগুন নয়ত? তখন সশব্দ এরোপ্লেন দেখার মত বা ভুচাল এলে ঘরে বসে থাকার নিয়ম নেই। পড়িমরি উঠোনে নেমে আসতাম আমি আর অতসী। ভয়ে এমনও হয়েছে ওর সঙ্গে উলুধ্বনি দিতে শুরু করেছি। তারপর দুজনেই বলাবলি করতাম—কুমারপাড়া পূবে নয়, জংগল পার হয়ে পশ্চিমে। পৌষের ভোরে ভেড়াভেড়িও নয়। তাহলে চর্তুদিকে এত ধোঁয়া কেন? আরেকদিন অমাবস্যার রাতে অনেক দূরে যদিও—বহুমুখী আগুন লক্ষ্য করলাম লক্ লক্

করছে।

ফলে আমি ফুলবাবু তো ইণ্ডিয়ায় এসে একেবারে জলে পড়ে গেলাম। কিছু করে খেতে হবে কোনদিন ভাবিনি। বিয়ে শাদি করেছি। বৌয়ের পেটে বাচ্চাও এসেছে যথারীতি। দেশ বাড়িতে সবই মুসকিল আসান ছিল। এখন কি করব?

খালি চোখে সব কিছু ঝাপসা লাগে! অতসীর হাতে এটা নিশ্চয়ই গামছা। তারপর দুই হাতে চোখ দুইটা ঘসে নিলেন দিব্যেন্দু। জল ঝেরে ফেলার শব্দ করলেন অতসী। যেন আমার শরীর থেকেও তন্দ্রা ঝেরে ফেলে দিল সে। জীবনের এই আরেক পর্যায়। বেশির ভাগ বুড়োদের থাকে শুধু বিছানা। আমার একখানা আরাম কেদারাও আছে। তবে জেগে বসে থাকলে বুড়োবুড়িকে আসলে বিমর্ষ করে বর্তমান। তাই যতটা পারি স্মৃতির ছায়ায় তন্দ্রাচ্ছন্নতায় থাকার চেষ্ট করি। পরিবারের আগোচরে আজকাল এভাবেই শুধু আমার ভাল থাকা।

শানুটাই উঠে বসেছে এখন। অতসী তার জুলফি, চুলের বাবরি থেকে অতিরিক্ত জল মুছে দিচ্ছে। পান চিবোচ্ছে সারাক্ষণ। মনে হয় কিছু একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ওর। এযাবৎ যত অতৃপ্তি ছিল সে কি একসঙ্গে সব উসল করে ফেলতে চায় ? এই পরিবারে দুই নম্বরি রোজগার ঢুকেছে আমার স্বধীনতা সংগ্রামী পেনসন থেকেই। তবু আমরা অনুশোচনা করিনি কারণ প্রাণে বেঁচে থাকার অধিকার সবার আছে। কিন্তু এখন ছেলেটা যে এত এত রোজগার শুরু করেছে তাতে খুশি কেন অতসী ? ওকে এত বেশী আদর সহ্য হচ্ছে না আমার। শানুটাই বা কী ! রিএ্যাক্ট করছে না কেন ?

বাড়িঘর ফেলে আসামের করিমগঞ্জ সহরে এসে অতসীর তো দুঃখের অন্ত নাই। তবু তলে তলে একধরণের সুখও লক্ষ্য করেছি আমি। অন্তত আমার সঙ্গে আর পূর্ব পাকিস্তানের গল্প করেনি। রীতিমত মজে গিয়েছিল ওখানে । আরতি, প্রণতি,রমা, লিপটুর মা দিদি। অথচ কত অভাবেই না কাটছিল আমাদের দিনগুলি ! নিজের পেটই পালতে পারিনা—আরেকজন অন্তস্বত্তা নারীকে আমি কি পুষ্টি দেব! অতসী মরীয়া হয়ে খুটে খাওয়া শিখল। খালপাড় ঘাটপাড় থেকে হেলেঞ্চা, পালং, ঠুনিমানকুনি। অত সিদ্ধ করতে গেলেও জ্বালানী লাগে। তাই পরিষ্কার জলে ধুয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে রস খেত। দু'একদিন আমাকেও টেষ্ট করতে বলেছিল—রীতিমত বিস্বাদ। তবু হাতের কামকাজ সারা হলে অতসীকে তখনও সুখি মনে হত আমার। আর করিমগঞ্জ ছাড়তে চাইত না কিছুতেই। কী যে মধু। যখন তখন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়। কাছাড় জেলার শহরগুলিতে মাদ্রাসা মসজিদ সবই আছে তবু ওরা ভয়ে ভয়ে থাকে। এবং গ্রামে শহরতলীতে আতঙ্কে থাকে হিন্দুরা। সহরে ঘর পাওয়াই মুসকিল ছিল, তেমনি ভাড়াও বেশী। আর শরণার্থী আসে বাংলাদেশ থেকে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলি থেকে।

এবার বিছানায় উঠে বসে মা পুত ঝি মিলে কি ফুসুর ফুসুর করছে এখান থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। জুঁই আবার নিলডাউন হয়ে অসুস্থ শানুর থুতনিটা বাঁ হাতে নিজের বুকের কাছে নিয়ে চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। এরকম দৃশ্য বেশি সময় তাকিয়ে দেখতে পারেন না দিব্যেন্দু। শরীরে কী যে হয়! অতসীরা মনে হয় বাড়ির প্ল্যানটা নিয়ে বসেছে নিজেদের মধ্যে। আরো ক'টা রুম করতে হবে। জুঁইয়ের কথা হল এখানে জাতি উপজাতির মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক, আমরা এই ত্রিপুরাতেই পাকপোক্তভাবে সেটেল করব। শরণার্থী হব না আর কোনদিন। শানু বলছে, ঘর সাজাতে হলে প্রথমে ভাঙা আসবাবপত্র সব বাইরে ফেলে দিতে হবে। নাহলে বরুণের মাকে দিয়ে দাও। বুকটা ছাৎ করে উঠে দিব্যেন্দুর। আবার নাক টানতে থাকেন জোরে জোরে। —উনুনে কি বসিয়েছিলে? দুধ পুড়ে গেল সব। ওদেরও হুস হল। দিব্যেন্দু দেখলেন পোনা মাছের মত উপর জলে ভেসে উঠেছে ওরা, একসঙ্গে নাক টানছে সবাই ।

চৌদ্দ

হপ্তা বা তোলা পাওয়ার দিন। আজ আমার মরার সময় পর্যন্ত নেই। তবে এমন একটা দিন যে ভোরের অনেক আগেই ঘুম ভেঙে যায়। বা হয়ত ঘুমই হল না। শত চেষ্টা করেও মায়ের মুখ মনে করা গেল না। ছোটবেলায় কেটে টেটে গেলে মা যখন পট্টি বেধে দিত—সেই ত্রস্ত আঙ্গুলগুলি এবং টুকরো আঁচল চোখে পড়ে কেবল। এই আমি এখন কিসের বিনিময়ে কি পাচ্ছি— কিছুই বুঝতে পারছি না।

তবু বেরিয়ে পড়তে হবে। চব্বিশ ঘন্টা কাগজের ফরফরি আর ভাল লাগেনা। উড়ো খবরের গুদাম যেন একটা। তবে কৃষ্ণ গুর্খাকে আগের মত আর ভয় পাইনা। তার নিজের চাকরি থাকে কিনা সন্দেহ। সে নাকি বসের সঙ্গেও গদ্দারি করেছে। শুয়োরের বাচ্চা তুই কার গেলাম রে? সাহেবের না মেম সাহেবের ? গোপন খবর পাচারের সময় ধরা পড়ে গেছে। জগদীশদার কাছে রোজই আসে, এমন কিছু কিছু নাম। ওরা কি বলে? তিনিই বা কি উত্তর দেন? সবকিছুই সে রুমালী বৌদিকে বলত। দীপা, পল্লবী ওরা ওঘরে রোজ আসে কিনা? কে কতসময় বসে? সামনে বসে নাকি পাশে কিনারে?

কৃষ্ণ হাতে নাতে ধরা পড়েছে কিনা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। শুধু দেখি শুনি—জগদীশদা কথায় কথায় বাস্টার্ড বিচ গালাগাল করে।

হঠাৎ কিসের হৈ-হট্টগোল! সে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করে—সেই সমীরা ছাড়া আর কে হতে পারে! চিৎকার চ্যাচামেচি ছাড়া কোন কথা নাই। আর রোজই লিলি মুনিয়ার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হবে কেন?

কিন্তু পুসডোর ঠেলে প্রথমে ঢুকল কানাই—হাতে চা।

—এত দেরী কিয়ের লাইগা ?

—স্পেশাল বানাইয়া আনছি বাবু।

—ভাগ্ শালা ।

তারপর হুড়মুড় করে লিলি মুনিয়া সমীর । ওরা নাকি সবাই বিচার চায় !

—দাদা, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন—যে মুহূর্তে চা দিয়ে যাবে কানাই— ঝাড়ুদারনির ঝাড়ু দেয়ার কথা মনে হবে ঠিক তখনই । অর্থাৎ তারই পদধূলি মিশ্রিত চরণামৃত খেতে হবে আপনাকে !

— তুই খা শালা ।

—ঝুট । আসল্ মে সমীরবাবু কী চায় —আজ ফয়সলা করতে হবে আপনার ।

মুনিয়ার সঙ্গে লিলিটাও তাল দেয়— ব্যাটা সবসময় আমার কম্পোজের ভুল ধরে । আমি নাকি জোট সরকারকে যুত সরকার, সি এফ ডি-কে সি এম ডি, প্রধানমন্ত্রী মোরারজী ভাইকে মোরারজীর ভাই কম্পোজ করি সবসময় !

—এ্যাই, তোরা কি থামবি ? মাইকিং হচ্ছে বাইরে —শোনা যাচ্ছে না কিছুই ! হাড় বজ্জাৎ-

'চাষবাসের জমি, এমন কি বাড়িঘর থেকেও উচ্ছেদের প্রতিবাদে আগামীকাল ত্রিপুরা বন্ধ হবে।' ক'দিন আগে শরণার্থীদের কবল থেকে আদিবাসী জমি ফিরে পাওয়ার দাবীতেও দোকানপাট, স্কুল কলেজ, অফিস আদালত সবই বন্ধ ছিল ।

বাইরে ভিতরে এত হৈ হট্টগোল এখন, বাতাসে তামাক পাতার মত রাজনীতির গন্ধ চর্তুদিকে । এতসবের মধ্যেও মনীষ মাথা গুঁজে কি জানি ছাইপাশ লিখে চলেছে !

দশটার ঘন্টা পড়তে শুরু করেছে । একলাফে উঠে দাঁড়াল শাণিত । সরবতের মত একচুমুকে শেষ করে নিল চা । চেয়ারের কাঁধ থেকে ঝোলা ব্যাগ টান মেরে পা বাড়াতে যাবে যেই—কৃষ্ণ গুর্খা হাজির ।

—বুলাওয়া।
—আচ্ছা। তোমার কাছে আমার কত টাকা জমা আছে বলো তো ?
—কত ?
—একশ টাকার মত। এক্ষুনি দিতে হবে সব।
—ইতনা কাঁহাসে বাবু ?
—তাহলে ফিরে যাও। গিয়ে বল—শাণিত সেনগুপ্ত বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই।

হন হন করে বেরিয়ে এসেও থমকে দাঁড়াল শাণিত —রোদ কিতারে বাবা! কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নাকি কেউ ! শাণিতের ভয় করে—কোনদিন ঠিকই পাগল হয়ে যাব বা হয়ত হয়েই বসে আছি। বাড়িঘরেও দেখেছি বাবা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। মা আর জুঁই কে দেখলে মনে হয় ইদানীং মনযোগ দিয়ে দেখার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তাদের। আমার যেমন এখন আর ভাল মন্দ বিচারের কোন শক্তি নেই। এবং কদিন ধরেই একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, বিশেষ করে গত অসুখটার পর থেকে সারাদিন মন মেজাজ খারাপ থাকে। আগেও বিগড়াত তবে মাঝে মাঝে। সরকারি চাকরি থেকে হঠাৎ তাড়িয়ে দেওয়া হলে এবং পরিবারে আর কেউ রোজগেরে না থাকলে তোমারও একই অবস্থা হবে। তবু আমি যতটা পারি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করি। অনুপ তো বলে —এটাও তোর একধরনের পাগলামি। হতে পারে। কিন্তু ইদানীং এই অসুখের পর থেকে রক্তের চাপ টের পাই। বাবার মত ভরু কুঁচকে থাকে সবসময়। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে যৌনতা বেড়ে গেছে মনে হয়। অরণ্যের প্রতি অকর্ষণ বেড়েছে। কি রকম অরণ্য চাই আমি ? সরীসৃপ শীতল স্যাতস্যাতে অরণ্য ? নাকি দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের খানে খানে বনানী ? লালিমা তুমি কোথায় আছো ? আকর্ষণ করো প্লিজ!

মনমেজাজ ঠান্ডা করতে গিয়ে শাণিত এবার ধীরে হাঁটছে। বোকা। বোকা নয় আসলে, মানুষের মনও কম্পাসের কাজ করে মাঝে মাঝে —কোন দিকে যেতে হবে কোনদিকে ? সোবাবজী রেস্টহাউস আছে কামান চৌমুহনীতে। নাকি গোলবাজার যাব ঐ দোকান ঘরগুলিতে ? ব্যাটারা বড় ঘাড়িমুড়ি করে। রাহুলের দাদার বাড়িতেও যেতে হবে। লোকটা খারাপ ছিলনা কিন্তু মানুষের কখন যে কীরকম হয়! লোভ! লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আমারও কি একই পরিণতি হবে ? তার আগেই কিছু একটা করে ফেলতে হবে। আর কোনদিন যাতে চড়ায় আটকা না যায় দিব্যেন্দুবাবুর পরিবার। এই প্রথমবার গোপা বৌদির কাছেও টাকা ধার চাইতে যাব। মন্ত্রীর বৌ বলে কথা! এতদিন কোন সুবিধা নিতে চায়নি সে। কত আর শুধু শুধু ব্ল্যাক কফি খাওয়া ? আলুথালু বসে গপসপ মাবা। টাকা চাই টাকা। আরো দু' একখানে যাব — কোথায় বলব না। নিজেকেও ষোলআনা বিশ্বাস করে না শাণিত। শালা আপোষপন্থী!

এই ভাবে মাথা গরম হয়ে যায় আমার আর কুল ডাউন করতে পারি না। এখনও আস্তে আস্তেই হাঁটছে সে —কারণ আছে। সাংবাদিক হলেও আমি তাপস বিভাসদের মত সাহসী নই। ওরা তোলা পায় মালিক সমাজের কাছ থেকে। অর্থাৎ প্রতিশত্রুতার ভয় জেনেও রিস্ক নেয়। উপার্জন করে কাড়ি কাড়ি। অর্থাৎ ওদের তুলনায় আমার ঝুঁকি অনেক কম। তবু সকাল বেলার কিছুটা সময় কাটে ভয়ে। পত্রিকা খুলে দেখার সাহস হয় না। মৃতদেহগুলির চেহারা কি শাণিতের মত ?

তাই সম্পূর্ণ অন্য রাস্তা আমার। আমি যেমন পেতি— কামকাজও তেমনি। তবে থ্রিল আছে। শুধু শুধু রুস্তমজী সোরাবজীর সঙ্গে ঝগড়া কবতে যাব কোন্ দুঃখে ? আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে অরুণিমা ঘোষ, রুবি দিদিমণি ওরা। অরুণিমার বর একটা পাঁড় মাতাল। এক সময় নাকি সরকারি চাকরি করত। এখন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কোন লাভ নেই। সমগ্র পুরুষ শাসিত সমাজটাই দায়ী।

আরেকটু পরিষ্কার করে বলি—বাবার পেনসনের টাকা ও আমার টিউশনিতে বেশ ভাল ভাবেই

চলে যাচ্ছিল দিনগুলি। কিন্তু আমার সুখের ঘরে রাহু কে বলত?

—কে?

রুবিদি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। ঝট্ করে ফেলে দিলেন বুকের আঁচল। সত্যি তো! এখনও যে কেউ পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে।

—আমি ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি কাজল দেইনি তবু নাকি কাজল দীঘি দুইচোখ। লিপষ্টিক দিতাম না। তবু নাকি দিয়েছি। বেশ করেছি। একসময় নিজেরই মনে হল আমি বেদের মেয়ে ইরানি। পা ফেললেই আমার আলগা শরীর আগে পিছে থলথল করে। মরে যাই কই লুকাই! প্রকৃত আড়াল আছে কি? ওরা হাঁসের মত মাটি খুঁড়ে চঞ্চুতে ধরে কেঁচো। তারপর গলা উঁচু করে ঘৎ ঘৎ করে খায়।

আরেক দিন রঙ খেলা ছিল। আমাকে পাঁজাকোলা করে উঠোনে নিয়ে এল ওরা। জ্ঞাতি কুটুম্ব সব। কেউ ভগ্নিপতি কেউ দাদার শালা। ওরা উল্টেপাল্টে দেখল। তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশংসা করল খুব। সময়ও নিল বেশি বেশি। তারপর বলল— স্টেন্ড ইজি। তুমি সুন্দর। এবং সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকারও মানুষের জন্মগত। প্রকৃতির ক্ষতি না করেও প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা, উপভোগ করা সম্ভব।

সত্যি, কথাটি ওরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। আমার পা পেট কোনদিনই ভারি হয়নি। এবং এখন যে দেখছিস্ —তাও তলপেটে মেদ—অন্য কিছু না। প্রথমে কন্ডোম ব্যবহার করত ওরা, পরে পিল নিতাম আমি। তখন একটি নুতন সমস্যা দেখা দিল —কি হতে পারে বল্তো?

—আমি কি করে বলব?

—জানি তো পারবি না। তুই একটা গাধা। স্বপ্ন বে মূর্খ স্বপ্ন, তখন থেকেই তো স্বপ্ন দেখতে পাই না আমি। যত সময় যেতে লাগল ততই শান্তদা ফুলজামাই ওদেবে বেশি বেশি দিতে শুরু করলাম। কেন বলতো?

—কেন?

—ভয়ে। ফুরিয়ে যাব!

আরেকদিন রিফিউজ করল ওরা। ফুলজামাই লোকটা ভাল। পরে বুঝিয়ে বলেছিল কথাটা। বহু ব্যবহারে তেতো হয়ে যায় সবকিছু। সত্যি কথা তারপর ওরা আর আসেনি। কিন্তু আমি কি করব?

সেই রুবিদি আর এই রুবিদি এক নয়। আগুন এখন বুকে জ্বলে তার। অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতিরিক্ত মাংসল, শীতল। কিন্তু না অরুণিমা, না রুবি কেউই বাজারি খাতায় নাম লেখাতে রাজি নয়। অরুণিমাদি তো কথায় কথায় কেবল —আমরা সৌকালিন গোত্রের ঘোষ —জানিস তো?

আমি সত্যি জানি না। ওরা কেন হপ্তা দেয় আমাকে? পত্রিকার লোক বলে—ভয়ে? ভালবেসে? নাকি ভিক্ষা দেয়! তবে সোরাবজী রেষ্টুরেন্টে যাবার আগে আমাকে টেলিফোন করে কেন ওরা? হোয়ার অ্যাবাউটস্ জানিয়ে রাখে পত্রিকা অপিসে? মরে গেলে অন্তত লাশটাকে যেন বেওয়ারিশ না ভাবে কেউ? শাণিত ছেলের কাজ করবে!

অর্থাৎ আমার পথও একটা পথ তাহলে। ফেলনা নয়। আজও প্রথমে কি ওদের কাছেই যাব? না থাক্। সোজা গোলবাজার যাব। গত সপ্তাহে একজন দোকানদার তো রীতিমত দুঃখ প্রকাশ করলেন—আপনি তো মশায় আরশোলার খুদকুড়া খান। আর যারা লুটেপুটে খাচ্ছে ওদের লোমও ছিঁড়তে পারেন না। আমরা রিস্ক নিয়ে মাল বিক্রি করে দু'পয়সা কমিশন পাই। আর যারা সস্তা গুঁড়ো দুধ ঢুকিয়ে বেবিফুডের টিন আবার সিল করে বাজারে ছাড়ছে ওদের কাছে যান না কেন? এই গোলবাজারে তো ওদেরই রমরমা!

শাণিত সব কথা শুনে মুখ গম্ভীর করে শুধু বলেছিল—উনাদের কাছেও যাওয়া হয়। এখন

আপনারা দিবেন তো দেন নাহলে যাই । ভদ্রলোক দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে ফেলেছিলেন—কী যে বলেন স্যার ! আমি এদেরই দুর্বলতার সুযোগ নেব । সোরাবজীর সঙ্গে শত্রুতা করতে যাব কোন দুঃখে !

রাহুলের দাদার ব্যাপারটা আবার অন্যরকম। আমার সঙ্গে সবসময় একটি জাপানি টেপরেকর্ডার থাকে। জগদীশদা প্রেজেন্ট করেছিল। প্রবীরকেও দিয়েছিল একটা। বিদেশী মাল—কোথা থেকে কিনলেন— আমরা এমন অবান্তর প্রশ্ন করি না। যাই হউক রাহুলের দাদা তার অপিসের বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন জলযোগ মিষ্টান্ন ভান্ডারে বসে । পাশের কেবিনটাতে আমি । মাঝে মাঝে মন খারাপ হলেও এখানে এসে বসে থাকি । দু'একবার লস্যির অর্ডার দেই । সিভিল সাপ্লাই অপিসে কাজ করেন ওরা। তিনি ক্যাসিয়ার। কন্টিজেন্সি ফান্ডের টাকা বা ক্যাশ ইন চেষ্টে যখন যা থাকে—ওরা যুক্তি করে ব্যবসায় খাটান । আবার সময় সুযোগ বুঝে চুপচাপ রেখে দেন । বড়বাবু লোকটার চেহারা সত্যি গোলমেলে । কিন্তু রাহুলের দাদা রীতিমত গোলগাল ভালা মানুষ । কেন যে এ পথে এলেন ! খুব বড় সংসার নাকি ? বউয়ের খাঁই বেশি ? যাই হউক ভদ্রলোকের কাছে টাকা চাইতে গিয়েও সহজে পারিনি । পরে চিন্তা করে দেখলাম উনার তো একটা সরকারি চাকরি আছে, ব্যবসাও—আমার কি আছে ? কঙ্কালসার কিছু স্বপ্ন এবং মা বাবা বোনের বোঝা ।

হঠাৎ দেখি—মন্ত্রী পাড়ার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। পরিবহনমন্ত্রীর কোয়ার্টারে যাব আগে—গোপা বৌদির কাছে ধার চাইব। এখানে হপ্তা বা তোলা গোছের ভাষা ব্যবহার করা কি সম্ভব ? আরেকটা খট্‌কা শাণিতের—গোপাবৌদি কি সত্যি বিশ্বাস করেন নাকি তার স্বামী অন্য নারীতে গমন করেন না !

চালাকি । সে দ্রুত পা চালায় । দেখতে দেখতে চুল পড়ে খালি হয়ে গেছে মাথা । এখন ঘাম জমেছে ফোটা ফোটা । রাস্তা থেকেই আবারও দেখল কৃষ্ণনগর টি আর টি সি অপিসের চত্বর কত বড় ! গম গম করছে লোকে । মানুষের শরীর অনেক সময়ই তার নিজের মত কাজ করে —তোমার প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝে না । কাছে যেতেই শুনল শাঁ শাঁ আওয়াজ । কয়টা পবনপুত্র জানি এই চত্বরে ! ভেতরে ঢুকে এক কোণায় পায়া ভাঙা একটা বেঞ্চি দেখল—দেয়ালে ঠেস দিয়ে। শাণিত প্রথমে নিজের হাতে চেপে দেখল, তারপর বসল সাবধানে । কী আরাম ! ঠিক তার মাথার উপরেই একটা ফ্যান ঘুরছে । ইচ্ছে করলে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে ঘুমিয়ে নিতে পরে একচোট । বা স্নিগ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে পারে মানুষের মুখে মুখে । কিছুই করল না সে । ঝোলার ভেতর হাতড়ে হাতড়ে একটা বিড়ি আর দেশলাই বের করে আনল । সিগারেট ছিল, ছোঁয়নি । দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ির একটা দিক একটু ঝলসে নিল । তারপর দাঁতে কামড়ে এদিক ওদিক দেখে অগ্নিসংযোগ করল । ছুঁচোর মত মুখ করে সময় লাগিয়ে লাগিয়ে ধূঁয়া ছাড়ল । শেষ দৃষ্টিটা গিয়ে অনেকদূরে পড়ল টর্চের মত । দুটো লোকই দাঁড়াল—আমার দিকে তাকিয়ে কী বলাবলি করছে ওরা ? সেও একই ভাবে বোঝার চেষ্টা করল—ব্যাপারটা কি ? ওদের মধ্যে একজনকে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে । মিটিং মিছিলের মত মুখ । আরো একটা লম্বা মেয়ে এখন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে কেন ?

—দাদা কটা বাজে ?

সে তাকিয়েছিল তার হাতঘড়ির দিকে । তারপর স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা কদাকার ঐ লোক দুইটাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ঠিক তখনই মনে হল—একজনকে তো চিনি ! সে শুভঙ্কর বল । নকশাল নেতা। এখন প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করেন। একসময় শাণিতের সাথেও কথাবার্তা ছিল । ক্রমে জমে উঠেনি ।

—আমার কাছে তো ঘড়ি নেই দিদি । মেয়েটি সরে যেতেও সময় লাগল মিনিট খানেক । তারপর দেখলাম মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ওরা । মঙ্গল হয়েছে। ওদের এখন আমার একেক টুকরা স্কাইল্যাব লাগে । ভয় লাগে কখন ঘাড়ে এসে পড়ে ।

আকাশেও বিচ্ছিন্ন মেঘ। উঠতে হয় এবার। তাছাড়া চিন্তায় চিন্তায় রাজনীতির ব্যূহে একবার ঢুকলে আর রক্ষে নেই। শাণিত উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময়—

—এই যে! শ্রী জয়সিংহ আপনাকে ডাকছেন। গাড়িতে বসে রয়েছেন।

শাণিত জানে, না গিয়ে উপায় নেই। আর জানে ভদ্রলোক পদবী ব্যবহার করবে না কখনও। তাহলে রাস্তা থেকেই আমাকে দেখা যাচ্ছিল! কপাল মন্দ। শাণিত এগিয়ে গেল। ভদ্রলোকও এম্বেসেডরের কপাট আরেকটু খুলে দিলেন। কিন্তু আমি ইতস্তত করছি দেখে যে লম্বু সিংটা ডেকে আনতে গিয়েছিল আমাকে, এখন ভদ্রতার ছলে জোর করল। আমাকে বসিয়ে তবে নিজে বসল। অবশ্য খুব অল্প জায়গার মধ্যে। দরজা লাগিয়ে দিল। এবার চলতে শুরু করল এম্বেসেডার। ঘসা কাঁচ। ভাল করে দেখাও যায় না। তবু মনে হল আমরা বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যাচ্ছি। আমার মন বুঝে মুখ খুললেন জয়সিংহজী— আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমরা গাড়িতেই কথাবার্তা শেষ করে নামিয়ে দেব। বলেন তো এখানেও পৌছে দিতে পারি।

—না না, তার দারকার নেই। গাড়ির ভেতরেও এতগুলি পাখা! যথেচ্ছ বাতাস! সিংজী এবার ফ্রন্ট সিটের পিঠ থেকে ফুল ফুল একটা ড্রয়ার হাতল ধরে টান মারলেন। প্রথমে গুণগুণ করে উঠার মত, পরে জলতরঙ্গ বাজতে শুরু করল। তিনিও মাথা দোলাতে শুরু করলেন টুং টাং। যেন প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন আমার উপর। এবং দেখলাম—ওটা কোন ড্রয়ার নয়—একটা কুমির আস্তে আস্তে হা মেলছে। তারপর বাজনা থেমে গেলে বুঝলাম—হা করেই থাকবে কুমিরটা। কয়টা বিয়ারের বোতল আর গ্লাস দাঁতের খোঁয়াড়ে আটকানো। এবার লম্বু কাজ করতে লাগল দ্রুততার সঙ্গে। কুমিরের মুখের মধ্যেই তো ওপেনার ছিল। মধুর শব্দ করে ছলকে উঠল গ্লাসগুলি।

—গত জানুয়ারী মাসে প্রথম এসাইনমেন্টের মাল আমরা পেয়েছি উষাবাজার সীমান্ত থেকে। রিসিভ্‌ড ইন গুড্‌ কন্ডিশন। আপনার কমিশন পেয়েছেন তো?

—হ্‌।

—এবার আরো বড় কাজ কমরেড।

সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদের মত পর পর কয়টা লাথি বসিয়ে দিল শাণিত সামনের সিটে।

—কমরেড বলবেন না শালা!

বিয়ারের বোতল কয়টা নিচে পড়ে গিয়েও ভাঙল না। বোঝা যায় না কিন্তু নিচে কালো রঙের কার্পেট আছে। আর কাচের পাতলা গ্লাসগুলি দাঁতের ফাঁকে ফাকে আটকে রইল। যদিও উপাচানো বিয়ারেই ভিজে গেছি। শীতল হয়ে পড়েছি খানে খানে। তবু উত্তেজনার রেশ টেনে বললাম— সাবধান! আমি উগ্রপন্থী নই। নিরীহ মানুষ মেরে কাজ হাসিল করার মত নীচ কাপুরুষও নই। 'আমি শুধু আপনাদের শোষণমুক্ত সমাজ' স্লোগানে মজেছি!

আর বলতে পারিনি। লম্বু সিং মুখ চেপে ধরেছে। এবং ছোট্ট একটা সোনালি পিস্তল। খুব সুন্দর দেখতে, কপালে ঠেকিয়ে রেখেছে।

—আরে আরে! করো কি! ছাড়ো ভদ্রলোককে। তারপর সিংহজী একটা ক্লাসিক গুঁজে দিলেন তার ঠোঁটে। গ্যাস লাইটারও হাতেই ছিল। তবু বেশ সময় নিয়ে অগ্নি সংযোগ করলেন। মুখ ছুঁচো না করে বাউসমাছের মত সব ধোঁয়া বের করে দিলেন একসঙ্গে —

—আপনি তো শোষণমুক্ত সমাজ চান। আমরাও তাই চাই। তাহলে ঐকথা রইল, এ মাসের কুড়ি তারিখ নেক্সট এসাইনমেন্টের মাল। টাটকা চাই।

গাড়িটা আস্তে করে রাস্তার পাশে থামল। দরজা খুলে দিল লম্বু। তাড়াহুড়োর মধ্যে ঘাড় ধরে ধাক্কাও দিল কিনা—বুঝতে পারলাম না। জয়সিংহজীর হাসি হাসি মুখ—তিনি টা টা দিচ্ছিলেন।

আজ আর কোথায় তোলা পাওয়া, ভিক্ষে চাওয়া সম্ভব হবে! তারচে বরং পত্রিকা অপিসে ফিরে যাওয়াই ভাল। ঝড় যখন আসে, বাতাসশূন্য হয়ে পড়ে চরাচর, চলে যায় যখন পূর্ণ করে বায়ু

প্রস্রবণ। শাণিত এবার সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছে। আরো বাতাস লাগে তার। উমাকান্ত স্কুলের মাঠে ছায়াদার কৃষ্ণচূড়ার নিচে জড়ো হয়েছে যত গরু। ঝিমোচ্ছে বসে আর জাবর কাটছে। শাণিতের ইচ্ছে— সেখানে গিয়ে শোয়। তারও নাকি জাবর কাটতে ভাল লাগে। তাহলে গেলেই পারে। কিন্তু যায় না। মানুষের ভাল লাগার শেষ নেই। সব ইচ্ছা পূরণও হয় না। কোন প্রতিবন্ধকতা নয়। এমনি এমনি হয় না। হতে হতে হয় না। হয়ে গিয়েও পুটুস করে ফেটে যায়।

আজ অনুপটার কথা মনে পড়ছে খুব। অনেকদিন দেখি না। সে আমাকে অন্য পৃথিবীর খবর খাদ্য জোগান দিত। বলেছিল— রঙ চঙে না ভুলে নিগেটিভগুলোকে ডেভেলাপ করে দেখতে শিখ— অনেক কিছু পেয়ে যাবি। পাগলার কবিতাও শুনি না অনেকদিন।

তারপর দিব্যেন্দুবুড়া আর অতসী বুড়ির কথা! বাড়িতে এখন ওরা কে কি করতে পারে? হয় কুটুর কুটুর কাজ, না হয় ঝগড়া। নিরালায় বসে সুখ দুঃখের কথা—অন্তত আমি শুনিনি কোনদিন। স্মৃতিচারণাও তো করা যায়! না, ওরা ঝগড়া করবে। করুক। হয়ত বয়ঃভারে নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলিও সক্রিয় হয়ে উঠে তখন। এবং দেখো গিয়ে জুঁই হয়ত নখে রঙ লাগাচ্ছে বা চুলের আগা কেটে ফেলছে কেঁচি দিয়ে। কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রেই তুমি টের পাবে— সে কাজ করছে না তো —স্বপ্নে বিভোর।

বাবা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সুন্দর করে কথা হয় না অনেকদিন। বড় খিটখিটে মানুষ। আবার ঘুমন্ত সন্তানের শরীরে চাদর চড়িয়ে দেয়ার স্বভাবও আছে। ফলে গোপনে গোপনে কান্নার স্বভাব আমার পিতৃদত্ত। বা কোন কারণে কখনও যদি মায়ের মুখ মনে করতে পারিনা, আর উনুন থেকে উঠে আসা তার হলদেটে হাতগুলি কল্পনা করতে পারি না যদি—তাহলেও কাঁদি। ওদের আরেকটি ভুলের জন্যেও কাঁদি। আমি নাকি রাজনীতির কিচ্ছু বুঝি না তাই তার শিকার হয়ে পড়েছি!

না মা না! না বাবা না! আমি তো ছোটবেলা থেকেই বোঝার চেষ্টা করে এসেছি। তোমাদের মুখভঙ্গি হাবভাব ক্রিয়াকাণ্ড সবই লক্ষ্য করতাম। খাওয়া দাওয়ার পর যেদিন রাতের বিছানা করত বাবা, আমাদেরে শুইয়ে নিজে শুয়ে গান করে করে ঘুম পাড়াতো, সেদিনও আমরা ঘুমিয়ে গেলে দেখেছি—বাবা টেবিল চেয়ারে বসে পান খেতে খেতে পত্রিকা পড়ছে। পুকুরঘাটে মায়ের বাসন মাজার শব্দ।

মানুষ মানুষেই তো সম্পর্ক হয়! পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে, নারী পুরুষে কি বোঝাপড়া হয়? হয় না। এরই নাম সম্পর্ক। সম্পর্কহীনতা। তাছাড়া আমি কি শুধু আমাকেই ভালবাসি? তোমাকেও ভালবাসি মা। তোমাদের ছাড়া আর কে আছে বল? বৃহৎশক্তি, বিরোধীদল, সরকার এবং সমাজসেবী সংস্থা—সবাই আম জনতাকে ভালবাসে। আমারও ভোটাধিকার আছে। কী ভাবে প্রয়োগ করলে যে লাভ হবে বুঝতে পারি না। বাবা গো আমি মানুষ চিনি। মন নামক অবস্তুটিকেও চিনি। বৃহৎশক্তির ভণ্ডামিও, কিন্তু কোন উপায় নেই তো! কার্যকারণ, পুঁথিগত বিদ্যা সবই জানা থাকলেও জনতার কোন হাত পা থাকতে নেই। এতে শত্রুর চেয়ে বন্ধুরাই গোঁসা করে বেশি।

শাণিত দেখল ঘুরে ফিরে সে আবার সেই কৃষ্ণনগর টি আর টি সি অফিসের সামনেই এসে পড়েছে। বেলা যখন খুব বেশি হয়নি আর ঢিলেমি করব না। সে রাস্তার কিনারে কিনারেই হাটছিল। তবু কালো একটা এম্বেসেডার এঁকেবেঁকে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এ কী! চাকা খুলে যাচ্ছে নাকি? বুঝেছি গর্ত বাঁচিয়ে আর সরে দাঁড়াবার জায়গা নেই। নালা। গাড়িটা খস্ করে, পেছনের দরজা ঠিক তার সামনে এসে অর্দ্ধেকটা খুলে গেল। পুরো খুললে হয়ত পড়েই পড়ে যেত শাণিত। আসলে থামেনি, একটু একটু করে চলছিল। ইতস্তত অবস্থার মধ্যেই একটা নির্লোম হাত এক টানে গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে নিল আমাকে। মনে হল আমিই যেন সেই পক্ষী দেববর্মা! কখনও জয়সিংহ কখনও পঙ্কজের খাদ্য। সাম্প্রতিক ত্রিপুরায় যার কোন মূল্য নেই।

— এ্যাই ব্যাটা কদু ! টানাটানি করিস কেন !

—গাড়ি থামাও বাস্টার্ড !

আর মুখে কথা বলে লাভ নেই ! পঙ্কজ কুস্তাকুস্তি করে কোনরকমে শাণিতের দুইটা অণ্ডকোষ লাভ করে । ধস্তাধস্তিতে আমার নখে তার নাক চিরে গিয়ে রক্ত ঝরছে। তবু হাসি মারল একটা। তারপর আস্তে আস্তে টিপা দিল যেন বি পি বক্সের ব্লাডার —

—মাগো !

—মনে থাকবে তো ? শনিবার সন্ধ্যা ছ'টা। তোমাদের পত্রিকা অফিসের পাশে যে নিমগাছ—ঠিক তার নিচে গাড়ির ভেতরে বসে থাকব আমি।

শাণিতের কানে কি কথাগুলো ঢুকল ? আরেকটা টিপ দিল—

—মাগো !

গাড়িটা দুর্গাবাড়ির সামনে এসে থামল। নামতে সাহায্য করল পঙ্কজ। দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল আবার। ছোট্ট একটা টান মেরে শাণিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—মনে থাকবে তো ডিয়ার !

শাণিতের মনে হল তার সবকটা পকেটই এখন কানা। ঝোলা ব্যাগের তলদেশ ফাঁকা। ছোট বড় অজস্র ছিদ্র শরীরে । এতসবের মধ্যেও শালা প্রাণবায়ুটা থাকে কোনখানে ? সূচীছিদ্র পথও যেখানে বেলবটমের মত ঢোলা ঢোলা । অর্থাৎ সংরক্ষণ সংকোচন প্রক্রিয়া পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।ঘামা ঘামা দিয়ে ওঠে শরীর। পায়খানা পেচ্ছাপ বমি সবই এক সঙ্গে পায়। আমার এই পতন যত না শরীরি, তাতে কি আত্মহত্যার এয়ার-বাবলও আছে ?

না-ও থাকতে পারে। কারণ আমি মাঝে মাঝেই ব্যস্ত সমস্ত রাস্তায় মাতাল অবস্থায় পড়ে থাকি। আমার চারপাশ দিয়ে অটোরিক্সা, লরি সবই যায় অস্ত্রপচারের মত এঁকেবেঁকে। শক্তিমান,পুলিশের গাড়ি বা সওদাগরি টাটা ট্রাক শরীরের উপব দিয়েই যায়, অথচ কিচ্ছু হয় না আমার। কেবল গাড়ির চাকা মাঝে মাঝে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। ফলে চোখ বুজে পড়ে থাকি। পেট্রলের গন্ধ, বাল্যস্মৃতি ভাল লাগে। বিশেষ করে পিচ গলা পথে বৃষ্টি পড়ে ছেৎ ছেৎ রান্নাবান্নার গন্ধ। এবং মজার ব্যাপার হল—এক সময় নেশা কেটে গেলে, শরীরে জোর ফিরে পেলেও কেন উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না ? খোঁয়াড়ের ফাঁক ফাঁক বেড়ার মত পথচলতি মানুষও ভিড় করে দাঁড়ায়। ওরা কোন ফেক্টর নয়। এক ধরণের পাখা নেই পোকার মত। অবশ্য প্রকট রঙের ডোরাকাটা কিছু সুন্দর সুন্দরীও আছেন। হয়ত ওরাই ডাইনি বা ড্রাকুলায় পাওয়া মানুষ !

পঙ্কজের গাড়িটা এখন তার মুখে দলা দলা কালো ধুঁয়া ছেড়ে চলে যেতেই আগরতলার যত অট্টালিকা ও অথর্ব বৃক্ষগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এবং ব্যাঙ পিষ্ট হওয়ার ভয়ে ছুটতে থাকে শাণিত।

শাণিত্যা ছুটছে বটে, তবে পালাতোলা ধ্বংসের আগে আগে পৌঁছে যেতে পারবে তো? আপাতত পত্রিকা অপিসে গেলেই কাজ হবে । ঠিক জগন্নাথবাড়ির সামনে শিবলিঙ্গের মত উচিয়ে একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল শাণিত। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল গেল মনে হয় ! রক্তপাতে নাকি ভয় পায় ভুতও। সাময়িক ভাবে হলেও পঙ্কজের মাকড়সা সূত্র ছিন্ন হয়ে শাণিত এবার দেখল—ত্রিপুরার রাজবাড়ি, অলিমপিয়া হোটেল ও গম্বুজগুলিতে অভিজাত পায়রা উড়াউড়ি করে। কাকতালিয়ভাবে যতদূর চোখ যায় রাস্তায় সে একা এই মুহূর্তে।একটি রিফিউজি পরিবারের ছেলে। বাবার নাম দিব্যেন্দু। মায়ের অতসী। জুঁইও একটি ফুলের নাম। সরকারি চাকুরি থেকে বিতাড়িত। এখন উত্তর পূর্ব পত্রিকা অপিসে কাজ করি। আজ আমার তোলা পাওয়ার দিন ছিল।

ওরা অভিযোগ করে—আমার শরীরে নাকি সবসময়ই বাড়িঘর নাহয় গাছগাছালির ছায়া পড়ে থাকে। তাহলে তোমরাও বলো হে— সারাদিন আলো ধরে রাখতে পারে মুখেরা কি খুবই উচ্চাকাঙ্খী হয় ? পঙ্কজ তলাপাত্র জগদীশদাদের মত ? রাজনীতি, অর্থনীতি শিল্প সাহিত্য সবইতো ওদের হাতে !

তাতে তোমার কি হয়েছে ! পরিমিত খাদ্য, ঘুম ও সঙ্গম সুখের পরে বাহ্যি পেচ্ছাপও যদি স্বাভাবিক হয়ে যায়, আর কি চাই তোমার ?

কি চাই আমার ? শাণিত ছুটতে থাকে। আর কতদূরে পত্রিকা অপিস ! একনজরে পুরো প্যালেস কম্পাউণ্ড দেখে । বড় বড় দীঘি দুইটা। অনেকগুলো রাস্তা। রাজপ্রসাদ। কিন্তু থামে না। ভাবে একটি ঘড়ি বা একেকটি অংক—সবই কত হাস্যকর ব্যাপার। নিছক অনুমান ছাড়া কিছু না। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ থেমে যায় শাণিত—আর সব চাই আমি। আমি চাই দিব্যেন্দুবাবুর পরিবার ধনে মানে বাঁচুক। পছন্দের নারী আকৃষ্ট হউক আমাতে। ইচ্ছে করলে আমি তাকে মুক্তিও দিতে পারি। কারণ আমিই আমার ঈশ্বর। প্রকৃত মুক্ত বিহঙ্গ। যে কোন বন্ধনেই যে মৃত্যু বোধ করে। আবার জালেও ধরা পড়ে যায় পোনা মাছ খেকো ঢোঁড়াসাপ। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তোমরা আবার আমাকে নরম হাতে জলে জংলায় ছেড়ে দিও। আমি অন্যকিছু করব। আমি তো কথা শিল্পী। সৃষ্টি করব আমি।

আর পুরস্কার টুরস্কার কিছু লাগে না কি তোমার ?

এবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে থাকে শাণিত। এটা ঠিক—সারাদিন শুধু কৌটা খোলা আর বন্ধ করার শব্দ ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে বর্ষার ব্যাঙ যেমন দিগন্তের মেঘও ডাক দিলে শাণিত ছুটতে থাকে। নাকি ঘরে গিয়ে মায়ের শূন্য কৌটাগুলি ভরে ফেলব আগে ?

কোন কিছুই অত সোজা নয় বাছা ! না ঘর সংসার, না সাহিত্য। শাণিত ছুটতে তাকে। আমরা হলাম গিয়ে রিফিউজি।

শাণিত হাফাতে থাকে। পত্রিকা অফিসের প্রবেশ পথ বন্ধ করে রেখেছে মস্তবড় একটি বৃত্ত। পেছন ফিরেও তাকাচ্ছে না। আরেকটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার সাপের হা সব সময় তার শার্টের কলার ছুযে থাকে। এমনকি ঘুমের মধ্যেও চেপে ধরে আর গোঙাতে গোঙাতে ছুটতে থাকে শাণিত। ভেতরে ঢুকতে পারছে না এখন। এই পত্রিকা অপিস তাকে কতটা আশ্রয় দিতে পারে? কার হাত থেকে আত্মরক্ষা কবে কার কাছে সমর্পণ করতে চায় নিজেকে ?

কানামাছি খেলার মত একবার এদিক, একবার ওদিক করতে থাকলেও এখন এই মানব শৃঙ্খল অতিক্রম কবে পত্রিকা অপিসে ঢুকতে পারছে না কিছুতেই। মাঝে মাঝে সমীর মনীষ মুনিয়াদের মুখ লক্ষ্য করেছে ভিড়ের মধ্যে। ব্যাপাব কী !

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি—গুপ্তজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের বড় লোভ। জড়িবুটি, তন্ত্র-মন্ত্র ফুঃ গঞ্জের বাজারে বক্তৃতা আর বাউল গান। আগে করিমগঞ্জ শহরে দোতারা ডুপকির ভিড় দেখলেই আমরা বুঝতাম—গ্রামে অভাব চলছে। এখন এই বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিটি খুবই অপরিচিত লাগছে তার। আর অনেকেরই নাকি জানা আছে – এটি চম্প্রেং । সে ভিড়ের কাঁধে ভর দিয়ে মধ্যমনিদের দেখার চেষ্টা করল। পারল না। ভিড়ের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করে।। এত গভীর ভিড়ে পঙ্কজের হাত পৌঁছবে না। বাজারি পিটাব ডর আছে। সাঁতরে সাঁতরে যতই মানুষেব মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আর বড় মাছের ভয় করছে না। সে আবার বাদ্যযন্ত্রটিতে মন দেয়। আগরতলার রাস্তাঘাটে টুকরো টুকরো ককবরক শব্দ শোনা গেলেও এর আগে গান শুনেনি কোনদিন। গলা শুনে গায়িকার বয়েস বোঝা মুসকিল। তবে মিষ্টি গলা। সে কান্‌খা খুলে শুনে। শুনতে শুনতে দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। ত্রিপুরার আদিবাসীদের কেউ কখনও ভিক্ষা করতে দেখেনি। শত অভাবেও না। ওরা রাজবংশী। এখন এই যে নরনারী বাদ্যযন্ত্র হতে মাগনে বেরিয়েছে—আমার তো ভয় করছে দেবী বুড়িবক ! কোনো অশনি সংকেত নয় তো ?

সাঁতরে সাঁতরে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়াতেও পারছে না, আবার ভিড়ের বাইরেও বেরিয়ে আসতে পারছে না। ঘামতে ঘামতে স্নান। অনেকক্ষণ ধরেই তো গরমজলে সিদ্ধ হচ্ছে শাণিত আর ভাবছে—এভাবে ত্রিপুরার পাহাড়ে যদি দুর্ভিক্ষ চলতে থাকে ক্রমাগত; যদি শরণার্থীরাও তাদের কর্ষিত জমি ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে থাকে ! তাহলে হে ঈশ্বর ! শাণিত চোখ তুলে

দেখে—চিল আছে আকাশে, শকুন আছে কিনা! কড়া রোদে ভাজা পোড়া গন্ধও করে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রকৃতি জ্ঞান ছিল দারুণ। কেঁচোগুলো মাটির নিচ থেকে জঞ্জালের স্তর ভেদ করে উপরে উঠে এলেই বুঝবে বৃষ্টি আসন্ন।

তখিরাই খুমতি ওরা যখন ছিল তখন ত্রিপুরার যত পাখি আর গাছেদের গল্প করত—ওদের একটিকেও আমি চিনি না। গল্প শুনে শুনে শুধু না-ঐ না-ঐ ডাকলে হবে না। পাখিটাকে জানতে বুঝতে হবে তো! এমন কিছু ফুলের নাম করত তখিরাই—তৎক্ষণাৎ সুগন্ধে ভরে উঠত ঘর। কিন্তু তছকুমা পাখি দেখতে কেমন জিজ্ঞেস করলে তার মুখের উত্তর কেড়ে নিত খুমতি। উপমা ব্যবহার করতে পারত দারুণ—যেমন মোরগের বুকের মত টিলায় আমাদের টংঘর। চারপাশে গুণথু ফুলের জংগল। মুইবালি গাছে জানিজং পাখির বাসা।

আর সারাদিন শুধু গুণ গুণ করত ওরা। বিশেষ করে রাতে আমরা যখন চোখের পাতা এক করি, খুমতি মাদুরে শুয়ে শুয়ে একটাই গানের কলি রোজ ধুনতো-—

"চেরাই ফাংসিনি অগ মাই কীরাই
অগ তাই কীরাই আনি"।

যার অর্থ তখিরাই আমাকে বলেছিল—'ছোটবেলা থেকেই তো পেটে ভাত নেই আমাদের, জল নেই। অপরের মত সুস্থ সচ্ছল হওয়া হল না। এই মনুষ্য পুরীতে এসে শুধু অন্যদের সুন্দর ও সুখী জীবনই দেখে থাকা সার হল।'

তখিরাই খুমতির কথাগুলো পরে আমি মা'কেও বলেছিলাম। তিনি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার কপালে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন উত্তর করেননি।

এখন এই গোলাকার ভিড়ের ভেতর আমি সাঁতরে সাঁতরে ঢুকে গেলেও কিন্তু দাঁড়াতে পারছিনা। আমার সামনে প্রতিটা গলা-ই জিরাফের, তবে জ্ঞান পিপাসু নয়। ভাল মন্দ বিচাব বিবেচনাও না। শুধুমাত্র গাছের পাতা চিবোনো জিরাফ। আর জাবর কাটতে কাটতেই আমাদের বিশ্রাম। আরেকটা গান শুনতে লাগলাম আমি—

আঠার মুড়া দামড়াছড়া
নয়ন তাড়ানি পাড়া।
নয়ন তাড়ানি পাড়া দে পাড়া
বার ঘরিয়া পাড়া।

সবটা শুনা হয়নি। তার আগেই ভিড়ের বৃষটা এক গোঁতা দিয়ে আমাকে বৃত্তের বাইরে ঠেলে দিল। দুই হাতের তালুতে পথের পাথরকুঁচি গেল গেঁথে। ধূলোমাটি মেখে আমি কোনরকমে উঠে দাঁড়াতেই, কথা বার্তা নেই শাণিত পত্রিকা অপিসের মুখের উপর এক খণ্ড ভিড়ে এমন জোরে ধাক্কা মারল—ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সব। তারপর হাড়গোড় মাড়িয়ে সেও ঢুকে গেল ভেতরে। রীতিমত কনভালসন হচ্ছে এখন। অতসী সেনগুপ্তের মৃগিরোগ আছে। কিন্তু আদিবাসীদের এই নিরুপায় ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে শাণিত নিজেকেও একজন অভিযুক্ত মনে করছে —এটা ভুল ভাবনা। বুঝা যায়— তার মগজ ধোলাই হয়ে গেছে।

আসলে স্ব-বিরোধিতাই শাণিত সেনগুপ্ত। তার ভীষণ ভয় করছে এখন। আবারও কি উদ্বাস্তু হতে হবে? জোরজবরদস্তি পত্রিকা অফিসে ঢুকেও ধাতস্থ হতে পারছে না শাণিত। ঠিকানা ভুল করলাম না তো! সবকিছুই কেমন অপরিচিত। নিজের চেয়ার টেবিলগুলিকে পর্যন্ত মনে হয় পর।

আজও ঝোলা ব্যাগটা তার কাঁধেই ছিল তবে ক্রস করে। অন্যদিনের মতো অফিসে ঢুকে চেয়ারের বাঁ কাঁধে ট্রান্সফার করে দেয় না। যাবতীয় আবরা-জাবরা নিয়েই ধপ্ করে বসে। একটা হাত লম্বা করেও ভেতরে ভেতরে তুষের আগুনে পুড়তে থাকা মাথা ফেলে রাখে টেবিলে। উপরে ঘুরন্ত ফ্যানের শব্দ। ভয়ও করে। হাফরের বাতাসে কি আবার গণগণ করে উঠবে আগুন!

—এই শাণিতদা, শাণিতদা, ওঠো, তোমার টেলিফোন।

এবং শুনা মাত্রই সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। —কী হয়েছে রে! কে এসেছে ?

—কেউ না। তোমার টেলিফোন।

ও সেই শুয়োরের বাচ্চারা! একবার যখন বিষ্ঠার স্বাদ পেয়েছে আর পিছু ছাড়বে না। শালা জয়সিংহ! প্রথমে কোন পাত্তা না দিয়েই আড়মোড়া ভাঙল শাণিত। কিন্তু তারপরই যেন ধান খেয়েছো মুরগি যাবে কোথায়— ধড়ফড়িয়ে ওঠে। এটা জগদীশদার টি টাইম। ঘরে গিয়ে দীপাবৌদির হাতে চা খেতে হবে এখন। এবং না গেলে কি হবে? জানা গেছে দীপাবৌদি নাকি মাঝে মাঝে পিটায়। এমন কিছু কথা আছে খুব সহজ, অথচ শাণিত বোকার মত তাকিয়ে থাকে—একজন মেয়েলোক আবার পুরুষ মানুষকে পিটায় কিভাবে! রাখো তো তোমার নষ্ট চোখ ওর বুকের ওপর! তারপর ওত পাতো দুই হাতে। দেখি তো সে মারে কিভাবে!

আসলে এখন তুমি নিজেই ভয় পেয়েছ!

—ধুর ধুর! সে রিসিভার তোলে।

—কে ?

— আমি শিখা।

—কে শিখা ? কোন্ শিখা ?

(তবে শাণিতের এখন আর ভুরু কুঁচকে নেই)

—আমি এ জি সেল থেকে বলছি। আমাকে চিনতে পারছো না তুমি!

ও শিখারাণী। দাসগুপ্ত। দেবু দত্তের প্রেমিকা। ওতে আমার লোভ ছিল না কোনদিন। তবে ওরা দুইজন যখনই অফিস পালিয়ে আমাদের মেসবাড়িতে এসে চুটিয়ে প্রেম করত—

— ঠিক আছে। তারপর বল — তোমাদের বিয়ের নেমন্তন্ন নাকি ?

শিখা খিল খিল করে কাঁপিয়ে তুলে টেলিফোন—না না, তার চেয়েও দামী।

—বুঝেছি, তাহলে তোমার ছেলে মেয়ের মুখে ভাত হবে নিশ্চয়ই। আমি কি মামার রোল প্লে করব ?

শিখা হা হা করে হাসতে পারে—আরে না, তার চেয়েও দামী কি বল ?

আমি সারেণ্ডার করলাম। তাহলে ওদের মধ্যে কি আর প্রেম টেম নেই?

—চাকরি হয়েছে গো মশায়! তোমার আবার চাকরি হয়েছে এজি অফিসে।

এঘরে এখন বস্ নেই। তাই ফ্যান ঘুরছে না। এশিয়ান পেইন্টসের ক্যালেণ্ডার, তার পেছনে মাকড়সার জাল—কিছুই নড়ছে না এখন। দরজা জানালার পর্দা, টেবিল চেয়ার, জলের গ্লাস, ঢাকনা, আর আর রিসিভারগুলি সবই স্থির। নিস্পলক তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।এঘরে ঢুকতে ঢুকতে কৃষ্ণকে দেখে এসেছিলাম টুলের উপর বসে।

শাণিত থুতনিতে ঠেকিয়ে রেখেছে রিসিভার।

শাণিত তোর চাকরি হয়েছে! দাদা তোর চাকরি হয়েছে!

মনে আছে ভাই মনে আছে! সেই প্রথমবার জুঁই দৌড়তে দৌড়তে এসে, আমরা তখন বঙ্কদার স্টলে বসে আড্ডা মারছিলাম। আর টাল সামলাতে না পেরে চান্দুদা নিধুদাদের গায়ের উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ভরা চায়ের কাপ উল্টে জামা কাপড় ভরে গেলেও সেদিন কেউ রাগ করেনি কিন্তু! জুঁইটাকে দুই হাতে তুলে দাঁড় করায়—তুই বাড়ি যা বোন। বলির পাঁঠা নিয়ে আসছি আমরা—

সেই বাক্যগুলি যেন দৈববাণী ছিল। যাই হউক, আজ আবার আমি সংসারে ঢোকার ছাড়পাত্র পেয়ে গেছি।

—এবং তুমি—তুমিই আসলে দেবী বুড়িবক! এই নাও শিখা—এবার তোমাকে একটা চুমু খেলাম আমি, চু চু—

ওদিকে আর হেসে উঠল না কেউ। ভব্যসভ্যের মত ছোট্ট ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল।

এই ঘরের সবকিছুই এখন গ্রিট করছে শাণিতকে। সবাই এখানে জগদীশদার কেনা গোলাম। পরাধীন। বিদায় বন্ধু! সে পকেট থেকে একখান্ দশ টাকার নোট বের করে রুমাল নাড়ছে যেন, বসের চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এল— এসেই খপ্ করে ধরে ফেল্ল কৃষ্ণ গুর্খার একটা হাত। এবং টাকাটা গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু উল্টো বুঝল রাম। এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল শাণিতকে—মুখে হামদরদি নেহি চাহিয়ে।

—ছাগলের বেটা পাঁঠা। তারপর আর কোন কথা চলে না। শাণিত পত্রিকা অপিসের বাইরে এসে দেখে— ধূঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে কানাই কাপে চামচে শব্দ করে চলেছে —

—নে ভাগিনা।

সে টাকাটা ধরতে না ধরতেই শাণিত ছেড়ে দিল। এবং উড়ে উড়ে চুলাতেই পড়ল নাকি ফুটন্ত কেটলিতে, ফিরেও দেখল না। টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকেই আর একবারের বেশি দুইবার চোখ রাখতে পারছে না কিছুতে।

কানাইয়ের কেটলি থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসছে বাস্প। ধূঁয়ার সঙ্গে যার কোন মিল নেই। একটি আড়াল করে। আরেকটি মায়াবী।

যা কিছু দেখতে পাচ্ছি এখন— সবকিছুতেই আগ্রহ আছে আমার। কোন আসক্তি নেই। উত্তপূর্ব পত্রিকা অপিসের সামনে এই যে কিশোর অশ্বত্থ, এখনই যার বিশাল ছত্রছায়া, তার নিচে ছোট ছোট হলুদ ফল খুঁটে খাচ্ছে অজস্র পাখি। কানাই সহ এখানে ফুটপাথের রোজগেরেও বড় কম নয়। এদের সবাইকেই বিদায় জানিয়ে চলে যাব।

সত্যি কথা বলতে কি সংসার শব্দটিকে আমি ভুলেই যেতে বসেছিলাম প্রায়। আজ আবার পুরনো শব্দগুলি ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে—ঘর, গৃহী, গৃহস্থালী।এখন আমার মাথাটিও সদ্য নির্বাচিত এম এল এ সাহেবের দরবার যেন। মাযের মশলাপাতির কৌটো, বাবার রুমালে ভাজ করা মাদক ইত্যাদি সবই পাওয়া যাবেএখানে। আরেকটা কথা মাকে কোনদিন বলা যায়নি, ফলে প্রতিকারও করা গেল না। ঘরের মধ্যে ঘরে যখনই জুঁইয়ের মাসিক বস্তুটি শুকোতে দেখি—বুক কচ্ কচ্ করে। বাল্যকালেও এমনি টুকরো কাপড় চোখে পড়ত। কিন্তু এখন তো অভাব নেই আমাদের। জুঁই কেন সেনিটারি ন্যাপকিন ইউজ করে না!

আর দেরী করলে চলবে না আমার। আগে বাড়ি গিয়ে বুড়া বুড়িকে খবরটা দেই! তারপর সারথিদের বাড়িতেও যাওয়া যায় ইচ্ছে করলে।

যে নরককুণ্ড থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছি, শাণিত পেছন ফিরে পত্রিকা অফিসটাকে দেখে। আর ফিরে যাব না।

—দাঁড়া ভাই দাঁড়া। কাগজটা দেখে নে আগে!

—অত সময় কই ?

শাণিত হনহন করে হাঁটছে টেম্পো স্ট্যাণ্ডের দিকে। এপর্যন্ত এই জীবন—পুরো ব্যাপারটাই আবার নূতন করে ভেবে দেখতে হবে।

—আমি যাচ্ছি না তো! কোথাও যাচ্ছি না। শুধু বললাম সুযোগ এসেছে আবার। আগের চাকরি ফিরে পাইনি যদিও। তাহলে তো কোন কথাই ছিল না। এককালীন অনেকগুলো টাকা পাওয়া যেত। যাই হউক ওরা শাস্তি দিল আমাকে। একই পদে নূতন করে চাকরি দিয়েছে। তাই বলছিলাম—ইচ্ছে করলে এখন আমি মিউচুয়েল ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে পারি। আগে যা মাথায় আসেনি কখনও। সেখানে গেলে হয়ত আর উদ্বাস্তু হওয়ার ভয় থাকবে না। কিন্তু যাওয়া হবে না কারণ আমি বাড়ি করে ফেলেছি এখানে। ইট কাঠ পাথরের বড় মায়া। তাছাড়া জুঁই তো সাফ্ সাফ্ কথা বলে—তোরা গেলে যা—আমি যাবনা।

তবে একটা কথা ঠিক—আবার যখন চাকরি পেয়েছি তখন নিত্যকর্ম জীবন নিয়ে আমাকে ভাবতেই হবে। আর না —যথেষ্ট হয়েছে! এখন থেকে নো ইউনিয়ন এসোসিয়েশন নো রাজনীতি। বন্ধু বাছাই করতে হবে আবার। পুরনোদের যদি পরিত্যাগ নাও করি—নূতন বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে মঠ চৌমুহনী গেঁদু মিঞার বাড়ির কাছে একজন আনোয়ার আলির সঙ্গে।একসময় যাদের জোর করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল !

এবার স্ট্র্যাটেজি হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। অফিস আর ঘর। ঘর আর অফিস। শুনেছি ছোটবেলায় উলবোনা সেলাই শেখার প্রতি আমার ঝোক ছিল। আর মায়ের আঁচলে আঁচলে ঘোরা শুধু।

আবার আমি মায়ের ফাইফরমাস খাটব । জুঁইটাকে দেখি একবার মাষ্টারের বাড়ি যায়, আবার বন্ধুদের বাড়ি থেকেও নোট করে আনে—কী করে বুঝি না । এবার থেকে আমি হেলপ করব । তারপর সেই অসমাপ্ত কাজটিও তো শুরু করতে হবে আবার—লেখালেখি। একরকমের অন্ধবিশ্বাস। আমি বিশ্বাস করি আমার দেখাশুনা একটু অন্যরকম—ঠকে শেখা। ক্রমাগত সন্দেহ মুক্তিতেও অভিজ্ঞতা অর্জন করি আমি।

মন খারাপ হয়ে যায় যখন তখন। এখনও হচ্ছে। আবার সেই এ জি অপিসের মরা ভাউচার ঘাটাঘাটি করতে হবে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে হত্যা উল্লেখ কবলেও সেখানে কিছুই যাবে আসবে না । আমাদের আইনরক্ষক হিসাব রক্ষকেরা যে কি চায় বুঝা মুসকিল ।

ফিরে ফিরে ভয় করছে । সে কি সত্যি মেইন স্ট্রিমে ফিরে আসতে পারবে ? উগ্রপন্থীদেরে যেভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয় সেভাবে শাণিতকেও কি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাখা হবে কিছুদিন। যে ভুলভুলাইয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছি–আর কি বেরিয়ে আসতে পারব? জয়সিংহ, জগদীশদা বা পঙ্কজ তলাপাত্র কি ছেড়ে দেবে আমাকে ?

পত্রিকা অপিস থেকে বেরিয়ে শাণিত হাটতে শুরু কবেছিল টেম্পো স্ট্যাণ্ডের দিকে। এখন ছুটছে। ইদানিং এমনই হয়। কখন যে নিজেকে বদল করে ফেলে বুঝতে পারে না। আবার থমকেও দাঁড়ায়। অত দুশ্চিন্তার কি আছে ! বিপদ থাকলে মুক্তির পথও আছে। আবার কি চাকবি হয়নি তোমার ?

শাণিত একটা সিগারেট ধরায়। সামনেই পুরনো আর এম এস চৌমুহনী—জি বি যাওয়ার টেম্পোস্ট্যাণ্ড। সে নিজেই এখন দ্বিপদ যান। ধূঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যাচ্ছে। স্বচ্ছন্দ পৌঁছে যায়। ড্রাইভারদের জটলায় চোখ রেখে একটা পান-দোকানের গা ঘেসে দাঁড়ায়। হাওয়া আছে এখানে। একটু আগে আমি কোন্ রাজ্যে ছিলাম। এখন কোথায় ! আর তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বুড়াবুড়িকে যে খবরটা দেবে সে-পথেও কাটা—এতক্ষণে তিনজন মাত্র প্যাসেঞ্জার হয়েছে, লাগে ছয় জন।

আর হতাশ বোধ করলেই তার মাথায় বুড়বুড়ি উঠে। সে ভাবে চারদিকে চারটি রাস্তার মধ্যে তিনটিই যদি বন্ধ করে দেয় বিদেশীদের দালাল উগ্রপন্থী জয়সিংহ, সাংবাদপত্র ব্যবসায়ী সামাজিক শত্রু জগদীশ এবং নরকের রাজনীতিক পঙ্কজ তলাপাত্র—তাহলেও তো আরো একটি পথ খোলা আছে। গেছে ঘরমুখী। আমরা সব সাধারণ মানুষই গৃহবন্দী। সেই ভাল। কিন্তু মা কেন ইদানিং ষোল আনা দায়িত্ব নিতে চায় না আমার ! এমনকি জুঁইটাকে পর্যন্ত বিদায় করে দিতে চায় এখনই ! তাহলে আমি কোথায় যাব ? আমার মাস্তান বন্ধু সারথি দেববর্মার বাড়ি ? আমি কার হাত থেকে রক্ষা পেতে কার কাছে যাব ? জগদীশ, জয়সিংহ বা পঙ্কজ তলাপাত্র কি শুধুই ব্যক্তি বিশেষ ? নাকি ওরাই আমাদের এম এল এ এম পি — আইনের যাবতীয় ফাঁকফোকর ? মাত্র একজন সাহসী সারথি দেববর্মা তাদের কী আর ক্ষতি করতে পারে !

আসলে আমি যাব লালিমা দেববর্মার কাছে। সে কেন সব সময় প্রশ্রয় দিয়ে থাকে ! তোমার ভুল হচ্ছে লালি ! ভাবছ আশ্রমের মত মাইট্যা কোঠা—লেপা পুছা স্নিগ্ধ ! ভুল করছো। পা মাড়িয়ে মারিয়ে দূর্বাঘাস মেরে আমরা বলি উঠান। গোপাট দেখেছো তো ? শিয়ালমুত্রি আর ফনি

মনসার জংগলে ঘেরা। কবুতর, হাঁস-মুরগি, পানা পুকুর দূর থেকে যত টানে— কোনদিন কাছে গিয়ে দেখেছ কি? জ্যোৎস্নার চাঁদকে কুঁড়ে ঘরের লন্ঠন কল্পনা সুখের নয়। আমার তো মনে হয় বিদ্রুপ ! আর জল জংলার জোঁকে রক্ত শুষে নেবে তোমার।

তবু একটা জল মাকড়সা কেমন তড়পায় দেখ লালি ! আমার আশ্রয় লাগে গো ! এই মুহূর্তে যে সবচে দুঃখী অথচ যার হাতে ভিক্ষাপাত্র নেই (আমার আছে) তেমন রমনীয় আশ্রয় লাগে। বেঁচে থাকার প্রশ্নে কে না স্বার্থপর বল ? আমি তোমার মত নই। ত্যাগের মধ্যে কিছু নেই রে বোকা মেয়ে !

যত ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস খুঁড়ে খুঁড়ে আমি কি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি ? চলো অন্য কোথাও চলে যাই। যেখানে আর যাই হউক রাজকুমারী সম্বোধনে তোমাকে কেউ বিব্রত করবে না। কিন্তু কি করে যাবে লালিমা ? সীমান্ত পার হওয়ার আগেই ঝাঝরা করে ফেলবে নাকি ওরা ! ওদের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব না। তারপরও বাঁচতে চাই আমি— বলির পাঁঠা যতক্ষণ বাঁচে ! কাঁদে আর কাঁঠাল পাতা খায়। আমার গলায় জবাফুলের মালাটিও যেন তুমি ! মৃত্যুর আগে কী অপরিসীম খিদে পায় জানো তো ? তখন তোমাকেও খাব।

— ও দাদা ! ও দাদা ! গাড়ি ছাইড়া দিল তো !

শাণিত থতমত হাতের ভরা দেশলাইটা সিগারেট কুচি ভেবে ছুঁড়ে দৌড় দিয়ে উঠে গেল টেম্পোতে।

আর তো নেমে পড়ার সুবিধে নেই। ড্রাইভার সহ সবারই ভুরু কুঁচকে রয়েছে। কেন যে উঠতে গেলাম ! ধীরে সুস্থিরে গেলেই হত। অবশ্য তর সইছে না তার, পাখা থাকলে উড়ে যাওয়া যেত। তাছাড়া যখনই যাবে কাঁঠাল গোজা খাবে। ছোটখাঁটো একটা বাক্সের মধ্যে ড্রাইভার সহ সাতজন বসে। ভারতের অন্য কোন ক্যাপিটাল সহরে এমন শুনিনি। স্যরি দাদা, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তবু পেছনের প্যাসেঞ্জাররা আমাকে জায়গা ছাড়বে না বুঝে চালকই মুখ খুললেন— আগে পিছে আগে পিছে ! সাপোর্ট পেয়ে শরীরটাকে আমি সিটের ফেনসিং পর্যন্ত ঠেলে নিলাম।

এখন স্পিড পেয়ে গেছে গাড়ি। একটু আড়ালে হলেও বাতাস খেলতে শুরু করেছে আমার শরীরে। আহা চাকরী ! আবারো হাতের মুঠোয় তিন তাস —ইস্কাবন হরতন রুহিতনের বিবি।

—কিঅ দাদা জিলকি দিত্তাছেন যে বড় !

শাণিত হাসে — স্যরি ছাড়া তরী নাই।

তখন লাফিয়ে টেম্পোতে ওঠার সময় আরো একটা অনুভূতি হয়েছিল। প্যাসেঞ্জারদের হাব ভাব দেখে তা নিবেও গিয়েছিল। আবার জ্বলে উঠল এখন। আমার পিছু পিছু পঙ্কজ, জগদীশ, জয়সিংহ ওরাও কি এসেছিল ? এত ফসকা গেরোর নোঙর কোনদিন দেখিনি। নৌকোয় পা রাখতেই নদীর মাঝামাঝি। আর পারে দাঁড়িয়ে ভূতেরা নিজেদের হাত নিজেরা কামড়াচ্ছিল।

ধুর শালা ! সারাদিন সেই দুষ্ট লোকদের নিয়ে ভাবছি কেন ! এখন ক'টা বাজল কে জানে ! শাণিত এপাশ ওপাশ করার বৃথা চেষ্টা করে দেখল !

পৌনে একটা।

সকালের ছত্তর বাজার কি এখনও খোলা ? আজ অন্তত কিছু একটা নেওয়া উচিত। বুড়াবুড়ির বাজার, কি করে কি খায় ওরাই জানে। আর জুঁইটা শুধু বাছতে বাছতে গেল। এটা না ওটা না। কিছু করার কথা বললেই তিন লাফ দিয়ে উঠে। কাজের মানুষ আছে যদিও। বুড়াবুড়িকে সময় সময় সাহায্য করারও তো প্রয়োজন আছে। পরের লোক আর কত পারে। এখন আমি যদি কিছু না নিয়েও যাই, কোন খবরও না শুনাই, তবু মা একটা কিছু রান্না বসাবে আমার পছন্দমত, কারণ আমি তো মাঝে মাঝেই ডুব দেই। বাড়ি যাই না। গেলেও দুপুরে খাই না। রাতে ওরা খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলে তখন। মা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লে খেয়ে এসেছি বলতেই হয়। তবু শুনে না বুড়ি।

বলে খালি খালি মাছ ভাজা খা।

—কি হল দাদা ?

—স্যরি।

—ক'বার হল ?

—স্যরি।

মা ছাড়া আরেকজন আমার পছন্দের খাবার জানেন। তিনি কাকিমণি। শিলচর শহরে থাকেন। নাম হাসি। যারা তার নাম রেখেছিল—দে ওয়্যার অলসো গ্রেট — কাকিমণির আরো একটা নাম হওয়া উচিত অন্তরস্রোতা। আমরা মজা করে বলতাম - তোমার ব্লাড সুগার হয়েছে কেন বলো তো?

— কেন ?

— মিষ্টি স্বভাব।

আর কানমলা খেতাম— মা মাসির সঙ্গে ফাজলামো !

অনেকক্ষণ ধরে আমি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আপনারাও কি শুনছেন? সবাই শাণিতের দিকে দেখল কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। শুধু ড্রাইভার একই ভঙ্গিতে থেকে অভয় দিল - পুরনো টায়ারের শব্দ। তবুও শাণিত কান পেতে থাকে- প্রাণ বলে কথা! শব্দটা আরেকটু বাড়লেই হল। সাইডে আছি। দেব লাফ। আরে! আরে! হারাধন সংঘের সামনে এভাবে টার্নিং কাটছে কেন টেম্পোটা। শুধু শুধু। কোন গাড়ি ঘোড়ার লক্ষণ নেই। ট্রাফিক পুলিশ পর্যন্ত হেই হেই করে উঠল। শালার টেম্পো থামল বিকট শব্দ করে। আরেকটু হলে ক্লাবের ছেলেরা যে লেইকের জলে মাচা বানিয়ে দুর্গাপূজা করে, সেখানেই পড়ে বিসর্জন হযে যেত আমাদের।

এক অদ্ভুত অনুভূতি! আরেকবার প্রমাণিত হয়ে গেল আত্মা বলে সত্যি কিছু একটা আছে, প্রকৃত বিপদের সময় যে স্বার্থপরের মত আমাকে ফেলে চলে যেতে চায়। গলার কাছে বেদম কড়া নাড়তে থাকে। আমার শরীরই ধন্য শরীর পুণ্য — সেই তো এখন প্রাণপণ যুদ্ধ করে ছিপি বন্ধ করে রাখল। এই আমার মাতৃদত্ত দেহ। এবং তিনিই দীর্ঘবাহু সেই মুহূর্তে আমার মা ছাড়া আর কেউ না —টেম্পো গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরে বাঁচিয়ে দিলেন আমাকে।

তবে এও মিথ্যে নয় যে মা কিছুটা সেলফিশ হয়ে পড়েছে ইদানীং। আমার প্রতি বা আমাদের প্রতি তার ভালবাসার কমতি নেই যদিও। তবু বলছি মা কিছুটা সেলফিশ হয়েছে। এই বয়সে প্রচুর গয়না বানায়, গয়না পরে। বলে— যা কিছু দেখতে পাচ্ছ সবই সত্য নয়। অলঙ্কার অলঙ্কারই। জুই জুইই। বিয়ে শাদী দিতে হবে না বোনের! সময় থাকতে তৈরী হয়ে না থাকলে শেষে বিপদে পড়তে হবে। তবু কোথায় যেন খটকা লাগে। ইদানীং মা আমার মুখে মদের গন্ধ, চালচলনে অসঙ্গতি দেখলেও কেন বকাবকি করে না! কেন! তবুও তিনি আমার মা— স্বর্গাদপি গরিয়সী। জীবনে সুখ দূরে থাকুক, স্বস্তি পাননি কখনও। এখন না হয় পানের সঙ্গে চুন আর সাদা পাতা ছেড়ে জৌনপুরি খয়ার ধরেছেন, সুগন্ধি জর্দার কৌটা খুলে চিমটি চিমটি মুখে ঢালেন।

অনেক গালাগাল খেয়েছে আমাদের টেম্পো গাড়ির চালক। দু'একটা চড় থাপ্পড়ও পড়েছিল মনে হয় টেনসনের মুহূর্তে। এখন আবার চলতে শুরু করেছে। তিন চাকার গাড়ি- সাবধানে চালাতে হবে বৈকি! তার শান্ত মুখমণ্ডল দেখে আমার হাসিও পাচ্ছে ভালও লাগছে খুব। আমাদের জুঁইটাও এমনি। প্রথমে খুব হৈ হট্টগোল করবে। মায়ের হাতে বিনুনি ঝাকা খাবে দুই তিনবার। তারপর ঠাণ্ডা। ইদানীং খুবই ফুটানি হয়েছে। সিকো হাতঘড়িটা সব সময়ই লক্ষ্য করেছি- বেল্ট বাধতে বাধতে গেইট খুলে রাস্তায় নেমে আসে। মাঝে মাঝে পাতলা সুগন্ধ পাই। অবশ্য আমি তো আর ঝেঁকে দেখতে পারি না- তার সঙ্গী অন্য কোন বান্ধবীরও হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল যত স্টাইল করে- আমরা তত পারিনি। অবশ্য আমার কোন দুঃখ নেই তাতে — যখন যেমন তখন তেমন।

মিথ্যে কথা ! খুব যে নিজেকে একজন মহাপুরুষ ভাবছ ! দু পয়সা উপরি কামিয়ে এত ফুরফুরি ভাল নয় হে শাণিত সেনগুপ্ত ! বন্ধুদের কর্ডের প্যান্ট আর নাইলন ডেক্রনের সার্টের কথা কি ভুলে গেলে? তোমাদের পাশের বাড়ির অঞ্জন-নির্মল ! স্কুলের খাতা বই খালি পা। ওদের পোষাক আষাক আর প্রথম হাওয়াই চপ্পলের দিকে তুমি কি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে মনে আছে কিছু ?

শাণিত হাসে। তবে কো-প্যাসেঞ্জারের ভয়ে নড়াচড়া করে না। তার দুশ্চিন্তা হল শহর থেকে ফিরে যাচ্ছি খালি হাতে। জি বি বাজারে কয়টা ভূষিমালের দোকান ছাড়া আর কিছু নেই। ফলে মাছরাঙা পাখি আজ আস্ত রাখবে না আমাকে। তাছাড়া মায়ের কাছেও সহজে ভিড়তে পারব মনে হয় না। রবিয়ে রবিয়ে আটদিন হবে। এই আসছি বলে যে বেরিয়েছিলাম আর ফেরা হয়নি। আজ প্রথমেই যাকে হাত করতে হবে তিনি আমার বাবা দিব্যেন্দু। লোকটার বড় দোষ আলস্য। অভাবে থাকলেও যা প্রাচুর্যে থাকলেও তা। আগে একটা শিখা বিড়ি অন্তত তিনবার জ্বালিয়ে সূতা পুড়ে শেষ করত। তারপর ধরল চারমিনার। এখন উইলস ফিল্টার খায় । যদিও তার বালিশের তলায় চারমিনার বিড়ি সবই পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে আনকোরা, কম বেশী ব্যবহার করা দেশলাই। মায়ের সঙ্গে তার ঝগড়ার এটাও কারণ। বাবা যেখানেই দেশলাই দেখবে গুছিয়ে রেখে দেবে তার বালিশের নিচে। আর মায়ের যখনই দরকার পড়বে তুলে নেবে সেখান থেকে।

এই যে এখন আমি একঝাঁক বাতাস নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছি বা আবিরে রাঙিয়ে দিতে যাচ্ছি ওদের ! প্রিয় লোকজনদের মধ্যে শুধু দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত ছাড়া আমার আবার চাকরির খবরে কেউই প্রভাবিত হবে না । কেনই বা হবে? অপেক্ষাকৃত খারাপ থাকতে চায় কে ? আম দিয়ে কাম বড়া দিয়ে কী হবে? তবু, অতসী এবং জুঁইয়ের সামনে প্রথমে উসখুস করবেন দিব্যেন্দুবাবু। তবু ওরা যেতে না চাইলে তিনি নিজেই চলে যাবেন অন্যঘরে। ফাঁকতালে ফিরে আসবেন আবার। তার নিচু স্বরে কথাও সবাই শুনতে পায়—অভাবে স্বভাব নষ্ট হলে দোষ নেই। আবার শত অভাবেও যে বেঠিক পথে চলে না—সে'ইতো প্রকৃত মানুষ। ডাল ভাত খেয়ে সৎপথে চলার আরো একবার সুযোগ এসেছে তোমার!

আমরা এইবার আস্তাবল ব্রিজের উপর দিয়ে জি বি চৌমুহনী যাচ্ছি সাঁ সাঁ করে। আরেকবার ১৯৭৩ সালে এ জি অফিসে চাকরি পেয়ে এভাবেই পার হয়ে এসেছিলাম মনু নদীর ব্রিজ। এবং সেই লোহার পুলে চার চাকার গাড়ি উঠা মাত্রই মনে পড়ে গিয়েছিল— আসাম দেশের পাহাড় লাইনে রেলগাড়ির গম গম শব্দ। নিচে পাথুরে নদী জাতিঙ্গার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

আমি তখন শিলচরে কাকার বাড়িতে থেকে জি সি কলেজে পড়াশুনা করি।বন্ধু বান্ধবীরা মিলে হঠাৎই ঠিক করে ফেল্লাম পাহাড়ে যাব। জাতিঙ্গা নদীর কাছে যেখানে জল পাথর এবং মাছেদের রঙ সমানভাবে রূপালী। নস্যি রঙের মাছও আমি সেখানেই প্রথম দেখি। প্রকৃত ক্রীড়াচ্ছলে মীন। বার বার পায়ের পাতা ছুঁয়ে যাবে অথচ ধরা পড়বে না, এমন পিচ্ছল।

যাবার সময় জোর করে গলায় মাফলার জড়িয়ে দিয়েছিলেন কাকিমণি—অতো বাবুগিরি করলে চলবে না। সামনে বি এ ফাইন্যাল পরীক্ষা । ওখানে শীত বেশি। আমাদের টিমে ছিল মানিক, লিলি, বিমল, শ্যামল, বেণু, মাধব, ইলু, উমা, রুবি, আর পার্থ। এখন যেমন সেলিম আলির সঙ্গে জাতিঙ্গা পাহাড়কেও সবাই চিনে জানে—আগে তেমন ছিল না। আমরা যখন স্টেশনে এসে নামলাম তখন মস্ত বড় একটা লাল বল পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল। তারপর যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম সে পথও রাঙা হল। তবু ইন্ধন ফুরিয়ে যাওয়ার জন্মগত জুজু আমাদের তাড়া করে। জাতিঙ্গা নদীর পাড়ে অথচ ঘোর জঙ্গলের মাঝেই আমরা তাঁবু খাটালাম। আর শুধু পাথর। একেকজন একেকটা চাঁইয়ের উপর বসে পড়ি। উমা রুবি ওরা নুড়িতে বসে ভিজিয়ে রাখল পা, যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়।

স্থান নির্বাচনের সময়ও জানি কেন যাচ্ছি, এখনও জানি কেন এসেছি এখানে, তবু কেউ কথা বলছি না। ক্রমশ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি। আগুন জ্বালিয়ে আদিম হয়ে ওঠা অত সোজা নয়।

আমাদের সঙ্গে পাউরুটি, পাঁঠার মাংস পিস্ পিস্ করে তেল মশলা মেখে নিয়ে এসেছি। বাকি শুধু রান্না করে খাওয়া। তেজ হাওয়া বইছিল তাই তিন টুকরো পাথরের চুলায় শুকনো লতা পাতায় ইলুর আগুন জ্বলেও জ্বলে না। একবার লক্ লক্ করে ভেড়াভেড়ির মুলি বাঁশ ফটাশ করে পুরণো জল বের করে দেয়। আর কেঁদে উঠে ইলু। তখন মরোন্মুখ সেই পাখিগুলি বোধহয় আমাদের চারপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। এমনি হঙ্কা বাতাসে এখনও মাঝে মাঝে আমার গায়ের লোম পুড়ে যায়।

এবার থেকে থেকে নামছিল আমাদের টেম্পো। ব্রেক কষে নামতে থাকলে বুঝা গেল আমরা শ্যামলীবাজারের ডাউন নামছি। সামনেই জি বি চৌমুহনী। টার্মিনাসে কট মট করে কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শাণিত এখন খুবই শান্ত। টেম্পো থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিরিবিলি খুজে এসে দাঁড়াল একটি বন্ধ টঙ-দোকানের ছায়ায়। ধুমপানের ইচ্ছা। এখানে এত ভিড ভারাক্কা যে সামান্য দেশলাই কাঠির আগুনও অনেকের দৃষ্টিগোচর হবে। তাই ঠোঁটে সিগারেট গুজে দাঁড়িয়ে থাকে কত সময়, জ্বালায় না। এখান থেকে যতদিকে যত রাস্তা গেছে সবই দেখা যায়। কুমারী টিলার দিকে, শ্যামলী বাজারের দিকে, জি বি হাসপাতালের দিকে, ছন্তর বাজারের দিকে, সেভেনটি নাইন টিলার দিকে এবং সবশেষে জগৎপুরের দিকে যে রাস্তা গেছে সেদিকেই তার বাড়ি। মূল শহরের আকর্ষণ যদি হয় ত্রিপুরার রাজবাড়ী তাহলে আমাদের এখানে নিঃসন্দেহে জি বি হাসপাতাল। বোজদিন হাজার হাজার মানুষ আসে রোগ শোক নিয়ে। নিরাময় হয়েও ফেরে অনেকে।

এতক্ষণ পর সিগারেটে আগুন ধরাল সে। আয়েস করে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ক্লান্তিও আছে অবশ্য, তবে কায়িক পরিশ্রমের নয়। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লে যেমন লাগে তেমন। এতদিন যত ক্রোধ, ঘৃণা আর প্রতিশোধ স্পৃহা বয়ে ফিরছিল, আজ দ্বিতীয়বার সরকারি চাকরি পাওয়ার সংবাদে পোড়োবাড়ির চুণ সুরকির মত ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে গেল সব।

আমার হাতে এখন ট্রাম কার্ড আছে। আমি যে স্টেকেই ছুড়ে মারি না কেন—সেটাই হবে আমার। শাণিত এক দৌড়ে মাছ বাজারে গিয়ে থমকায়। সব শূন্যস্থান থেকে অজস্র নীল মাছি এসে ঝেকে ধরে যেন সেও একটি মাছ—একটু পরেই পচে যাবে। হাসে শাণিত। দেখে দূরে আরো একটি মানুষকে ঝেঁকে ধরেছে নীল মাছি—

—আইয়েন বাবু। আইজ আমরা দুইজনই লেইট। এইটা আমার পুকুরের মাছ। বেলা গুয়াইয়া আইছি। তাড়াতাড়ি লইয়া যান।

শাণিত দেখল কম বেশি দুই কেজি ওজনের রুই মাছ তাজা। এতটা লাগে না! কিন্তু বেটার কাছে দাড়িপাল্লা বরফ কিছুই দেখছি নাতো!

—কত চাই ?

— একদাম পঞ্চাশ টাকা দিয়া নেন গিয়া বাবু। বাজারের টাইমে এমন দামে পাইতেন না।

শাণিত আর কথা না বাড়িয়ে, নিয়ে নিল। মাংস বিক্রির টংটাও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কয়টা কাক এবং কুকুর শুধু ফিরে ফিরে আসে। শাণিত জানে বাজারের পেছনে খাস জমিতে ঘর বানিয়ে থাকে খালেক। আর দাঁড়ায় না। শর্টকাট দৌড়ে মাইট্যা সিঁড়ি ডিঙিয়ে সোজা তাদের উঠানে গিয়ে দাঁড়াল।

— কেমন আছো চাচা ?

—কিতা লাগে ভাইর বেটা ?

—মুরগি। পয়সা পরে দিমু। আছে কিন্তু দিতামনায়।— আরতা কিনিয়া নিতাম অইব।

—আগে কিতা লইবায় লও? দেশি না বয়লার?

—দেশিউ ভালা—কিতা কও চাচা!

কথা বলতে বলতে শাণিত হাসে। খালেকও হাসে। বুচ্ছনিরেবা—বাড়ি ঘরেও আইজ্ কাইল কেউ সিলেটি কইন না!

—ঠিক কইছ বাতিজা। খালেক বাঁশের ভার দেখিয়ে বলে—লই লাও তোমার যেটা ইচ্ছা।

শাণিত ভারে হাত ঢুকিয়ে কেজি দুই ওজনেরএকটা দেশি মুরগী তুলে। কক্ কক্ করে উঠে। অথচ একবারও ভাবে না—এত মাছ মাংস কে খাবে! এই অসময়ে কাজের মাসী না থাকলে মায়ের পক্ষে রান্না করাই তো মুসকিল। উচিতও না। সুতরাং ভরসা ফ্রিজ।

শাণিত আবার বাজারে ফিরে আসে এবং যে দোকান থেকে চটের থলি কিনতে যাচ্ছে সেখানে সবই পাওয়া যায়। আলু আদা পিয়াজ রসুন গরম মশলা সব। তারপর চানার ডাল, তিল তেঁতুল আর বিশ্বাস না হলেও এখন এই মহাদেব ভাণ্ডার থেকেই সে বড় বড় সাইজের একশ গ্রাম সিদল কিনে নিল। কিন্তু মুসকিল হল কুমড়া পাতা কোথায় পাওয়া যাবে?

বাজার থেকে বেরিয়েই ফলপসারির দোকান থেকে ছয়টা এলাচি লেবু কিনে নিল। পকেটও পাতলা হয়ে এল প্রায়। এতেই থলে ভরে গেছে। কানকায় বেত বেধে মাছ আর পায়ে দড়ি বেধে মুরগি ঝুলিয়েছে আরেক হাতে। রিক্সা নিতে হবে।

রীতিমত ঘামছে শাণিত। আবার সিগারেটের ইচ্ছা হলেও উপায় নেই। দুই হাতে দুই বোঝা নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। ইন্দ্রনগরের দিক থেকে একটা রিক্সা আসছে যদিও সওয়ারী আছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। আমার বাড়ি কিন্তু খুব দূরে না। এখান থেকে পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ হবে। হলেও আরাম করে যাবে আজ।

হঠাৎ একগুচ্ছ হাত অক্টোপাসের মত পেঁচিয়ে ধরে শাণিতকে। সুপুত্র! চাকরি পাওয়ার সংবাদ শুনেই মাছ মাংস নিয়ে যাচ্ছ বাড়িতে। বন্ধুবৎসল হও শালা! আমাদেরও খাওয়াতে হবে। তার আগেই বাজারের ব্যাগ রমাপদ প্রদীপ হয়ে তরুণদের হাতে চলে গেছে। আরো কিছু চোখ এক সঙ্গে মিলে এখন খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে সবকিছু। শাণিত হাসে—লঙ্কা ছাড়া কাঁচা খাবার মত কিছুই নেই। আর তখন থেকেই দীপু কৌশল নিয়েছে—কোলাকুলির—তোর আবার চাকবি হয়েছে ভাই! আর ছাড়ছে না। উপায়ান্তর না দেখে ওর ইস্ত্রি করা সার্ট পেন্টে আমি মাছ লাগিযে দেওয়ার ভয় দেখলাম। কাজ হল। দেখ্তো ক'টা বাজে?

দীপু ঘড়ি দেখে—এ্যাই সেরেছে রে! একটা পঁয়ত্রিশ। টিকিট পাব না। আজ অফিসে যাইনি।সিনেমায় যাব আমরা। আর শোন! তোব তো দেখাই পাওয়া যায় না। ৭৯ টিলার মেসটা ছেড়ে দেব ভাবছি। তোদের দিকে ঘর বাড়ি পাওয়া যায় কিনা দেখিস তো! কত জায়গায়ই তো ঘুরলাম। সংসার করলাম কত মানুষেব সঙ্গে। কোনটাই টিকল না। এবাব একটা মেস করব—এক্সক্লুসিভ ফর্ এজি ষ্টাফ।

—নমস্কার দীপক সেনগুপ্ত। আপনি আপনার পথ দেখুন! আমরা কোথাও যাচ্ছি না। আমরা যাব—বলেই ওরা আমার দিকে তাকাল—নির্মল ভট্টাচার্য্য বিজয় চন্দ সুদীপ দাস। যাব শাণিত সেনগুপ্তের বাড়ি। খাব কী বল তো?

—একবার তো খেয়ে এলি!

—আবার খাব। কী কী খাব?

— কি কি?

—পোস্তের বড়া, বুটের ডাল, কুমড়া পাতা দিয়ে সিদল বড়া ইত্যাদি।

—ব্যাস্?

—মাছের কালিয়া, মাংস, তিলের টক।

—বাব্বা!

—সঙ্গে এক পিস্ এলাচি লেবুও আছে।

হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা। — চল্ না সবাই মিলে যাই! খুব মজা হবে। বাড়িতে

কেউ কিছু জানে না এখনও।

ওরা শাণিতকে এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরল সবাই—নারে আজ না। আরেকদিন যাব। যদিও খাব না! তোর দ্বিতীয়বার চাকরি উদ্‌যাপন করব আমরা কিংডম হোটেলে।

রিক্সায় উঠতে উঠতে শানিত ভাবে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে ভাড়াও দিতে হবে বেশি। আর এতসব হাট বাজার সবই মাটি হয়ে যাবে যদি বাড়িতে ওরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে!

—তাড়াতাড়ি চালাও হে সহিস!

—বাবু?

— না কিছু না।

এটা ঠিক—আমার এ জি অফিসের বন্ধুরা যে মেনুর কথা বলল একটু আগে— আমাদের বাড়িতে তার খুব কদর। আমরা প্রত্যেকেই পছন্দ করি আইটেমগুলি আর ওদের ইচ্ছে মত যদি নেমন্তন্ন খাওয়াতেই হয় তাহলে আরো লোকজন আছে আমার। অনুপ সারথি সুমিত ছাড়াও আছে গল্পকার দীপক দেব, রণজিৎ রায়, কবি কিশোর রঞ্জন দে। অনেকদিন ধরে আমি কোন লেখালেখি করি না। আমার বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু ওরা করে। বেশ নাম ডাকও হয়েছে। আর লালিমা দেববর্মাকে বলব, যদি আসে। শাণিত প্রায় লাফ দিয়ে নামল রিক্সা থেকে। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল তার। বেটার হাতে খুচরো-টুচরো মিলিয়ে সাত টাকা তুলে দিল। মুখে বলল—সর্বস্ব। ভাড়া তিন টাকাই অবশ্য। বাকিটা লেইট ফি। তারপর দৌড় দিল। কিন্তু গেইটে তো শব্দ হবেই। কলিং বেল টিপলেও এখন বুঝে ফেলবে জুঁই। আমি কয় টিপ দেই, কত সময় ধরে যন্ত্রনা করি সবই তার জানা। তাই দরজায় টোকা দিল। একই সঙ্গে বাজারের ব্যাগ পায়ের নখ ইত্যাদি দেখতে দেখতে ভাবছে—আমাদের বাড়ির প্ল্যানটা বেশ বড়। একদিক কমপ্লিট করে ঢুকে পড়েছি। আরেক দিকে কাজ শুরু করার কথা ছিল ইতিমধ্যে।

আর শুনতে পাচ্ছে, বোধহয় বাথরুম থেকেই হবে, কে কে করে এগিয়ে আসছে জুঁই!

—টেলিগ্রাম!

ছিটকিনি খোলার শব্দ হল ঘটাং। ফলে টাল সামলাতে পারলাম না কেউই। কই মাছের লেজ গিয়ে লাগল তার গালে। বার্স্ট করার কথা! কিন্তু সামান্য ভুরু কুচকালো শুধু। আর শাণিতের চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না। আঁচল দিয়ে গাল মুছে নিল এক ফাঁকে—

—কাকে চাই? শাণিতকে? এ বাড়িতে থাকে না।

আবার ভেতরেও ঢুকতে দিচ্ছে না এখন। কী আর করা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুইটা কানেরদুল লক্ষ্য করতে থাকি। সূর্য প্রতীক। চারপাশে কাঁটা কাঁটা আগুনের নিশান। মা বলেছিল—এখন থেকে যা-ই করা হউক না কেন—ওর বিয়ের কথা মাথায় রেখেই সব করতে হবে। কার বিয়ে? কাঠবিড়ালি উপযুক্ত হল কবে! এখনও তিড়িং তিড়িং লাফায়! আবার আমাদের মিনিটার মতই তাকিয়ে রয়েছে দেখ—মাছ ও মুরগির দিকে!

সবই বিফলে যাবে তোমার! বুড়া বুড়িকে আজ পটানো যাবে মনে হয় না। আমি যে আমিও বেগে রয়েছি। ভাত খাওয়াও বলে মাথা কিনে নিয়েছ নাকি! তিলে জলে উদাও হয়ে যাবে! যখন খুশি! তারচে একেক পাত্র বিষ তুলে দিও আমাদের হাতে! একবারে মুক্ত হয়ে গেলে! যেন দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত কথা বলছেন—

আরেকবার মাছটা মুখের কাছে নিয়ে আসতেই ছিটকে সবে গেল জুঁই। বুড়ি ছুঁইয়ে দিল শাণিত। বাবা সবসময়ই খাওয়া দাওয়া শেষ হলে এই ইজি চেয়ারে বসে থাকেন। অর্থাৎ যা ভয় করেছিলাম তাই হল! ওদের খাওয়া দাওয়া বোধহয় শেষ। এখন বিশ্রাম চলছে। বাবা যে চশমার ফ্রেইম বদলে ফেলেছে আগে দেখিনি। চিকন গোল্ডেন। কিন্তু কানের কাছে চেইন নিশ্চয়ই

জুঁইয়ের কাজ হবে ! ভালই হল পড়াশুনা না থাকলে বুকে ঝুলতে থাকবে চশমা ! এখন এত মনোযোগ সহকারে পত্রিকা পড়ছে কেন বাবা—এটাতো দিবা নিদ্রার সময়। আজ বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হবে। মা ঠাকুরের বাসন মাজছে সিঁড়িতে বসে বসে, তাহলে কি খাওয়া দাওয়া হয়নি এখনও ? এই কাজটা মা অন্য কাউকে করতে দেবে না—তোরা আমাকে পঙ্গু বানিযে ফেলবি? আড় চোখে শাণিতকে দেখে এখন আর চিড়বিড় করে অন্য কথা—টক না থাকলে ঠাকুরের বাসন মাজা যায় না।

বাজার ব্যাগটা রান্নাঘরের হাট খোলা দরজায় ঠেকিয়ে রাখতে গেলে দরজা গিয়ে ঠোক্কর খেল দেযালে। মুরগিটা ক্বক্ ক্বক্ করে উঠল । অতসী শুধু দেখলেন—বড় একটা রুই মাছ আর আস্ত মোরগ। এবং এগুলো এখন ধপাস্ করে নিচে রেখে দেওয়ার অর্থই হল আরো চিড়বিড় শুরু করে দিলেন মা, করছেন তবে মনে মনে। কি হতে পারে? রক্তের দোষ ? বাপ কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া ? তাছাড়াও মা একটা গালাগাল করে আমাদের—অসময়ের মানুষ।

শাণিত ডাইনিং টেবিল থেকে জলের জগ তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ কবে জল খায়। সার্ট গেঞ্জি ভিজে আরাম লাগছে বেশ। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বুদ্ধি আসছে না মাথায়। বাবাও পত্রিকা থেকে চোখ তুলে আমাকে দেখছে না—দেখছে মায়ের বাসন মাজা আঙ্গুলগুলি কত কিছু পরে রেখেছে। আগে শুধু বাঁ হাতের অনামিকায় পাঁচ-প্যাঁচ তামার তার ছিল। এখন পোখরাজ গোমেদ প্রবাল কী নেই !

—মা !

শুনছে না বুড়ি—নাকের শ্বাসটুকু ফেলছে না।

—পত্রিকা অফিসে এখন বড় বেশি কাজ মা। এজন্যেই ফিরতে পারি না কথা দিয়ে—

বাসনেব কোন জাযগায়—শক্ত দাগ পড়েছে মনে হয়—মা জোবে জোরে ঘসছে এখন। আরেক কোণায় পানের পিক ফেলল পিচ করে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে ফিক্ ফিক্ শব্দ করছে কাঠবিড়ালি।

শাণিত দৌড়ে গিযে গলা জড়িযে ধরল অতসীর—মা গো ! আর বুঝল শরীর শক্ত করে রাখেনি মা—আমার মা'তো! পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মা। গালে গাল লাগায় শাণিত আর কবি গানের মত করে বলে—শোনো মা বাবা ! এ জি অফিসে আবার চাকরি হয়েছে আমার । তারপর নিজেই ভাসতে থাকে হাওয়ায়। নীল আকাশে চিলের ডানাও যেভাবে স্থির হয়ে যায় হঠাৎ আবার নামতে থাকে। ল্যাণ্ড করতে না কবতেই দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে দিব্যেন্দুবাবুর পা। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। তবে উল্টো ফলল ফল। কথা ছিল প্রণামের ভঙ্গিতে চুপিসারে ভিজিয়ে দেবে পা ! এখন বাবার চোখ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা টপ টপ করে তার মাথায় পড়তে থাকে।

তারপর মা আমার চুলের মুঠা টেনে ফিরিয়ে নিল। ব্যাথাও লাগছে খুব। রাখল তার কোলে। বাকী শরীর মেঝেতেই আধশুয়ে পড়ে রইল আর পা নাড়ছি আমি—বাছুর যেভাবে দুধ খেতে খেতে লেজ নাড়ে।

—বাবারে ! বুঝলাম এখনও ঠাকুরের দৃষ্টি আছে আমাদের উপর। এ জি অফিসের চাকরি আগেই তো শুনেছি—ট্রান্সফার নেই। দুটো কাজই এক সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারবি তো ? অন্তত সপ্তায় যে টাকাগুলো হাতে তুলে দিয়ে যাস—সেটা বজায় থাকলেই হলরে বাবা ! তোর বিয়ে আদরীর বিয়ে—আমার তো সব কাজই রয়ে গেল ! নাতি নাতনের মুখ দেখে কি দেব—এখনই ভাবছি না।

আর মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কান্না। এই বয়সে ছেলের উপর দিয়ে ধকল কম গেল না। ভাবছেন, আজ আনন্দে কাঁদছে। শাণুর চুলে বিলি কাটতে কাটতে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—বোকা ছেলে ! পুরুষ মানুষ এমন করে না।

আমি বাঁচতে চাই মা ! — সৎ পথে থেকে বাঁচব ! কিন্তু কান্নার কোন ভাষা নেই বলে অতসীর কানে গেল না কথাগুলি। তিনি একইভাবে বিলি কাটতে থাকলেন আর আংটিগুলির

শব্দ শুধু শাণিতই শুনতে পেল। পোখরাজ প্রবাল গোমেদের কথা। হঠাৎই একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে লাফ মেরে উঠে—

—মা অনেকদিন পর আবার সারথি এসেছে। একটু ঘুরে আসি।

—হবে না, অগস্তমুনি হবে না! .

শাণিত পেছন ফিরে দেখে জুঁই। দুই হাত বাড়িয়ে রেখেছে। কানে মুক্তোর ছটা।

—চাকরি ফিরে পাওয়ার মাশুল কই?

তাই চোরা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঠোঁটের কোণে একটু হেসে ফেলারও চেষ্টা করল এখন। সে নিজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকে ছোট বোনটাকে আরো ভালবাসে। মাথায় টুক্‌কি দিয়ে বলে—মিলবে।

ততক্ষণে চিড় বিড় শুরু করে দিয়েছেন বাবা—এত সব রান্না বান্না কে করবে আর খাবেই বা কে?

—হবে গো হবে। তুমি চুপ কর।

শাণিত দেখল বাবার গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা এখন বুকে ঝুলছে। মায়ের দিকে দেখতে না দেখতেই তিনি— তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস, আমাকে উপোসী রাখিস না!

আর দাঁড়ায় না সে। রাজকুমার সারথি তখনও বাইক অফ্ করেনি। দৌড়ে গিয়ে উঠে বসে তার পেছনে। চোখের কোনখানে একবিন্দু জল জমেছিল বোধহয়। সেটাই এখন গড়িয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এমন আনন্দের দিনে চান্ মুখটাকে মেঘে ঢেকে রেখেছিস কেন?

—শেষ পর্যন্ত তুই এলি তাহলে! আমি অনেকদিন থেকেই তোকে খুঁজছি রে! পেলেও ভিড়ের মধ্যে পাই, কোন লাভ হয় না। অনেক কথা জমেছে সারথি! পাহাড় প্রমাণ ঘৃণা আর প্রতিকার স্পৃহা। খুন করতে হবে একটা বুঝলি!

কিন্তু কথাগুলি যতবারই মনে মনে আওড়ায় ততবারই হতাশ হয়ে পড়ে। কোন তীব্রতা নেই। না গুরুত্ব সহকারে বুঝাতে পারছে সারথিকে না পঙ্কজের প্রতি ঘৃণা ফুটে উঠছে তার গলায়। কেন এমন হয়? তারচে' সহজ পথ বেছে নেয় এখন। সে কেঁদে ফেলে এবং পেছন থেকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে সারথিকে। ঘাড় কাৎ করে নিজেরই বাহুতে চোখ মুছতে মুছতে বলে—বড় হাওয়া! আস্তে চালা। আর একটা পরিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসই এখন যেন মান বাঁচিয়ে দিল তার—হায় রাজনীতি! মা'ও বলে আমিও বলি। রাজনীতি বলতে আমরা ইনক্লুডিং সারথি দেববর্মাকে বুঝি। এমন খাঁটি কথা ওকে বলারই বা কী দরকার! ফলে আরও একবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বা হয়তো দ্বিতীয়বার চাকরি পাওয়ার সংবাদটাই তাকে বিচলিত করেছে বেশি। জীবনের শুরুতেই আমার বিষ দাঁত ভেঙে দিয়েছিল ননীদা অশীনদা আর পঙ্কজ তলাপাত্র। এই মুহূর্তে তাদের প্রতি যাবতীয় ঘৃণাই আবার জল করে দিচ্ছে আরেকটি কর্ম-প্রাপ্তি সংবাদ।

—ছাড়্ ছাড় শালা! কোমরে জড়াচ্ছিস কোন দুঃখে। মেয়েছেলে নাকি!

—চল্ সারথি আজ মাল খাব।

—কী ব্যাপার রে! ভুতের মুখে রাম নাম শুনছি! আজ আমি কম্পেনি দিতে পারব না ভাই। রাইট এট্ ফোর বনমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা। একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে।

—সারথি প্লিজ সূর্য চৌমুহনী চল—তোর সেই দোকানটাতে! অফিস থেকে একদিন যেভাবে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলি—মনে আছে? আজও তেমনি সর্বসমক্ষেই খাব। আজকাল মদইতো আমাকে খায়!

—ক্ষেপে গেলি কেন? সঙ্গে তেমন পয়সা কড়িও নেই। তাছাড়া তোর চাকরির খবর

লালীকে দিতে হবে না!

আরো মনমরা হয়ে পড়ে। উপরে উপরে হাত ছুয়ে দেখে সেও পার্স ফেলে এসেছে আজ। আর ঝোলা ব্যাগের মধ্যেই রাখে সবসময়, পকেটে রাখে না। যেদিন থেকে তোলা পাওয়া শুরু করেছে চোরা পকেটে টাকার বদলে রাখে ছোরা। আজ বাজার টাজার সব ছুড়ে ফেলে দেয়ার সময় ঝোলা ব্যাগটাকেও রেখে দিয়েছিল ডাইনিং টেবিলে।

কী লাভ হল শাণিত সেনগুপ্ত! সেই ছিটিয়ে ফেলা থুথুই তো আবার তুলে নিতে হবে! ছোরার বাটে তলপেটে খোঁচা লাগছে এখন। কোন লাভ নেই। আমার দ্বারা অস্ত্রের ব্যবহার হবে না। তবু আস্তে আস্তে দক্ষ হাতে বের করে আনে শাণিত। একটা সুবিধা আছে—কেট্ কেট্ শব্দ হবে না। টিপা দেওয়া মাত্রই চক্‌চক্ করে ওঠে। এবং সারথির কোমরে ছুঁয়ে রাখে জাষ্ট।

—এই কি হচ্ছে—এটা কি?

—ডানদিকে টারনিং কাট্—নন্দননগরের দিকে যা—

—এবসার্ড। চারটার সময় আমার ইন্টারভিউ নিতে হবে।

—তিনটে বাজেনি এখনও।

মোড় ঘুরতে ঘুরতে ভীষণ চঞ্চল হয়ে পড়ে সারথি—তোর হাতে ওটা কিরে?

—ছুরি। শুধু পুস করা বাকি।

অবিশ্বাসের বজ্রপাত হল অট্টহাসি। সারথি সারথি! এক্সিডেন্ট হয়েই গিয়েছিল প্রায়। ভদ্রলোক যদি লাফ মেরে নালায় না নেমে যেতেন তাহলে অনিবার্য এক্সিডেন্ট। হাসপাতাল থানা পুলিশ। এখন আবার আর্মি প্যারেড যেন সোজা যাচ্ছে বাইক্। ইস্পাতেব ভোঁতা দিক ছুঁইয়ে রেখেছে শাণিত সারথিব কোমরে।

—তুই কি বাতাস খেয়ে বড় হয়েছিস? এখন ঊনআশিটিলাব দিকে অর্থাৎ নন্দননগবেব উদ্দেশ্যে টাবনিং কাটতে কাটতে বলে—ইযে কোই বাচ্চো কা খেল নেহি, হাত কাট্ যায়ে তো খুন নিকাল আতা হ্যায়।

শাণিত শব্দ করে না—শুধু চাপ দেয় আরেকটু। ভোস্ কবে স্পিড বাড়িযে দেয় সারথি এবং চুপ কবে থাকে। ফলে সেও মাথায় রাখে সারথির এই পরিবর্তন। গোঁযাব গোবিন্দকে কে না ভয় পায়! তার শরীবে রাজ রক্ত। আর একটি শব্দ হল বিশ্বাসঘাতক। সারথিকে যদি কেউ বিশ্বাসঘাতক বলে সে তৎক্ষণাৎ খুন করে ফেলতে পারে লোকটাকে। শাণিত জানে কেন সারথির মাথায় রক্ত উঠে যায়।

পূর্বপুরুষ নক্ষত্র রায়কে যারা ষড়যন্ত্রী আখ্যা দিয়েছে তাদেরই প্রতিভূ মনে করে মার্ডার পর্যন্ত করে ফেলতে পারে সারথি।

নন্দননগরের পথে এখন চড়াই উৎরাই করতে থাকে। দুইপাশে টিলা। এখনও আগরতলাকে বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ করে এমন কিছু কিছু জংগল। ধানিজমি অথচ আশে পাশে বসতি কম। এবং দিগন্তই এখন শাণিতকে টানছে বেশি বেশি। সে হঠাৎই চিৎকার করে উঠে—আমি গাড্ডায় পড়ে গেছিরে সারথি! আমাকে বাঁচা!

আবার অট্টহাসি মারে রাজকুমার—মদ না খেয়েই যদি এই অবস্থা হয় তোর! কাছেই একটা গোলচক্কর পেয়ে তাদের বাইকটাও ফিরে যাচ্ছে তক্ষণে। শাণিতের হুস্ নেই। হাবিজাবি চিৎকার করে চলেছে—আমার মাতৃদেবী আজীবন ঘানি টেনেছেন বুঝলি! এখন একটুখানি সুখ চাইলে দোষের কী!

আর টিলায় টিলায় প্রতিধ্বনি হয় কপালপোড়া একটা মাত্র বোন আমার!

প্রায় জি বি বাজারের কাছাকাছি ফিরে এসেছে ওরা। দস্তুর মত নেশাগ্রস্ত। তবুও চিৎকার করে চলেছে—আমি কি জুঁইয়ের স্বপ্ন চুরি করতে পারি বল?

আবেকটা কথা মনে হলে খুবই কৌতুকবোধ করে সারথি—তখন থেকে কি একটা জিনিস

যেন শাণিতের হাতে ছিল, ফিরতে ফিরতে আর পাওয়া যাচ্ছে না কেন ? অন্য কথা ভেবেও অস্বস্তি হচ্ছে —এমন পাগলামি করতে পারে যে সেতো ভারসাম্য হারিয়ে যা খুশি করতে পারে —এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত । আরো স্পিড বাড়িয়ে দেয় সারথি । খানে খানে জটলা, একলা দোকলা পথচারীকেও মাইল পোস্টের মত পেছনে ফেলে যায় । আবার যানবাহন গুলিকে কেরি কেটে যাচ্ছে বলেই এক্সিডেন্টের সম্ভাবনা । এখন শাণিতের কথা একটা যদি শোনা যায় সার্কিট হাউসে, আরেকটা শোনা যাচ্ছে আস্তাবলে । কর্নেলবাড়িটাকে ডান পাশে ফেলে আরেকটি ধ্বংসাবশেষের দিকে এগিয়ে যায় । ইতিহাসের চোরাবালিতে চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে ছত্রমাণিক্যের ইতিহাস ।

তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষে সারথি । এখান থেকে তুমি সোজা চলে যাবে আমাদের বাড়ি । আমি আসছি । বলতে বলতেই নামল । শাণিতও নামল । সাইকেল স্টেন্ড করল সারথি—মাল খেতে চাস্তো ? আমার ঘরেই থাকে । লালীকে বললে বের করে দেবে । কিন্তু তোর দেখছি না খেয়েই নেশা হয়ে যায় । সত্যি বলছি—আয়নায় গিয়ে চোখগুলি দেখিস্ ! —তোর কি হয়েছি রে ?

শাণিত রীতিমত টলছে — সলিল সমাধি । নর্দমায় এত ডুবে গেছি, আর ভেসে ওঠা হবে না আমার !

ঠাস্ করে একটা থাপ্পর বসিয়ে দেয় সারথি । শাণিতের হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নেয় । আর যদি কোনদিন দেখি ! 'শালা বৈরাগী নটুয়ার বাচ্চা !'

সারথির গলা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ।

—এ্যাই এ্যাই ! রাস্তা রাস্তা ! বাড়ি যা । হাবেলিতে লালী অপেক্ষা করছে তোর জন্যে ।

পনেরো

এরকম অনেকবারই হয়েছে। কাদা ছিটিয়ে গেছে গাড়ি। তবু আমি রিএ্যাক্ট করিনি, সবই অর্থহীন মনে হয়। মনে হয় গাড়ি থাকলে কাদাও থাকবে, আমিও থাকব। কিন্তু প্রশ্ন হল শহরের মাঝখানে এখন কর্ণেলবাড়ি হয়ে এই রাস্তা যতদূর গেছে —কেবলই পরিত্যক্ত উপেক্ষিত লাগে কেন? দূরে দূরে এক দুইটা ল্যাম্পপোষ্ট দেখা গেলেও টিম টিম করে আলো। সন্ধ্যা হয়েছে মাত্র অথচ কেমন সন্নাটা দেখ চারিদিকে। যেন মহামারীতে পাড়া ছাড়া হয়েছে মানুষ। কখনো কখনো কোথাও কোথাও এমন হয়!

শাণিত বড় রাস্তা ছেড়ে এবার ফাড়ি ধরেছে। সে নেশাগ্রস্ত। টাল খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হোঁচট খেয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে। তবে সূর্য আড়াল করে দূরের লোকজন দেখার মত এই অন্ধকারেও কী খুঁজছে সে! একটি ধ্বংসস্তূপ। ছত্র মাণিক্যের বংশধরদের হাবেলি। এবং দিব্য লন্ঠন হাতে তুষারাচ্ছন্ন কোন লুসিকে যদি দেখা যায়! মহারাজ নক্ষত্ররায়ের স্মৃতি বিজড়িত বলেই কি এ পথ পরিত্যাগ করা হল? ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্রের মতে গোবিন্দ মাণিক্যের আমল থেকেই চলে আসছে এসব। যদিও এখন ষড়যন্ত্রীদের রাজ্যপাট কিছুই নেই। তবু রাজন্যশাসিত জনপদের মত বড় কৃপন আলো, তবে কি হস্তান্তরের সময়ও গণতন্ত্রীদের কানে একই ষড়যন্ত্রের বীজ পুতে দেয়া হয়েছিল। এসব নিগূঢ় রিপুর শেষ কোথায়? হঠাৎ শাণিতের মনে হল হাবেলিটা ছাতশুদ্ধ ধ্বসে গুড়া হয়ে যাবে। আর প্রাণপন ছোটার চেষ্টা করে — আমার লালী আছে সেখানে। হোচট খেয়ে বারবার পড়ে যায় মন মাতাল। আবাব ছুটছে। প্রথম সিঁড়ি ছুয়ে তবে থামল। না লালিমা দেববর্মাদের বাড়ি এখনও ভেঙ্গে পড়েনি। যেমন স্বস্তিব নিশ্বাস পড়ল, তেমনি ক্লান্তির ধুকপুকও শুরু হয়ে গেল। যেখানে দাঁড়িযেছিল সে সেখানেই বসে পড়ল। আবার দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসে নিচেরটায় রাখল তার পা।

আমার যা হবার তো হয়ে গেছে। আর ভয়ের কিছু নেই। পাকিস্থানের বিষয় আশয় ফেলে একদিন আমরা নাকি উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলাম। বর্ডারে মাকে যখন একলা ঘবে নিয়ে তালাস জাবি রেখেছিল ওরা, আমি তখন তার পেটে। ক্রমান্বয়ে শুরু হল অভাব অভিযোগ, অকারণ চটে যাওয়া, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আর বিনয়ের মুখোশ পরে তলে তলে যুদ্ধ নাকি আবেগ মুক্ত হওয়া? যাই হউক এখনও তো বেঁচে আছি আমরা। আসাম দেশে অনেকগুলো দাঙ্গা গেছে আমাদের উপর দিয়ে। পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধের তাফাল গেছে। তারপর নূতন এক সংকটের মুখোমুখি হয়েছি—আমরা নাকি বিদেশী, আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে! ডিফেনসিভ মেকানিজম বলে একটা কথা আছে কিন্তু আনওয়ানটেড, ফরেনার, এই শব্দগুলি এমনই যে তোমার মনে হবে দেবতারাই ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছেন যখন, পতন অনিবার্য, আবারো উদ্বাস্তু হয়ে পড়ি আমরা। যাযাবরের মত ভাগ্যই আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা করে, ভাগ্যই একদিন আমাকে আগরতলা শহরে নিয়ে এল। তখন থেকেই আমি আর মা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলির সময় কেবল রাজনীতির মুন্ডপাত করি। আমাদের মা ছেলের কথায় বাবা যদিও বিশেষ যোগদান করেন না। অগ্নিযুগের কথা ভুলতে পারেন না ভদ্রলোক তবু তাকেও ছেড়ে কথা বলি না আমরা—শালার রাজনীতি!

আরেকটা মজার কথা বলি। আমি তখন আগরের জংগল খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েছি। আগর গাছের জন্যই নাকি রাজধানীর নাম আগরতলা। অথচ শালা বন জংগলের কথা বাদ দাও তুমি— একটি গাছও খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও! আমার মনের ইচ্ছাটিও ততদিনে প্রবল হয়েছে। ননীদা অশীনদাদের সাথে অফিস ইউনিয়ন করতে করেতেও তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছি। হঠাৎ একদিন মাথায় এল, হঠাৎ বললে ভুল হবে, অনেক দিনের প্রিপারেসন ছিল—দুষ্ট রাজনীতি মুক্ত করতে হবে আমাদের পৃথিবীকে। খরার দিনে বৃষ্টির জন্যে যদি যজ্ঞ হয়, বিশ্বশান্তির জন্যে হয়

অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন, তাহলে রাজনীতি দূষণ মুক্ত করতে যজ্ঞে দোষ কী ? রাজনীতি নিধন যজ্ঞ। আম্রকাষ্ঠ ঘৃত এসবের তো অভাব নেই এদেশে। কিন্তু আমার লাগে আগরের কাটা ডাল, কষ, ছাল-চামড়া সব। একদিন তো সারারাত শুধু ভেবেই কাটিয়ে দিলাম। আর কী টেনশন!

একটি আস্ত আগরগাছকে সম্পূর্ণ পুড়তে দেখলাম আমি চোখের সামনে। তার আহুতি রাহু মুক্ত করবে আগরতলাকে। আমি নিজেও তখন বেদজ্ঞ পুরোহিত বল্কল পরিহিত। সুর করে বলছি—ওঁ শান্তি! ক্রমাগত ঘৃতাহুতি। দুষ্ট রাজনীতি মুক্ত হউক ত্রিপুরা, এই উপমহাদেশ, সমগ্র পৃথিবী! হে দেব, হে দেবীগণ—আমি প্রথমেই আহুতি দিলাম আমার অপিসের দুইজন ইউনিয়ন লিডারকে। যারা মাদি বিড়ালের মত দুইটি বিবাদমান রাজনৈতিক দলের সমর্থক। দলের স্বার্থ ও আত্মসিদ্ধি ছাড়া আর সবই যাদের কাছে গৌণ।

তখনও আমার চোখের সামনে অঙ্গার লাল আগর গাছ জ্বলছে। বাইরে ভিতরে পুড়ছে নিজের জ্বালায়। আর একটি পূর্ণ যুবতী বৃক্ষকে পুড়িয়ে মারার দায়ে আমারও মৃত্যুদন্ড হবে জানি। আমি রাজি আছি। তবু রাজনীতির দুষ্ট খেলা বন্ধ হউক! রাহু মুক্ত হউক পৃথিবী। আর আগর পোড়া গন্ধ কী গন্ধ রে ভাই! আমার তো মনে হয় পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

তারপর মা আমাকে একধাক্কা দিয়ে তুলে দিল বিছানা থেকে—একী! ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরে শুনেছি কিন্তু এ তো দেখছি পাগলের প্রলাপ। এখন নেশাটেশাও করা হয় নাকি!

আমি হেসে ফেলি—মা যে কী বলো! তখন জাগরণেও স্বপ্ন দেখতে পারতাম আমি। আরেকটি সাদা রঙের গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। একটাও পাতা নাই। এবং সন্দেহে সন্দেহে ফু দিতেই আমার সারা শরীর ভরে গেল বিভূতির সুগন্ধে। পুরো বৃক্ষটি ভেঙে পড়েছিল আমার উপর। তখন থেকেই তো স্বপ্নের ছাইগাদায় ডুবে আছি আমি। আমার শরীরও যদি কেউ ছুঁইয়ে দিত ভুলে ভুলে—আমিও টুকরো টুকরো ছাই হয়ে প্রজাপতির মতই হাওয়ায় ভেসে বেড়াতাম।

আজ মনে হয় সেদিন যে একটিও আগরগাছ খুঁজে পাইনি তার কারণ ওরা নিজেদের আহুতি দিয়ে ফেলেছিল আগেই। কী লাভ হল!

সিঁড়িতে বসে বসেই এখন এই অন্ধকারে হাতের কাছে শক্ত কিছু টের পায় শাণিত। শির শির করে ওঠেনি। নখ দিয়ে খুটে খুটে বুঝে নেয় মাটির ঢেলা না। তার হাত ভরে উঠেছে চুন সুরকির গুড়ায়। পুরনো দালান বাড়ির প্লাস্টার হবে! আবার মাটি হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। দুই তিনবার লোফালোফি করে, ঢিল ছুঁড়ে মারে সামনের দিকে। তারপর দীঘি কল্পনা করে ঝুপ্ করে শব্দ করল নিজের মুখেই। পরপর অনেক গুলো ঢেউ ওঠল। সে দেখতে পেল না।

ত্রিপুরার ইতিহাসেও এমনই গোলক ধাঁধা। পদ্য ছন্দে লেখা অনেক জনপদের ইতিহাস আমরা শুনেছি, পড়েছি। কিন্তু ধাঁধা খুলে খুলে ইতিহাস আর একটিও নেই। ত্রিপুরার রাজমালার লেখক কবি শুক্রেশ্বর বানেশ্বরের কবিতা থেকে মানবজীবন আবিষ্কার সত্যি খুব মজার ব্যাপার। গালগল্পের অন্ত নাই, আবার অন্তরস্রোতা বস্তু ভিত্তিকেও উপেক্ষা করা যায় না। দেবী বুড়িবকের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করি আমি। তিনি তার অন্য বোনদের মত কেবলই দেবলোকের স্বামী পুত্র লইয়া তৃপ্ত থাকিতেন না। বরং মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া করিতে ভালবাসিতেন বেশি।

আবার দীঘির জলে শব্দ হয়। লালীদের হাবেলিতে দুইজন ফরাসি পর্যটকের পোকা কাটা একটা তৈলচিত্র আছে। মহারাজ নক্ষত্ররায়ের আমলে ত্রিপুরায় এসেছিলেন ওরা। তখন থেকেই রাজ পরিবারের সঙ্গে দোস্তি। একটি সোনার খনির খোঁজ দিয়েছিলেন মহারাজকে। উপহারও দিয়েছিলেন দু'টুকরো পাথর। সে দুটি এখনও লালিমার কাছে আছে। বলেছিল—তুমি নেবে নাকি একটা!

শাণিত আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝল—অসম্ভব। এখনও ভীষণ বেতালা। এতগুলি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তবে যেতে হবে লালীর কাছে। থপ্ করে বসে পড়ে শাণিত। এবং বসতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ার মত শিউরে উঠেছিল। তারপর মনে মনে মজা করে গড়িয়ে পড়তে লাগল

যেভাবে ব্যাথা না পায়। গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে মাটিতে এসে শুয়ে থাকল। এখন আর দাঁড়িয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না তার।

শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছেও আশ্রয় পেলাম না। আশ্রয় বলতে সাধারণ মানুষের মত সৎপথে থেকে ডাল ভাত খেয়ে, মনের আনন্দে বেঁচে থাকার প্রতি সমর্থন।

আবার হেসে ফেলে। তখন সারথি ভেবেছিল আমি বুঝি আত্মহত্যা করে ফেলব! প্রশ্নই উঠে না—সুইসাইড করতে যাব কোন দুঃখে! আমি হলাম গিয়ে প্রতিনিধি। সমাজের একটি বিশেষ অংশের প্রতিনিধিত্ব করছি। যাদের পারচেজিং পাওয়ার নিয়ে লাগাতার সমীক্ষা হয়, পরিকল্পনা হয়। আমাদের ব্রেইন সেল, স্কাল, দাঁত ইত্যাদিও খুব দামি। আমরা হচ্ছি ননীচোরদের সেই প্রথম ব্যক্তি যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে মাটিতে। আর তার ঘাড়ে ভর রেখে অন্যরা তরতরিয়ে উপরে উঠে যায়।

একেক সময় মনে হয় আমার চেয়ে আমার মা-ই বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তার পক্ষেই ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব।

কিন্তু মা কেন জিজ্ঞেস করে না আমি কিভাবে রোজগার করি! চোরের উপর বাটপাড়ি। বেশ্যাদের ব্লেকমেল করি। আমি জয় সিংহের কাঠপুতলি। চোরাচালানকারিদের দালাল—আর্মস সাপ্লাই করি উগ্রপন্থীদের। আর কমিশন পাই। এখন মদই আমাকে খায়। রুবি মুনিয়াদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক সুন্দর না। তাছাড়া প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সমকামিতার শিকার হই আমি।

অবশ্য পঙ্কজদার কাছে যখন যা চাই, দেয়। সেবার বাড়ি করার সময়ও অনেক টাকা দিয়েছিল। সারথিদের সিঁড়ির নিচে শুয়ে থাকতে থাকতে শাণিত এখন বুঝল—তার শরীরের চাপে মৃত্তিকার চামড়া ভেদ করে যেন জলে শুয়ে আছে সে। শীত কী শীত রে বাবা! কেঁপে কেঁপে। আবার মনে হয়—শুধু কি টাকা কামাই করার জন্য শাণিত সেনগুপ্ত এত নিচে নেমে গেছে? হতেই পারে না। তলে তলে ক্রোধ প্রতিহিংসা এসবও আছে। কিন্তু ডিফাইন করতে পারে না। কাব বিরুদ্ধে তার জাতক্রোধ?

ননীদা অশীনদা? নাকি জগদীশ জয়সিংহ পঙ্কজ তলাপাত্রদের প্রতি ঘৃণা থেকেই জন্ম নিল দৈত্যটা? নাকি দেশভাগ, বারবার উদ্বাস্তু হওয়া ইত্যাদি দায়ী? দারিদ্র জনিত অবহেলা অবজ্ঞাও হতে পারে। কিছুই তেমনস্পষ্ট পরিষ্কার নয় শাণিতেব কাছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক যেমন। যাই হউক মাঝে মাঝে মাথা নষ্ট হয়ে যায় শাণিতের, আর আগুনে পুড়তে থাকে। তখন সে যা খুশি করতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখা গেছে—শাণিত আসলে সেলফ ডেষ্ট্রাক্‌টিভ। আর কার কি ক্ষতি কবতে পেরেছে সে? পঙ্কজ তলাপাত্রের একটি লোমও সোজা করতে পারেনি এখনও। তাই সে এবং তার মা, এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে এমন অনন্ত অভিশাপের নাম দিয়েছে রাজনীতি। সমস্ত অনাচার অবিচারের মূলে এই রাজনীতি।

একটু আগে সে তার মাকে দোষারোপ করছিল যার কোন অর্থ হয় না। না পেতে পেতে মানুষের এমনই হয়। ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম যাবতীয় শেকল খুলে ফেলতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় বাঁচতেই হবে আমাকে, মানুষ হালে, যেভাবেই হউক।

ঠিক আছে মা, আমার একটা জীবন এভাবেই যাক্, তবু তোমাদের গায়ে তার আঁচ না লাগুক!

হঠাৎ শাণিতের মনে হল আমাদের চোখ দু'টি বিস্ময়, নাকি তাদের উপর ঘুমিয়ে থাকা চামড়াগুলো শুধু বিস্ময়ের! ছোটবেলায় চোখ উঠলে দেখতাম মা চন্দন বেঁটে দুই পাতা আর চোখের কোল দুটি লেপে দিত। তেমনি এখনও যেন স্নিগ্ধ আলো লেপে দিল কে? ধাপে ধাপে আলো নিকট আসে। কে এসেছ দেবদূত! নাকি দেবী পারমিতা—আমার কি যাবার সময় হয়ে গেছে? শাণিত চোখ খুলে। মাত্র এক সিঁড়ি উপরে কে তুমি জ্যোর্তিময়ী!

—ঐতিহাসিক। আমি লালিমা দেববর্মা! মহারাজ নক্ষত্র রায়ের বংশধরা। তুমি এখানে কি

করছ ?

শাণিত মাটিতে শুয়ে থেকেই হাসে, ওঠে না। লালিমা লণ্ঠন সিঁড়িতে রেখে দুই হাতে তর্পণের জল কুশ করার মত শাণিতের দুইগালে হাত রাখে।

— ওমা একী ! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা।

— ও কিছু না। আমার বরং শীত করছে।

— হয়েছে ! আর পোদ্দারি করতে হবে না। নিন উঠুন !

শরীরে রাজ রক্ত তো ! কথায় কথায় হুকুম করে লালি। এখন শাণিতকে টেনে তুলে নিল প্রায়। তার বাঁ হাতটা রাখল নিজের কাঁধে, ডান হাতে কোমর জড়িয়ে ধরল শাণিতের। লণ্ঠন নিল বাঁ হাতে। কাছে পিঠে একটা শেয়াল ডেকে উঠল। আগরতলা শহরে সন্ধ্যার সময় শেয়াল ডাকে। নক্ষত্র রায়ের স্মৃতি বিজড়িত বলেই হয়ত এদিকটা এমন ঝোপ স্তূপে ঘেরা। আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করেই দাঁড়িয়েছিল শাণিত। না। ধারে কাছে আরো শেয়াল থাকতে পারে, কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত ভূমিতে এখন মাত্র একটাই।

—কি হল ! পা চালান ! সাবধান ! শ্যাওলার আস্তরণে সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল। শাণিত এরকম একটা দৃশ্য কোথায় দেখেছিল মনে করতে পারছে না—লালু-ভুলুতে নাকি মরুতীর্থ হিংলাজে ? বহু পুরনো ছবি। এখন দেখতে দেখতে রিল ছিঁড়ে যায়।

লালিমা শুধু বিছানায় বসিয়েছিল কোন রকমে আর কোলবালিশের মতো ধপাস করে শুয়ে গেল শাণিত। এবার লালী একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল গলা পর্যন্ত। তারপর মশারি টাঙাতে গিয়ে শাণিতের মুখের কাছে মুখ নিল—আজ অন্তত খায়নি ! তাই আলতো চুমু খেল একটা।

—হু !

—কিছু না। ঘুমান।

ঘুমের মধ্যে টেলিফোন কল আরেক বিভীষিকা। পত্রিকা অপিসে কাজ করতে গিয়ে এই রোগ বাধিয়েছে শাণিত। ঘুমের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠে মৃগীরোগীর মত। কত জায়গার কত খবর যে থাকে ! রাজনৈতিক খুন, ধর্ষণ আরো কত কী ! আজ অবশ্য টেলিফোন কল না—কিছু কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। পাশের হলঘরটাতেই মনে হয় উত্তেজিত কথা বলছে সারথি। তারা হয়ত সেই ভাঙা শ্বেত পাথরেব টেবিলটাকে ঘিরে বসেছে। উপরে অনেক উপরে অন্ধকারে ছাতের ফাটল চুইয়ে শীত গ্রীষ্ম সব সময় টপ্ টপ্ করে জল পড়ে শ্বেত পাথরের টেবিলে। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ! অবশ্য ঘুমের ঘোরে সে কি শুনতে কি শুনছে কে জানে। অনেক সময় কবুতরের বকবকও মানুষের কথার মত শোনায়। আর লালীদের হলঘরে ছাতের কাছাকাছি কোথাও অন্ধকারে অজস্র জালালী কবুতর শুধু। ঘরের মেঝে বলতে শুধুই বিষ্ঠার স্তর। কে পরিষ্কার করবে এইসব ! আগের দিনের লোক লস্কর দূরে থাক। এখন ঘর গেরস্থলির কাজে হাতবাটার লোকও পাওয়া যায় না। এই সব কথা বলতে বলতে লালীর দীর্ঘশ্বাস পড়া স্বভাব আছে। বলেছিল—তাই আমি আর কি করব—দিনে দশ বারোবার শুধু ঐ পাথরের টেবিল আর চেয়ারগুলো মুছে রাখি।

আবার সারথির গলা শুনলো শাণিত— যান যান, আপনারা আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আরেকটা ফ্যাসফ্যাসে গলা শুনল—শাণিতের মনে হল জয় সিংহের বডিগার্ড সেই লম্বু সিংটা হবে। বলছে—আমাদের সঙ্গে যদি কোপারেট না করতে পারেন করবেন না, কিন্তু কাজে বাধা দিলে কিন্তু আমরা ! এখনও লোকটার হাতে হয়ত সোনালী রঙের সেই পিস্তল। আবার ভাবে সারথিকে কেউ পিস্তল দেখাবে এবং সে চুপ করে থাকবে এ হতেই পারে না।

— তুমি থামো ! বাজে বকবক করো না ! সারথি শোন, তুমি শুধু আমার কথা শোন ! এই তো এই তো ! মিষ্টার জয় সিংহের গলা ! গম গম করে উঠে ! —আমাদের সব প্রস্তুতি শেষ। আর শুধু সেকেণ্ড এসাইমেন্টের আর্মস এমুনিশন হাতে এলেই ঝাপিয়ে পড়ব। অবাঞ্ছিতদের তারিয়ে দিতে হবেই হবে সারথি—আমাদের হেলপ্ করো।

—অসম্ভব। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আমার দ্বারা হবে না। আপনারা বেরিয়ে যান।

—তুমি লোকটার সাথে একবার অন্তত কথা বলতে দাও আমাদের। শালা কমিশন খেয়েছে—মাল সাপ্লাই করছে না।

—না । আর একটি কথাও না!

একই সঙ্গে অনেকগুলি বুট জুতার উশৃঙ্খল শব্দ মিলিয়ে গেল। সারথিই যেন তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওদের।

আবার সেই দিব্য লণ্ঠনের আলো। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে এল লালী। কানের দুল খুলে রাখল টেবিলে। মশারী গুটিয়ে নিল।

আজ তোমাকে ছাড়ছি না বলেই বিছানায় উঠে এল লালী। আমার ঘাড়ের নিচ দিয়ে বাঁ হাত নিয়ে ঠেলে বসিয়ে দিল আমাকে।

—ধরো।

—তুমি খুব দুষ্টু হয়েছ লালী —একবার তুমি বলছ, একবার আপনি।

—বাইরে কি জ্যোৎস্না আছে ?

লালী হাসে । সে হাসলেই মুক্ত জ্যোৎস্না । আর কানের দুলগুলি রেখেছিল যে কাশ্মিরী টেবিলে— সেখান থেকেই হাত বাড়িয়ে এক গ্লাস জল তুলে নিল এখন। বলল—বড়িটা খাও। জ্বর কমে যাবে। আমার কথা বলে লাভ নেই—সবসময় কথা শুনতেই অভ্যস্ত আমি। কোন সময় আদরের কথা গিলে গিলে, কোন সময় বিষ গিলে তবু মুখভঙ্গি বিকৃত করি না। লালিমা আমার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আবার রেখে দিল টেবিলে। ঘাড়ে তাব বাঁ হাত তখনও ছিল। আবার আস্তে আস্তে বালিশে রাখল মাথা। ঠোঁটে জল লেগে বয়েছে বলেই নাকি চুমু খেল— তোমার আবাব চাকরি হযেছে গো!

—ছাড়ো ছাড়ো রাজকুমারী! আমাকে ছেড়ে দাও। কিছু হযনি আমার। নূতন কবে আর কিছু হবেও না। আমি যেই কে সেই! আমার জন্যে শুধু নরকের দরজা খোলা থাকে। আর সব পথ বন্ধ, আমাকে ছেড়ে পালাও লালী । বা স্বস্থানেই থাকো । তুমি শুধু অলুক্ষণে অপয়া আমাকে ছেড়ে দাও! ওদেরও আমাকে ভীষণ দরকাব। দেখলে না! মিষ্টার জয় সিংহ এসেছিলেন। অনেক টাকা চাই আমার, অনেক টাকা !

—পাগলামী করো না রচয়িতা। জ্বরের ঘোরে কি প্রলাপ বকছো ? শুনো, তোমার এই চাকরির টাকাতেই আমাদের সংসার চলবে। তুমি বসে বসে দেখো, জুঁই-এর বিয়ে দিয়ে দিলেই তো কত ছিপতি পরিবার। আমরা স্বামী স্ত্রী আর মা বাবা। কেন চলবে না?

—রাজকুমারী তোমার মুক্তির কি হবে ? তোমাকে যে দীর্ঘ অবহেলা আর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি দেব বলেছিলাম তার কি হবে ? আমি কোথায় নিয়ে রাখব এই বৈদুর্যমণি, কি করে লালন পালন করব বল ? মহালেখাকার অফিসের একজন কেরানির পক্ষে তা কি করে সম্ভব ?

—আচ্ছা বলো দেখি কি নেই আমার ?

—কি ?

—ভালবাসার মানুষ। আর কি চাই বলো তো ?

—কি ?

—নিরাপত্তা নয় গো! বিশ্বাস, শুধুই একজন বিশ্বাসী বন্ধু লাগে আমার।

—আমার মা বেটি পর্যন্ত, যে হক্ কথাটা বুঝে ফেলেছে; তুমি কেন বুঝতে চাইছো না লালী! মরবে মরবে বলছি!

ততক্ষণে লালিমা দুধরাজ সাপের মত পেচিয়ে ধরেছে শাণিতকে। আমাদের পূজা পালকের কি হবে বল ?

—দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন !

—আগে মেয়ে হলে পূজা। পরে ছেলে হবে পালক। প্রতিপালক।

'—তফাৎ যাও। সব ঝুট হ্যায়।'

—তুমি এমন করো না লক্ষ্মীটি! তোমাকে একটা গল্প বলি শুনো। ছোট বেলায় আমাদের সংসারে বুধলক্ষ্মী বলে একজন কাজের মাসী ছিলেন। থুরথুরি বুড়ি। কবে থেকে যে তিনি এই সংসারে আছেন আমরা ভাই বোন কেউই বলতে পারব না। বুধলক্ষ্মী বলতেন চৌদ্দ পুরুষ ধরে। উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদেও নাকি তার আত্মীয়স্বজন আছেন। কিন্তু কোনদিন যেতে চাইতেন না। তারাও কেউ এসে দেখা করত না তার সঙ্গে । শুধুই আমরা আছি আর তিনি আছেন। আমাদের মাও তিনি বাবাও তিনি। আমরা তো আর কাউকে দেখিনি কোনদিন। একদিন লাঠি ঠুকে ঠুকে এসে দাদাকে বললেন—কর্তাবাবা! কয়দিন ধরেই ভাবছি বেড়াতে যাব। ভাইঝির বাড়িতে। আমরা তো অবাক!—কোথায় আম্মা? বুড়ি জানালা দিয়ে লাঠি দেখিয়ে বললেন উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদে। দাদার মুখে ঝাক্ করে একঝাক্ রক্ত জমে গিয়েছিল। আমাদের চিরশত্রুর প্রাসাদে যাবে! দাদা ছোট্ট করে শুধু বলল—আচ্ছা আম্মা। বুড়ি যাবার সময় বললেন—রক্তের টানে যাচ্ছি বাবা! ধর্ম্ম ত্যাগ করছি যখন আর ফিরে আসব না এখানে? বুড়ির কথা শুনে বুকটা শূন্য হয়ে পড়েছিল। এর আগে আর জন্ম মৃত্যু দেখিনি। এই যে তুমি এসেছ এখন—ঠিক বুঝাতে পারব না বুঝলে! মানুষ কি মানুষ ছাড়া বাঁচতে পারে বলো? বুধলক্ষ্মী যেদিন চলে গেলেন সেদিন আর রান্নাবান্না হয়নি আমাদের বাড়িতে। রাতে ভীষণ জ্বর উঠলো আমার। জ্বর না বলে ভয় বল। মশারীর নিচে মরে পড়েছিলাম তিনদিন তিন রাত্র। আর প্রথম রক্তের নদীটাকে সামলাতে পারছিলাম না কিছুতেই— কি করব আমি—কোথায় যাব? দাদাকেই বা বলি কি করে! নিজের মানুষ কে আমার!

—আমিও না লালী—আমিও না।

আর কথা বলতে দিল না লালিমা। শাণিতের মুখ চেপে ধরল তার বুকে। শাণিতের শরীর আর শাণিতের না।— তোমার রোগ শোক পাপ সবই আমাকে দিয়ে দাও—সব।

এক সময় লালীর বুকে শুয়ে থেকেই কল্পনা করল—এক বালতি দুধে সে একটা বিষ্ঠা মাছি। আস্তে আস্তে নামল লালীর ওপর থেকে। নামল মানে মেঝেতে নামল লম্বা পা বাড়িয়ে। আর দেখল তার শরীরের জ্বর ঘাম সব লালী গ্রহণ করেছে। স্তন এখনও উন্মুক্ত। শাড়িটাকে সাপের মত শরীরে ফেলে দিল লম্বালম্বি। উঠার কোন তৎপরতা নেই। শাণিত প্যান্টের চেইন টানল। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগল।

—কাল আসছো তো আবার?

—তোমার মত আত্মহত্যা করার সাহস আমার নেই লালী। আমাকে তো আসতেই হবে। আর যাব কোথায়!

তারপর লালীমা যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল সেটা ধরে রেখেই তার ঠোঁটে চুমু খেল পিংপং বলের মত টুক্ টুক্ করে—তোমাকে মেরে ফেল্লাম আমি! চলি।

লালিমা একটু কাৎ হয়ে দেখল শাণিত সেনগুপ্ত যায়। এবার সে শুনবে ছিটকিনি খোলার শব্দ।

ষোল

আজ সকাল থেকেই উত্তর-পূর্ব পত্রিকা অফিসে কথা কম কাজ বেশি হচ্ছে। কাগজে কলমে খস্ খস্। এখানে লাইট ফ্যান টিভি টেলিফোন টেলিপ্রিন্টার দিনরাত চলে। লাইনো মেশিনে যখন ছাপার কাজ চলে তখন আর সবই ম্লান হয়ে যায়। তারপর সকাল ছ'টা বাজে। তারো প্রায় এক ঘন্টা আগে সর্বশেষ কপিটি ছাপা হয়েছে। স্তূপিকৃত পত্রিকা। সারা অফিস জুড়ে এই জন্ম গন্ধ মোহিত করে। প্রায় দশ হাতে কাজ করছে ওরা। প্যাকেটগুলো টি আর টি সি-র বাস এবং বিমানে করে যাবে দিকে দিকে। অফিসের সামনেও স্থানীয় হকারদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। অসংখ্য সাইকেল আর সম্মিলিত ঘন্টাধ্বনি। দাদার কথা হল—করুক, যত খুশি চিৎকার চ্যাচামেচি ওদের বাধা দিও না। —ওরাই তো আমাদের দীর্ঘায়ু ঘোষণা করে।

টেবিলে টেবিলে গরম চা। মিষ্টি ধোঁয়া। সুরুৎ সুরুৎ শব্দ। আরো কিছু ধোঁয়া অবশ্য চুরিছুপি বেরিয়ে যাচ্ছিল স্কুপ নিউজের মত। কি ব্যাপার! সবাই এত হাসিখুশি এত কাম কাজ?

অনেক ঝগড়া দরবারের পর আজ বর্দ্ধিত হারে বেতন মিলবে এখানে। জয়েন্ট ডিক্লারেশনের আগে ও পরে আমাদের জগদীশদা, সত্যি একটা মাল বটে! কয়দিন আগেও যে লোকটা ছিল এক নম্বরের কাপ্তুস, আজ এই শুভদিনে কিছু বাইরের লোকজনকেও নেমতন্ন করেছেন তিনি। তবে কর্মচারীদের আনন্দ প্রত্যক্ষ করার চাইতেও গূঢ় কারণ থাকতে পারে। জগদীশদাকে বোঝা বড় মুসকিল। তার হাবভাব দেখে মনের কথা জানা একেবারে অসম্ভব। কেবল চোখের পলক পড়তে উঠতে যা একটু সময় বেশী লাগে।

যা হোক বাবা, আজ আমাদের ঘাড়ে যা যা চাপানো হয়েছে সেগুলো অন্তত সুন্দর মত নামিয়ে দিতে পারলেই হল। কিন্তু তার আগেই প্রবীর শালা হাউকাল বাধিয়ে দিল। শুরুতেই রসভঙ্গ। সানমাইকা ভাঙা কোনও টেবিলের কোণায় লেগে হাত কেটে ফেলেছে নাকি!

ব্যস্ত সমীর মনিষ ওরাও। শুধু কম্পোজিং সেকশনে যারা আছে তাদের সবদিনই এক কাজ। আর মেশিন চালায় যে বাবুলাল খোলা দিন তো খোলা দিন, বন্ধের দিন পর্যন্ত ওভারটাইম করতে হবে। ফলে উচাটন করছে লিলি। দাসীবান্দীর কাজ আমি করব না। সবাই জানে আজ পার্টি। আর আমরা এখানে রোয়া দিচ্ছি ধান। মণ্ডপে আমাদের কোন ভূমিকা থাকবে না—তা কি করে হয়! কাজেও বারবার ভুল হচ্ছে এখন। এ ম হয়ে যাচ্ছে ব র। মনটাতো পড়ে রয়েছে মক্কায় মানে কনফারেন্স রুমে। যদিও শাণিত সেনগুপ্ত সেখানে নেই।

সব কিছুই সাফাই হচ্ছে। কর্তাব্যক্তিদের গায়ে গায়ে কি ঝুল জমেছে দেখো! কিতনা গন্ধা! টেবিলের উপরেও যে পায়ের ছাপ থেকে যাবে সেদিকে লক্ষ্য নেই, বড় নিবিষ্ট মনে ঘড়ি মুছছে মুনিয়া। আর ঠিক তার নিচে মেঝেতে এখন জলঝোল পরিষ্কার করছে কৃষ্ণগুর্খা। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে—মাথার ঠিক পেছনে নয়, আরো উপরে মধ্যিখানে খোঁপা বেধেছে মুনিয়া। ঘাড়ে গলায় ঘাম। জানলা দিয়ে তাকানো যাচ্ছে না—এত তাপ!

সারথির উপর যাদের নেমন্তন্নের ভার দিয়েছিলেন জগদীশদা, মুখে মুখে, সবাইকে সে বলেনি। এমনই সারথি দেববর্মা। জয় সিংহকে পছন্দ করে না সুতরাং বসের নেমন্তন্নও কমিউনিকেট করবে না সে, বলে দেবে বাড়িতে গিয়ে পায়নি। যা হবার হবে! জানি তো বেটা জয় সিংহ মোপ খুজছে খালি। সময় সুযোগ বুঝে এক্ষুনি বলে দিল বলে— আমবা উগ্রপন্থা ছেড়ে সংসদীয় রাজনীতির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এই ঘোষণাটিই হবে ত্রিপুরার আকাশে সবচে' অশনি সংকেত। ওপেন লাইসেন্স নিয়ে বিভেদের রাজনীতি।

বামপন্থী পঙ্কজ তলাপাত্রকেও সে নেমন্তন্ন করেনি। আদর্শ থেকে বিচ্যুত লোকগুলোর চোখে মুখে যদি এতটুকু লজ্জা আবিষ্কার করা যেত! ওদের মত অফ্ সিনে ওস্তাদ আর কেউ নেই।

সাহিত্যকে যারা গণতান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক এইভাবে ভাগাভাগি করতে পারে— ওদের মত বহুরূপী আর হয় না। প্রকৃত কলমকে অত ভয় কেন বাছা! একদিন যারা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে সংগঠন করতো, বাম সরকার গঠন করার পরও জনসাধারণ সেজেছিল! সম্প্রতি অন্তবর্তী নির্বাচনে জিতে এম এল এ হয়েছেন পঙ্কজ তলাপাত্র। ভোটের সময় তার শ্লোগান ছিল—শূদ্র জাগরণ। ইদানিং একটি কালো এম্বেসেডারে ঘোরাফেরা করেন কেবল। সভাসমিতি। সেদিন আগরতলার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসবে, সভাপতি হয়ে এসেছিলেন। গ্যাঁট হয়ে বসেছিলেন গাড়িতে। তলাপাত্রের কোলে সাদা লোমওয়ালা ভুটিয়া কুত্তা একটা, মনিবের ঠোঁটে মুখে পিল পিল করছিল। এম্বেসেডারের দরজা খুলে দিয়েছিল অন্যলোক।

নেমন্তন্ন করেনি সে সাবইন্সপেক্টর নিরঞ্জন বৈদ্যকেও। শালারা জগদীশদা'র ইনফরমার। ননীদা অশীনদাদের মত যে কজন ইউনিয়ন লিডার আছে—ওদেরও বাদ দিয়েছি। এজন্যে আমি শাণিতের কাছে ঋণী—ওর চোখ দিয়েই সময় সময় চিনতে পেরেছি ওদের। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের দালালগুলোকে। এজি অফিসের আর কাউকে বলার কথা ছিল কি? মনে হয় না। শাণিতের তো চাকরি চলে গেল। আবার হল। কিন্তু জয়েন করছে না। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হয়নি। তাছাড়া আমিও যে একই অফিসে চাকরি করি মনেই থাকে না। মনে হয় পত্রিকার লোক।

আর একজনকে মাত্র নেমন্তন্ন করেনি সারথি। সাধারণ নাগরিক হিসেবে ভদ্রলোকের খুব নাম ডাক হয়েছে। শ্রীযুক্ত রতীশ গোপ মহাশয়। ইতিমধ্যেই আগরতলার অনেক সভা সমিতিতে আমন্ত্রিত ও সম্মাণিত হয়েছেন। ডি এম অফিসের কর্ম্মচারী। মঠচৌমুহনীতেই বাজার করেন রোজ। তবে নজরে পড়ার মত সুদর্শন ভদ্রলোক। রঙ ফর্সা। চোখে চশমা। আজকাল উত্তর-পূর্বের চিঠিপত্র কলামে কনজিউমার্স রাইট, সিভিক সেন্স ইত্যাদি বিষয়ে খুব লিখছেন। বনমালীপুরে ভদ্রলোকের বাড়িতেও গিয়েছিল সারথি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। দেখে—ওরা স্বামী স্ত্রী সহ পুরো এগারো জনের একটা টিম। ফলে নয় সন্তানের জনক এই ভদ্রলোককে আরকিইবা বলবে সে!

সান্ধ্যচক্র সন্ধ্যার সময়ই হবে। তার আগে দুপুরেও পত্রিকা অফিসে একপ্রস্থ খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল বেশ। কে খাওয়ালো? কিপ্টা জগদীশ! মোটেই না। আজ কর্ম্মচারীরাই খাইয়েছে হোটেলের মাংস বিরিয়ানি। আজই প্রথম একটা পুণ্যিও করে ফেল্লেন জগদীশদা। বললেন— তোমরা বিশ্বাস করো—বহুদিন পর খাওয়া দাওয়া করে এত তৃপ্তি পাওয়া গেল। এইভাবে আমরাও বুঝে যাই—আমাদের বেতন বৃদ্ধি ব্যাপারটাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। আজ থেকে কাজের সময় আধ ঘন্টা বেড়ে গেলেও মন খারাপ লাগছে না এখন।

ফটকের মুখেই দাঁড়িয়েছিল সারথি। জগদীশদা বলেছিল- রিসেপসনে থাকবে তুমি। এলোমেলো দৃষ্টি। ভাবনার গতিও থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ঘরে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির শুনছে। এক দুই করে কাঠালি বটের ফল এখন ঘাড়ে গলায় পড়লে তার খেয়াল হল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সবুজ হলুদ সবই কালো হয়েছে যখন। অন্যমনস্কভাবে, আমন্ত্রণ ভুলে বরং পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারথি। তবু কিছু ছায়া প্রতিনিধি তাকে ঠেলে ঠুলে পত্রিকা অফিসে ঢুকে। একটু আগে সে-ইতো দাওয়াত দিয়ে ফিরল ওদের। ঢুকতে ঢুকতে কেউ উঁহশও করেছিল, অবশেষে চেতনা গিয়ে ঢুকল। পারফিউমের গন্ধ ঘিরে থাকল সারথিকে।

চেতনার শরীরের টানেই হয়ত প্রবেশ করল সেও। ঢুকেই দেখল কনফারেন্স রুমের দরজায় রক্তবর্ণ আলো জ্বলজ্বল করছে। ঠিক তার নীচে একটা টুলে বসে দ্বাররক্ষী কৃষ্ণ এখন এককান ছুঁইয়ে রেখেছে দরজায়।

—কি হয়েছে রে ?

—কুছ নেহি সাব, গানা।

ততক্ষণে দরজা ঠেলে, সারথি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতেই শুনল মিউজিকে শচীন কর্ত্তা। খুবই হালকাভাবে। বাইরে থেকে শোনার কথা নয়। বরং যাযাবর পাখিরা সান্ধ্য আশ্রয় পেয়ে যেমন কোলাহল করে। তলে তলে মিউজিকের দুলুনিও লক্ষ করে সারথি। সব মিলিয়ে একটি—কী বলব ! সারথিকে ঢুকতে দেখে জগদীশদাও ইশারা করলেন—দরজা। আবার বললেন—গুর্খাকে বলে দে—তেমন জরুরী না হলে যেন ডিসটার্ব না করে।

গ্লাসে গ্লাসে জড়ানো জটলা, মুহূর্তমাত্র দাঁড়িয়ে পড়েছিল সবাই। তারপর শান্ত জলে ঢিল ছুড়ে মারার মত এক হুকুমেই তা ভেঙে দিলেন তিনি। চিয়ার্স। এবার ক্যামেরা ঘুরবে। উত্তর পূর্বের সম্পাদক জগদীশ সিংহ রায়। নামমাত্র সুবিধা থাকলেই বলে—আমাকে এসাসিনেট করা হতে পারে। তখন শ্রোতাদের মধ্যে শিক্ষক সবিতাব্রত পেলেই যে সাধারণত প্রতিবাদ করেন —মার্ডার বলো। তারপর তথ্য দপ্তরের দেবব্রত চৌধুরী, টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার সাংবাদিক চেতনা ঘোষ, প্রবীর, সারথি আরো অনেকেই উপস্থিত। চেতনাদের অবশ্য অন্য পরিচয় ও আছে—ওরা কবি সাহিত্যিক।

সারথি বিদ্রুপ করে—সখের কবি। এইসব কেজুয়াল ব্যাপার স্যাপার দেখলে প্রবীরের মত সত্যি আমারও গা গুলায় ! তবে চুরি চামারি নষ্ট রাজনীতি করার চাইতে নিশ্চয়ই ভাল। সুতরাং কবিতা আবৃত্তি সহ গান বাজনা, ছুটাছাটা লেখালেখি, আঁকিবুকিকেই আমরা বলি শিল্প সংস্কৃতি।

—তারপর তুমি বল গঙ্গাপুত্র ! তোমাদের সরকার তো অনেক দিন ধরেই রাজ্য শাসন করছেন। কৃতিত্ব বল।

—সত্যি, দেখতে দেখতে দিন চলে যায় !

আব অন্যমনস্ক হয়ে যান দেবব্রতদা। স্কুলে কলেজে থাকতেই রাজনীতি করতেন শুনেছি। চিরদিনই বামপন্থী। তবে সরকারপন্থী শুনলেই চটে যান। মাথা নুয়ে আসে তার। ঘৃণায়ও হতে পারে। এই মুহূর্তে কি বিড় বিড় করে চলেছেন—জগদীশদা কেন, তার কিনারে বসে আমিও তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

এখন চেতনাই আমাদের রাণী মৌমাছি। চুল যেমন শ্যাম্পু করা—এক থেকে আরেকটা সম্পূর্ণ আলাদা। শাড়িটাও হাল্কা নীল। শরীরের স্পর্শ পেলেই জল রঙ ধরে।কোন কোন খানে পাতলা পর্দার মত। কোন কোন খানে ইউ, আবার কোনখানে ভি কাট ভূমির উপর শুয়ে রয়েছে পাহাড়ি নদীর মত স্বচ্ছ। প্রত্যেকটা চোখই এখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত। জগদীশদা পর্যন্ত ট্যারা হয়ে গেছে। রক্ষা হয়েছে প্রত্যেকের গ্রিপেই রয়েছে গ্লাস। একের পর আরেক ট্রে আসছে। খালি গ্লাস নিয়ে ফেরার সময়ই বেশি এক্সিডেন্ট হয় —সবাই নিশ্চয় এই কথা ভাবছে এখন।

কেবল দেবব্রত অন্যমনস্ক । প্রথমবারের গ্লাস এখনও ধরে রেখেছেন । এক চুমুকও দেননি । না দেওয়াই ভাল । মদ বামপন্থীদেরও গুণাহ্ কিনা জানি না—বাল্যবন্ধু জগদীশের ডাক কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারেন না তিনি । আমি জানি তো —প্রথমে জগদীশচন্দ্র, তারপর বামপন্থী সংগঠনও তাকে ফোক্‌লা করে ছেড়েছে । বেশ করেছে ! সারথির সব রাগ গিয়ে পড়ে এই বেঁইট্যা লোকটার উপরই। —তুমি কেমন লোক শালা, প্রতিরোধ না কর, প্রতিবাদ তো করতে পারতে ! সম্পাদকের চেম্বার থেকে পা টিপে ঘাড় গুঁজে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলে । নিজের দলের মধ্যেই পিছোতে পিছোতে যার পিঠ ঠেকে যায় দেয়ালে । এখানেও এতটুকু মার্কসবাদ ফলে না । ফিরে দাঁড়াবার আগেই ঝাঁঝরা করে ফেলে । তবু মেদিনী স্পর্শ করতে পারেননি তিনি । সময় আসেনি । আজকাল শরশয্যায় শুয়ে পাপপুণ্যের কথা চিন্তা করেন কেবল । একদিন বৌ-এর সোনাগয়না বন্ধক রেখে বন্ধুকে সাহায্য করার ফল কি ফলল ! বা হয়ত এসব কিছুই ভাবেন না তিনি । খালি ঝিমান। রাগে দুঃখে দেবুদার বৌ দীপ্তি বৌদিও একদিন জগদীশের চেম্বারে গিয়েছিলেন পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে।

সব শুনে বস্ বলেছিল— দেব, তবে কাগজপত্র কিছুই নেই যখন ! ফেরার পথে একই করিডোরে সারথির সাথে দেখা । সেই পা টিপে টিপে, ঘাড় গুঁজে ।

এইবার দেবুদার চোখের সামনে হাত নিয়ে চুটি মারলেন জগদীশদা—কিরে বেটা মরে গেলি নাকি ? ফলে অর্দ্ধেকটা মদই ছলকে পড়ে গেল দেবুদার হাত থেকে । যেন সার্চলাইট জ্বলছিল অনেক গুলি । এবং উপস্থিত প্রতিটি ইট কাঠ পাথরও হো হো করে উঠল ।

—আমরা তোর কথাই তো বলাবলি করছিলাম রে —কী দারুণ হাত ছিল ! গণসাহিত্য প্রচারপত্র ইত্যাদি লিখে লিখে সব নষ্ট করে ফেল্লি ।

এবার সারথিও তার কানে মুখ ঠেকিয়ে বলল—

—কার ?

—আমি শ্রীযুক্ত শ্রীল শ্রী শ্রী সারথি দেববর্মা । অথচ আপনি আমাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না মশায় ! একবার আদেশ করুণ মাইরি ! ভোতা মুখগুলি সবই সোজা করে দিতে পারি !

যেন বিদ্যুৎ স্পৃস্ট হলেন তিনি । দুই হাত তুলে না না করে উঠলেন দেবব্রত !

—কি হল বাবাজীরা ? কি কথা ?

এবার আমরা দুইজন শুধু হাসতে হাসতে —কিছু না কিছু না । ওরাও আবার হরি হরি বোলা ধ্বনির মত ওরাও চিৎকার করে উঠল—চিয়ার্স !

—তোমার মনে আছে কি জগদীশ—এই দপ্তরে সেদিন সারা রাত জেগে শুধু নির্বাচনী ফলাফল শোনা ! এখন একটা কাজ করতে পারো—বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর —এই শিরোনামে সমীক্ষা করতে পারো তোমার কাগজে ।

—পারি না হে, পারি না ! কী লিখব ? হুরুয়া হত্যাকান্ড ? সিদ্ধার্থবাবুর নৃশংসতা নিয়ে আর কতকাল ভোটার খেপানো বল ? বুকে হাত দিয়ে বল —আইন শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠাবাবুরা ! রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মোকাবিলায় বামপন্থীরা তো চিরদিনই দড়—বলো ঠিক বলেছি কিনা !

দেবব্রতদা ক্যাবলার মত হাসতে থাকেন । বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল ঘসটে ঘসটে ছাল চামড়া তুলে ফেলছেন শুধু শুধু ।

—তোমার মনে আছে কি জগদীশ—তুমিও একসময় বামপন্থী করতে ? ছাত্র আন্দোলন কত মিটিং মিছিল ? সেই দিনগুলির কথা কিছু বল !

—ব্রেভো, দেবব্রত ব্রেভো !

—বলবই তো ! কেন বলব না ! তোমরা সবাই শুনো—আমি জগদীশ সিংহ, আমিও বামপন্থী রাজনীতি করতাম । আর লক্ষ্য করতাম উঁচুতলার কমরেডেরা কিভাবে নিচুতলার ক্যাডারদের ডিল করে ! দেখতে দেখতে শিখেছি রে ভাই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি — এই মগজ ধোলাই করতে দেব না তোদের ।

কথা বলতে বলতে আচমকাই হেসে ফেলেন জগদীশদা—না না ! তোমরা ভুল ভাবছ—আমি উত্তেজিত হইনি মোটেও ।

—তবু হাইপ্রেসার ব্লাড সুগারের রোগী—এত জোরে জোরে কথা বলা কি উচিত !

—তা অবশ্য ঠিক । যেন কী এক প্রশান্তিতে চোখ বুজলেন জগদীশদা ।

আবার খুললেন । হাতে অসমাপ্ত গ্লাস ।

—আজ বিশেষ কারণে তোমাদের ডেকেছি এখানে । তারপর সারথিকে ইশারা করলেন ঢালো ।

সারথি অবশ্য এজাতীয় কাজ পছন্দই করে । তবে কারো অর্ডার কেরি আউট করতে গেলেই তার মনে পড়ে—এই শরীরে অসহিষ্ণু রাজরক্ত আছে । কত বদলে গেছে দিনকাল । এখন বেড়ালে চাটে বাঘের গাল । সারথি ফ্রিজ খোলে । ডিপ ফ্রিজ । ট্রে থেকে এক পিস্ এক পিস্ বরফ টুকরো রাখে খালি গ্লাসে । লক্ষ্য করে চেতনার হাতে থামস্ আপের বোতলও এখন খালি । শাণিত

থাকলে নিশ্চয়ই কিছু দুষ্টবুদ্ধি এপ্লাই করত। ঠান্ডা তরলের রঙ যেমন আছে তাই রেখে নরমে গরমে মাতোয়ারা করে ছাড়ত। তবে সারথির ভাল লাগে না এসব। তেমন ইচ্ছা মনে জন্ম নিলে সরাসরি বলে ফেলাই ভাল নয় কি। লাগলে বাড়ি বাউন্ডারি।

—দেবী মহামায়া! আজ অন্তত পরিবেশ দূষণ নিয়ে মাতামাতি করবেন না প্লিজ।

যদিও চোখ ছিল তার জগদীশ, সবিতাব্রত, দেবব্রতদের দিকে। ওদেরও ঠোঁটে ঝুঁলছে সিগারেট। সুযোগ বুঝে সবকটি মুখাগ্নি করে নিল একসঙ্গে। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল তবে চেতনার দিক থেকে দূরে দূরে—

—বড় দুঃখ দিলে বৎস। পরিবেশকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখাচ্ছ ঠিক আছে! কিন্তু আমি প্রকৃতির দিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই বাছা! তোমার খসে পড়া আঙ্গুলটি আরেকবার দেখাও দেখি হে বনরাজকুমার!

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে চিৎকার—থামস্ আপ্ থামস্ আপ্

—অর্ডার অর্ডার! এবার থেকে আমরাও একটি! অর্ডার! একটি মাসিক সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করব ঠিক করেছি।

—শেষ পর্যন্ত তুমিও জগদীশ!

—হ্যা ভাই, আমি সেই জগদীশ সিংহ—যে এখনও বিশ্বাস করে ত্রিপুরার সাহিত্য নিম্নমানের।

—তাহলে তো লেঠা চুকেই গেল—ঢাকা কলকাতা থেকে যত খুশি ফক্তা লেখা এনে ছেপে দাও, ব্যবসা করো।

—আহা, রাগ করো কেন! সঙ্গে তোমাদের লেখালেখিও থাকবে—

—যথেষ্ট হয়েছে? হাতজোড় করেন সবিতাব্রত। প্রসঙ্গটা পাল্টাও! তখনই দরজায় একটা টোকা পড়ল, পর পর অনেকগুলি, ধূড়ুম ধাক্কা—

—কে ভাই? ভেতরে এসো।

সামান্য কেঁপে উঠল সারথি। বিদ্যাটিলা মানে কলেজ টিলার সেই আঁতেলগুলি নয় তো? ময়ূরপুচ্ছ। জগদীশদা বারবার বলা সত্ত্বেও ওদের নেমন্তন্ন করেনি সে। বাড়িতে গিয়ে পাইনি বলে দিয়েছে। মনীষ হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে প্রবীর সারথিকে টানতে টানতে করিডোর পর্যন্ত নিয়ে গেল।

—কি হলো রে?

চট্ করে কৃষ্ণগুর্খার সামনে মুখ খুলতে চাইল না সে। একেবারে দরজার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল—শাণিতদার খবর পাওয়া গেছে তো!

—সে কি বেঁচে আছে এখনও?

—সবই শোনা কথা অবশ্য—রেষ্টহাউস - রিফ্রেস-এ, এয়ারপোর্টের কাছাকাছি।

—চলরে সারথি, আজ ওর একদিন না হয় আমাদের!

মোটর সাইকেল যথারীতি দাঁড়িয়েছিল বটগাছের নিচে। ইদানিং এক রকমের ভুল হয় সারথির—মাঝে মাঝেই মনে হয় সে আমার কালো ঘোড়া লেজ নাড়াচ্ছে। রাতের বেলা অতটা বুঝা যাচ্ছেনা, কিন্তু শুকনো পাতার উপর দিয়েই শব্দ করে হেঁটে যেতে হল। এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি কেউ জানুক সে চায় না। আর পাখি শালাদের সংসার যেন সর্বত্রই বিষ্ঠা সর্বস্ব। হেন্ডেলবার, সিট সবই ভরিয়ে রেখেছে। সারথি সড়ক থেকে একটুকরো কাগজ হাতড়ে নিয়ে মুছে মুছে ছুড়ে ফেলে দিল দ্রুত। তারপর যে অংশে প্রবীর বসবে সেখানে চাটি মারল দুইবার। আয়! আর এক কিক্ মারতেই ভেট্ ভেট্ করে উঠে। কব্জি ঘুরিয়ে ক্লাচ করে। —প্রথমেই ভাল করে বসবি, পরে নড়াচড়া করতে পারবি না বলে দিচ্ছি—

—ঠিক আছে।

যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল ও, উপশম হল গরমের। রাতের নির্জন রাস্তা। আলো জ্বলছে। তার উপর জোৎস্না।

—তোদের আসরে আমি শালা অডম্যান ছাড়া কি ! কেনইবা আমাকে ডাকা হয় ! সংবাদপত্রে সাহিত্যের প্যাচপ্যাচানি একদমই সহ্য করতে পারি না আমি ।

—তুই থামবি ? একই ঘ্যান ঘ্যানি আর ভাল লাগে না । হয় ইংলিশ মুলুকের গুণ গাও, না হয় সাহিত্যবর্জিত সংবাদপত্র করো । কেন, এছাড়া কি আর কিছুই করার নেই !

—হকিকত ভাই হকিকত । অবশ্য তুই এসব বুঝবি না । ভেতো বাঙালির সঙ্গে থাকতে থাকতে তোদেরও মগজ জল হয়ে গেছে ।একেই বলে ব্রইন ওয়াশ ।এবার অন্যকথা বল্ —তোরা বাঁশ পূজা করিস কেন বল ? নাকি তাও ভুলে গেছিস শনি সত্যনারায়ণের চোটে ?

—তোর কপালে দুঃখ আছে বুজতে পারছি ।

— তাহলে শোন্ ! আর্য কুললক্ষ্মী চিত্রাঙ্গদার উত্তরসূরীরা এখন এস টি সাটিফিকেটের জন্য হন্যে হয়ে মরছে –

—ওহে ধীবর ! তোমরা যখন শুধুই মৎস্যজীবী ছিলে তখনও আমরা এখানে রাজবংশী ! তুমি কার সাথে কি কথা বলো হে ছোকরা !

কথা বলতে বলতে কখন যে স্পিড্ বাড়িয়ে দিয়েছে সারথি, ল্যাম্পপোস্টগুলি পৎ পৎ করছে, খেয়াল করেনি । প্রবীরের কথাও হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেছে । পেছনে বসে সে স্পিড ব্রেকার গুলির লম্ফঝম্প লক্ষ্য করছিল । এয়ারপোর্টের রাস্তা সাধারণত মসৃণই থাকে । মাঝে মাঝে দুই একটা জিপ, পাচারকারীদেরই হবে মনে হয়, এদিক ওদিক করলেও পথচারী নেই কোন ।

উষাবাজার পার হয়ে এসেই অতি সম্প্রতি এই রেষ্টহাউস হয়েছে । আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি এখনও । দৈত্য ত্রিপুরের মত বড় । একেবারে সিঁড়ি ছুঁয়ে এসে দাঁড়াল রাজদূত । পাশেই একটি গোলবেদি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় চারমুখো চারটে টিউব থেকে অঝোরে আলো পড়ছিল , বাধা না পেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল সবদিকে । যদিও ছায়াদের কোন নড়াচড়া নেই, রিসিপসন কাউন্টারও শূন্য । শির শির বাতাসে, রাতের বেলা, এমন শুনশান জায়গায়, প্রবীর সারথির একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেলে । কোথাও কোন লোকজন না দেখে ভেতরে প্রবেশ করে ওরা করিডোর ধরে এগোয় । দুইপাশে সার সার দরজা , প্রত্যেকটাই সিংগল রুম হবে মনে হয় । প্রবীরের গলায় কিছু কাশি জমেছিল, দ্রুত পরিস্কার করে নিতে চাইলে সারথি হতচকিত ঠোঁচে আঙুল ছুঁইয়ে ইঙ্গিত করল — আস্তে । আর দেরী না করে পাশেই বন্ধ দরজাগুলিতে কান পেতে পেতে কি যেন শুনে সারথি । অবশ্য যে দরজাগুলি ভিতর থেকে বন্ধ । খুবই অস্পষ্ট হলেও সব কটিতেই কিছু না কিছু শব্দ, টুকটাক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে । আরো একটিতে কান পাততে যাবে এমনসময় পেছন থেকে রমনীয় কণ্ঠে শোনা গেল- এক্সকিউজ মি, আমি রিসিপসনিষ্ট সোমদত্তা । দুজনেই পেছন ফিরে দেখল—রীতিমত রূপসী । সারথি বলল- তুই কথা বল, আমি কাজটা সেরে আসি । আবার আড়ি পাতল, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই । এইবার একটা লাথি মারল দরজায় , কয়বার ভাইব্রেট করে ছিটকিনি পড়ার শব্দ হল ।

—কি হচ্ছে এসব ? কে আপনারা ?

—দেখে যান, বলেই মেয়েটির একটা হাত ধরে টানতে টানতে রুমের ভিতর ঢুকে যায় সারথি এবং ঢুকেই বিকট চিৎকার করে, ছিটকে বেরিয়ে আসে মেয়েটি —

তখনও থর থর করে কাঁপছিল । প্রবীর বলল প্লিজ কাম ডাউন, উই নিড ইয়োর হেল্প।

সোমদত্তা আর একটিও কথা না বলে সোজা রিসিপসন কাউন্টারের দিকে ছুটে যেতে লাগল। তার পিছু নিল প্রবীর । পৌঁছেই দত্তা টেলিফোন রিসিভার তুলতে গেলে, তার হাতের উপর হাত চেপে বাধা দিল প্রবীর । প্লিজ ! মেয়েটি চিৎকার করে উঠল —গার্ড । একই সঙ্গে প্রবীরও তার পকেট থেকে কার্ড বের করে সোমদত্তাকে দেখাল । বলল— টেলিফোন করলে আপনারই ক্ষতি হবে । দয়া করে আমার কথাগুলো শুনুন ।

তখনও কেউ এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়নি। যাই হউক, সোমদত্তা এখন টেলিফোন রিসিভার ও প্রবীরের একটা হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইলে, সেও সচকিত ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল—স্যরি ! মিনিটখানেক পর দত্তাকে কিছুটা শান্ত মনে হলে, সে শুরু করল এইভাবে—আমাদের এক বন্ধু বেশ কদিন ধরেই মিসিং, আর এই ব্যাপারটিতে ত্রিপুরার একজন ভি আই পি জড়িত।

রিসিপসনিষ্ট মেয়েটি বলল—জানি। একজন এম এল এ। এই রুমটি তিনিই বুক করে রাখেন সবসময়।

—বুঝতেই তো পারছেন ! কিছুক্ষণ আগে আপনি যা দেখে এসেছেন, গা ঘিন ঘিন অস্বাভাবিকতা, ব্যাপারটা আমাদেরই ডিল করতে দিন, এটি আপনার কাজ নয়, অন্তত অসভ্যটার কোপে বাড়তে হবে না, আর যাই হোক, আমরাও কোন বিপদে ফেলব না আপনাকে। কেবল বন্ধুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

এতক্ষণ পর দরজায় এসে দাড়াল দশাসই একটি লোক, খাকি পোষাক পরা, টাকলা, গোঁফজোড়াও যার হাতের লাঠির মতই মোটা। এবাব সোমদত্তার ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠল, হাতের ইশারায় লোকটাকে ফিরে যেতে বললেও, গার্ড কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে তবে ফিরে। প্রবীরও উঠে দাঁড়ায় — ম্যাডাম, ওদিকটা একবার দেখে আসি।

আরো একটি কথা মনে হল তার — এখানে করিডোরের শব্দাশব্দ কোন ভাবেই বর্ডারদের বিচলিত করে না। তাতে আমার কি ! প্রবীর দেখল —নির্দিষ্ট ঘরের দরজাটি খোলাই আছে, তবে ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। ভেতরে ঢুকে তো আরো অবাক হল — একই চেয়ারে হেলান দিয়ে তখনও চোখ বুজে বসে সিগারেট টানছে সারথি, তার পায়ের কাছে অনেকগুলি সিগারেট কুচি টুকরো ছাই ইত্যাদি পড়ে রয়েছে, কতকগুলো পিষ্ট, কতকগুলি এমনি। দুচোখ বন্ধ রেখেই মুখ খুলল সে—এতক্ষণ তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি, অপারেশন শুরু করব এবার।

এত বড় উষা বাজার। পাশাপাশি গাছগাছালিতে এখন পাখিব ঘোসলা পর্যন্ত চোখে পড়ে এত আলো। যার বুকের উপর দিয়েই এয়ারপোর্টের পথও গেছে — কালো পিচ্ছল এবং প্রশস্ত। একটির আলো নিঃশেষিত হবার আগেই আরেকটি ল্যাম্পপোষ্ট বাতি ধরে রেখেছে। এরই মাঝে দশদিক কাঁপিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে কিভাবে ? প্রবীরের গায়ে কাঁটা দেয়। তবে সারথির চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলছে তখনও। ওর কাছ থেকে কিছু হলেও সংগ্রহ করতে হবে।

আর এতক্ষণ একি দেখছি আমরা ! দক্ষিণের দেয়াল ছুয়ে বিছানায়, এমন অভিজ্ঞতা আগে আর কোনদিন হয়নি, দুটি উলঙ্গ পুরুষ, যদিও নারী পুরুষের মতই জড়াজড়ি মুখোমুখি শুয়ে রয়েছে। বাইরে শিয়ালের হুক্কা হুয়া ছাড়াও, মিনিট কুড়ি আগে দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা হল প্রায়, সবই নিস্ফল হল অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এতটুকু চেতনা নেই তাদের। কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। গোঙানির শব্দ। এগিয়ে গিয়ে সানিতের বাহুমূল ধরে ঠেলতে লাগল প্রবীর — কি হল ! উঠ উঠ ! কিন্তু কে শোনে কার ! আর বিছানার কাছে বমির চুয়া গন্ধ। উল্টি আসছিল প্রবীরেরও তবে দুর্গন্ধে নয়, সামনে এই বেড সিনটি আর সহ্য হচ্ছে না। একহাতে শানিতের গলা জড়িয়ে ধরেছে পঙ্কজ। নাকে মুখে রীতিমত শ্বাসশ্বাসি হচ্ছে। আরেক হাতে সবল লোকটি ধরে রেখেছে দুর্বলের লিঙ্গ। শানিতের চোখে মুখে রক্ত জমে, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সারথি উঠে দাড়ায়। সিগারেটের শেষ অংশ জুতোয় চেপে, আর দাঁড়ায় না, গট গট করে এগিয়ে যায় গুলজারের দিকে। প্রথমেই পঙ্কজের যে হাত শানিতের গলা জড়িয়ে ধরেছে, বাঁকা বেতের লাঠি সোজা করার মতই হেচকা টান মেরে — বোঝা গেল অত সোজা নয় ব্যাপারটা। সারথি খানিকটা আলগা করতে পারলেও, এখন ওরা একে অন্যের পায়ে যেভাবে ক্যাওরা দিয়ে রেখেছে, মাত্র দুইহাতে এতসব প্যাঁচ খোলা সম্ভব না তার পক্ষে। হাত খুললে পা, পা খুললে হাত চলে যায় স্বস্থানে। তাই সে প্রবীরকে ডাকল — শোন, বেল্লিকের হাত আলগা করে দিচ্ছি, তুই

টেনে ধরে রাখ। হাতের পর পা, নাগপাশ থেকে শাণিতের পা কিছুটা মুক্ত করতে পারলেও, প্রবীর সারথির চার হাত আসলে অপর্যাপ্ত। শয়তানের অন্যহাতে তখনও একটি পুরুষাঙ্গ পিষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ সব ছেড়ে ছড়ে সারথি বলল — দাঁড়া, একটা সিগারেট খেলে বুদ্ধি বাড়বে। তাছাড়া থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করতে হবে বুঝতে পারছি। প্রবীর ভাবল নিশ্চয়ই সিগারেটের ছেঁকা ইত্যাদির কথা ভাবছে সারথি। কিন্তু কিছুই না করে আচমকা একটা লাথি কষিয়ে দিল পঙ্কজের মেরুদন্ড সহ পাছায়। ক্যাক ক্যাক করে পাশ ফিরল নরপশুটা, ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা ঝরছে তখনও। এই মুহূর্তে মুখে কিছুটা যন্ত্রণার ছাপ পড়লেও, ও যেন কতযুগ ধরে শ্যাওলা জমা চোখ দুটো টেনে টেনে কিছুতেই খুলতে না পেরে আগের মতই চুপ মেরে গেল। তারপর রাহুমুক্ত শানিত সেনগুপ্তকে ওরা দেখছিল খুব ভাল করে — কি ছেলে কেমন হয়ে গেল! সারথি বলল — ধর ধর্। আর এক সেকেন্ডও দেরী নয়।

তারপর মুন্ডু কাটা জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেভাবে খিল মেরে থাকে অনেকটা সেরকমই, মূর্তি ভেঙে যাবে ভয়ে ভয়ে কোনকমে মেঝেতে দাঁড় করালো ওরা স্ট্রাকচারটাকে। বুকের কাছে কী ভারি মাথারে বাবা!

— ওর হাত দুইটা আমাদের কাঁধে রেখেই সিড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হবে বুঝলি তো!

প্রবীর ভাবল হাত ছেড়ে দিয়ে একবার দেখব নাকি, পড়ে গিয়ে গুড়া গুড়া হবে নাকি শানিত সেনগুপ্ত? নাকি রক্তাক্ত হবে! বেঁচে আছে তাহলে!

কিন্তু জীবন্মৃতকে টেনে নিয়ে যাওয়া অত সোজা না। রীতিমত হাফাচ্ছিল ওরা। করিডোরে লক্ষ্য করে দেখল সোমদত্তাকে কোথাও দেখা যায় কিনা। কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। তাছাড়া আমিও তো উল্টোপাল্টা করেছি। তখন টেলিফোন করতে চাইলে বাধা দিয়েছি। চেপে ধরেছি ওর হাত আর সেই অনুভূতিটার বোঝাও বয়ে চলেছি এখন একইসঙ্গে। সারথি বলল — এবার একাই ধরতে হবে তোর। তবে শক্ত করে। এই বস্তা একবার পড়লে আর তোলা যাবে না। আমি বাইকটা স্টার্ট করি।

— যা।

সারথি দু এক কদম যেতে না যেতেই, হুসিয়ার করা সত্ত্বেও, প্রবীর থর থর করে কেঁপে উঠল — হাত আলগা হয়ে গিয়েছিল কি? রীতিমত ঘামছে এখন, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। রিসিপসন কাউন্টারের সামনে কি কেউ দাড়িয়েছিল? হাসছিল মিটি মিটি? একেই বোধ হয় বানবাইন্যা বাতাস বলে। কোথা থেকে আসে কোথায় যায়! বুকের ভেতর তোলপাড় করে। আরো অস্থির হয়ে উঠার আগেই রাজকুমার সারথির ভেটভেটি শুনতে পায়। একেবারে গা ঘেষে এসে দাড়ায় রাজদূত।

মাণিক্য বাহাদুর বসে বসেই শাণিতের এক পা টেনে সিট পার করে বসিয়ে দেয় মাঝখানে। ওর পেছনে তুই বস। শক্ত করে ধরে থাক। ব্যাস, তারপর গিয়ার চ্যাঞ্জ করেও কিন্তু পা চালাচ্ছে না চৈতক এবং প্রবীর যেন কিছুতেই দেখতে না পায়, একটা হাত পেছনে নিয়ে যায় সারথি। হঠাৎই চিমটি কাটে শাণিতের পেটে।

— উঃ!

— বচ্ গয়া শালা!

সতের

আকাশ যেখানে শেষ হয়েছে, যেখান থেকে অসীম অন্ধকার অর্থাৎ উদয়-অস্ত খেলা নেই আর। সীমানায় একটি দেয়াল দাঁড়িয়েছিল সংকীর্ণ। তার উপর এতক্ষণ রীতিমত ঘামছিল হামটি ডামটি। কারণ দেয়ালটি কাঁপছে এবং উপরে উঠে যাচ্ছে দ্রুত। কর্তৃত্ব বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। তার পা কাঁপছে। ব্যালেন্স রাখতে পারছে না হাঁটু। থপ্ করে বসে দুই হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইছে কিন্তু কী! ঘাড়ের উপর শূন্যের বোঝা বড় বেশি, পায়ের নিচে প্রাচীরই তাকে ফেলে দিতে চাইছে যখন!

অনিবার্য এই পতন। পড়ে যেতে যেতেও এখন সে বেলুন হতে চায়। আরো তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজেকে। ভো কাট্টা ঘুড়ির মত উড়ে উড়ে যদি—নির্মেঘ আকাশ থাকে আর একই সঙ্গে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকে অমিতাভ বচ্চনের মত কোন লম্বা মানুষ। কিন্তু কেউ নেই কোথাও। উপর থেকে নিচের দূরত্ব মুহূর্ত মাত্র দেখতে পায় সে। পরের মুহূর্তেই দৃষ্টি ছেয়ে ফেলে জলে। ধপাস্ করে পড়ে গিয়েই ভাবতে শুরু করে আমি গুড়া গুড়া হয়ে গেছি পারদের মত। —আমার মা অতসী সেনগুপ্তই তাহলে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল আমাকে!

এবার অঝোরে ঘামছে। চলতে চলতে কখন যে ফ্যান দুটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেন গলা টিপে ধরেছিল কেউ। শাণিত ধড়ফড়িয়ে উঠে। তিনটে কথা প্রায় একই সঙ্গে ঝেকে ধরে এখন —এমন মরণাপন্ন অবস্থা কেন? জল চাই। আর কান্নায় বুক ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল না তার মধ্যে। সে পেচ্ছাপ করতে গেল না বা জলও খেল না ফিল্টার থেকে।

ডেস্কে মাথা রাখে আবার। অনুভব করার চেষ্টা করে সকাল হয়েছে কিনা। তেমন হালকা বাতাস বইছে নাতো! পাখির কিচির মিচিরও শোনা যাচ্ছে না। তারপর মনে হল আমাদের পত্রিকা অপিসের বাইরে মস্ত বড় একটা অশ্বত্থ গাছ আছে এবং পাতার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র ফুল, মাটিতে পড়ে হলদে রেণু রেণু হয়ে যায়। আর চেনাই যায় না।

ইদানিং দিনের বেশ অর্ধেকটা সময় এই ভাবে কাটে তার। আধো ঘুম আধো জাগরণে। মগজে দাঁত বসিয়ে রাখে নেশা। আস্তে আস্তে কাটে তার বিষ। কামড় তুলে নিয়ে আলতো চুমু খায় যখন তখনই কী ভোর হয়? ঠান্ডা হাওয়ায় কি পরীর পরশ লাগে চোখের পাতায়?

লাগলেও কয় মুহূর্ত মাত্র। ঘোর কেটে গেলেই আবার অস্থির উচাটন শুরু হয়ে যায়। জিহ্বা গলা শুকিয়ে আসে। আর আমি যত বলি—পানি চাহিয়ে লবঙ্গী। ততই সে আমাকে বিস্বাদ জল এবং বিসর্জনের দীঘি দেখিয়ে দেয়। ধাক্কা দিয়ে ফেলেও দেয় হয়ত, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ডুবিয়ে দেয়।

তারপরও সমস্ত শক্তি দিয়ে অতল থেকে উঠে আসতে চায়। পারে না। সাঁতার জানে না বা মানুষখেকো জলজ লতায় জড়িয়ে যায় পা। এক্ষুণি এক ছিলিম গাঁজা এবং কয়টা ঘুমের বড়ি বড় প্রয়োজন। কারণ গত কিস্তির টাকা না দিলে লবঙ্গী তাকে লাউপানি দেবে না কিছুতেই। কাকুতি মিনতি করেও দেখেছে কোন লাভ হয় না। তোষামোদ করে বলেছে—লাবণ্য তুমি এখনও দারুন দেখতে। মনটা তোমার ফুলের মত। এত কচি বয়সে কোমরে বাতের ব্যথা ধরালে কি করে? একটু টিপে দেব নাকি?

লবঙ্গী হাসে—হারামীর বাইচ্চা! এইটা করতে পারছ অবশ্য। এর লাইগ্যা তোর থাইক্যা কোনো পয়সা নিতাম না আমি। বেত বেত শরীর আমার ভালা লাগে।

—আর লাথি ওষ্ঠা কেমন লাগে'ক! গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না যদিও। লবঙ্গীর জল খেলেও মনে হয় বুঝি নেশা হয়ে যাবে! মদে নাকী মাগীতে মজেছে সে! তবে বেহুশ হলে ইদানিং কে পকেট হাতড়ায় তার! কে হতে পারে? বেটা মানুষ হলে আসতে যেতে ঠিকই টের পাওয়া যেত। কিন্তু আমার তো দিনরাত সবই সমান। নিদ্রা নেই। আর ইচ্ছা মৃত্যু আছে। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানে মগজে অসংখ্য তারার ছটফটানি। অথচ শরীর শালা মমির মত পড়ে থাকে নিথর।

যেমন আজ দুইবার ঘুম ভেঙেছে, দুইবারই ঘুমিয়ে গেছে সে। দেখতে ঘুমের মত হলে ঘুমই তো বলব। একই চেয়ারে বসে, ডেস্কে মাথা রেখে। মাঝেমাঝে লাপাতা থাকে যখন এবং সেইসব নরকবাসের কথা বাদ দিলে, আজকাল অপিসে একটাই রুটিন —একই ডেস্কে মাথা রেখে সারাদিন শুয়ে থাকে। সহকর্মীরাও তাকে জানে বোঝে আর আপত্তি করে না। বা হয়ত তার চামড়া পুরু হয়ে গেছে। ইদানিং বড় বেশি ঘামে সে। নিজেই নিজের গন্ধে গুটিয়ে থাকে সবসময়। চুকা চুকা। আবার চটচটেও বটে।

ঘড়ি দেখে শাণিত। মেহগনি রঙের ফ্রেইমে ঘণ্টা মিনিট কিছুই চোখে পড়ছে না যদিও। পারদ পারদ পেণ্ডুলাম দেখছে সে। বা পেণ্ডুলামই শাণিতকে দেখছে। কই ফরক নেহী পড়তা। —বাইরের আলো দেইখ্যা মনে অইতাছে আটটা সাড়ে-আটটা। অর্থাৎ আরো কিছুটা সময় কেটে গেল। অন্য ঘরগুলিতে ফ্যানের শব্দ ছাড়াও টুকটাক আওয়াজ হচ্ছে নাকি ! মুনিয়া ঝাড়ুদারনীর কাচের চুড়ি কিনা অনুমান করতে পারছে না সে। এখনই মনীষদেরও আসার সময় হয়েছে। আবার নিশি ভোর পর্যন্ত চলবে ক্যাচর ম্যাচর। সব অর্থেই সংবাদপত্র দপ্তর মানে মৌচাক। চিচিং ফাক। খবরের ছড়াছড়ি। একটানা গুঞ্জনের মধ্যে দিব্যি ডেস্কে মাথা রেখে শাণিত ঝিমায়। নানা কথাবার্তা শোনে, মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়া বিষয় নিয়েও আলোচনা করে সমীরেরা—শাণিতদার রক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল।

এই অপিসে একমাত্র প্রবীরই আছে যে মরা বিষয় আশয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করে না। কারণ তার হাতে বিষয়ের ছড়াছড়ি। সেদিন তন্ময়কে বলছিল—নির্মলা শিশুভবনের উদ্বোধন করতে মাদার টেরেসা এখানে এলেন, চলেও গেলেন—তোরা কেউ খেয়াল করলি না। একটা ইন্টারভিউ নেয়া উচিত ছিল। শাণিত ডি-রেইলড্ হয়ে যাওয়ার পর প্রবীরই এখন সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড—

—তোমরা কেউ কিছু বললে না প্রবীরদা, জগদীশদাও না।

তৎক্ষণাৎ ধমকে উঠেছিল প্রবীর—সব কথা তোদের বলে দিতে হবে নাকি ! তোরা কি করতে আছিস এখানে ? সেদিন একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মারা গেলেন—আমাদের পত্রিকায় তার কোন খবর নেই। নেই কোন ফিচার। পরেরদিন কভার করতে হল—কেন ?

প্র্যাক্টিকেলি প্রবীর আজকাল মার্কসবাদী নেতাদের মত জুনিয়র কেডারদের ক্লাস নেয়। সংবাদ শিক্ষার ক্লাশ।

তাতে জগদীশদারই লাভ হল—থি থি করার লোক পাওয়া গেল বিনে পয়সায়। এমনিতে ম্যানেজার যদিও একজন আছে—উত্তম। সে সাধারণত টাকাকড়ি নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। সংবাদ ফংবাদ ইত্যাদি বিষয়ে খবরদারি করার লোক সাকুল্যে একজনই ছিল এতদিন শ্রীযুক্ত জগদীশ। এখন শাণিতেরও রূপান্তর হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নূতন মন্ত্রী হয়েছে প্রবীর। তার হম্বি-তম্বি করতেই হবে। তাতে যদি জগদীশ খুশি হয় ! তবে শাণিতের জায়গা দখল করেছে আসলে সারথি। এক্সি অপিসের চাকরির পরেও আরো আরো পয়সার দরকার বুঝা যায়। তা নাহলে সারথি দেববর্মার মত কুড়ে রাজকুমারের এর বেশি কাজ করার কথা না। তাছাড়া আগেও তো দেখেছি তাকে—পত্রিকা অপিসে একদিন এলে দশদিন আসতো না। যাই হউক সেও আমার মতই প্রবীরকে অপছন্দ করে। মানুষ প্রবীরকে নয় অবশ্য —ছেলেটার মন তত খারাপ না। তবে ইংরেজিয়ানার প্রতি দুর্বলতাই—অপছন্দের বিষয়। এবং সমীর মনীষ ওদের মাঝখানে বসে যখন মাষ্টারী করে প্রবীর, তখনও পেছনের সারিতে বসে ফিস্কারি মারে সারথি।

ঘটনাটা কী ঘটেছিল ? সারথি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—স্যার, আমারও কয়টা প্রশ্ন আছে। এক, ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তিসূর্য বলা হয় কেন ?

অন্যরা যেমন তেমন, চ্যাপ্টা প্রবীর যখন অট্টহাসি হাসে তখন বজ্রপাতে খান খান হয়ে পড়ে কনফারেন্স হল। তারপর বলে—তুই কি আমার চেয়ে কিছু কম বুঝিস ? —তুই-ই বল।

— তা হয়না স্যার ! আপনি মাষ্টার।

—ওয়েল। শ্রীমতী গান্ধীর অনেক কীর্তির কথাই আমরা জানি —যেমন বাংলাদেশের জন্ম, ব্যাঙ্ক ন্যাশনেলাইজেসন, সিকিমের ভারতভুক্তি, বিশ সূত্রি প্রোগ্রাম, ইত্যাদি। তাছাড়াও আছে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি—অর্থনৈতিক-সামরিক-সাংস্কৃতিক।

—সবই বুঝলাম, কিন্তু ইমারজেন্সির কি হল ? এ বিষয়ে তো কিছুই বললি না!

—তুই কি ভেবেছিস আমি কংগ্রেসী !

—ছি ছি ! আপনি খামকাই উত্তেজিত হচ্ছেন স্যার।

ব্যাস হয়ে গেল। লেগে গেল যুদ্ধ !

এ ব্যাপারেও প্রবীরকেই দোষে শাণিত। তুই বেটা জগদীশদার উমেদারি করিস বড়। আর এত মাষ্টারি করার স্বভাব কেন? জ্ঞানের বহর দেখিয়ে ভরকে দিতে চাস্! এভাবে উপকার করা যায় না, বুঝলি! আগে তো ভালবাসতে শিখ্। প্রিয় প্রবীরদা হয়ে যা ওদের। দেখিস্ কেমন আরাম লাগে!

শাণিত নিজেই তৃপ্তির মধ্যে ডুবে যায় এখন । ধীরে ধীরে ভাসে। দেখে সারারাত জানালা খোলা ছিল। আর আগের মত হাওয়া বইছে না যদিও। রোদে শুষে নিচ্ছে সব। এখন কৃত্রিম বাতাসে অনবরত শূন্য হয়ে যাচ্ছে মাথা। এই ঝড়ের মধ্যেও সে ক্রমাগত তুলো ভরে যাচ্ছে বালিশের খোলে।

—বাবু চা।

কে যেন জানালা দিয়ে দুইবার ডেকে গেল। শাণিত মাথা তুলল না। এখন আমার কিছুই ভাল লাগে নারে! আর পকেট হাতড়ায় খালি। বিড়ি দেশলাই কিছু নেই তবু খোঁজাখুজি করে—'অ', যে কথা বলছিলাম আমি—জগদীশ বা প্রবীর কেউই তরুণ সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় না। শুধুই শাসন করতে চায়। ওদের হাতিয়াব জার্ণালিজম পাশ সার্টিফিকেট। অন্যদের ওরা বলে কোয়াক্। ওদের জন্যে আমার করুণা হয় ! নিজের জন্যেও হয়! হাসে শাণিত। আমি তো করুণার সাগরেই ডুবে আছি। ভালবাসাও পেয়েছি অনেক। সমীর মনীষ মুনিয়া লিলি ওরা একসময় আমাকে খুবই ভালবাসত। এখনও বাসে হয়ত। সেদিন মনীষ এসেছিল— দাদা, একটা গদ্য লাগে।

—বলে কী ছেলেটা! শাণিত তার পিঠে আলতো চাটি মেরে বলেছিল— আমি কি আর ওসব পারি রে ! ফুরিয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে সব। তোরা বরং প্রবীর সারথিদের কাছে যা —

—বাজে বকবেন না তো শাণিতদা। লেখাটা আমার চাই। আমরা এবার একশ উনিশতম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে সুভেনির বের করব। পাড়ার ছেলেদের আমি কথা দিয়ে এসেছি—শাণিত সেনগুপ্তের লেখা এবার থাকছেই।

আর কথা বাড়ায় না শাণিত। ছেলেটার চোখে মুখে শ্রদ্ধার চেয়ে ভালবাসার দাবীই বেশি। এরপরও যদি না না করি—বিপদ আছে। তবে আমার দ্বারা কি আবার লেখালেখি করা সম্ভব হবে? মনে হয় না। ও বেটাই বা কী করতে প্রতিবছর একবার জন্মায় ! ১৮৬১ থেকে ১৯৮০ সাল, কয় বার হল ? শাণিত গুনেটুনে দেখল—একশ উনিশই। মনে মনে প্রণাম করল—ঠাকুর তো তুমিও। আমাকে রক্ষা করো মনীষের হাত থেকে।

একটু পরে আবার ড্রয়ার টান দিয়ে ক্লিপবোর্ড কলম তুলে নিয়ে ডেস্কে রাখল। সাইজ করে কাটা নিউজ প্রিন্টের পাতা ফরফর করে উড়ছিল ফ্যানের বাতাসে। বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে দ্রুত কয় লাইন লিখেই ধপাস করে পড়ে গেল ডেস্কের উপর। কাগজ কলম সব ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

—কী হল শাণিত দা! কী হল ? দৌড়ে এসেছিল লিলি। তারপরই সারা শব্দ সব বন্ধ। সে চুলে হাত দিতে গিয়েছিল—ঝট্কা দিয়ে সরিয়ে দিল শাণিত সেনগুপ্ত। তবু দাঁড়িয়ে থাকল সে।

আবার হাত ছোঁয়াল। আঙ্গুল চালাল। বিলি কাটতে যাবে এমন সময় অনেকগুলো জুতোর মচমচি শুনে— পা ঠেকল তার ক্লিপবোর্ডে, আরেকটু দূরে কলম দেখল। তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল যে কটা লাইন! পড়া শেষ করে আবার উচ্চারণ করে জোরে পড়তে লাগল—'একটি নদীর নাম নাকি সাইবেরিয়ার পাখি। মানুষের হাত ক্রমশ মায়ের দিকেই এগোচ্ছে— কথাটা কি ঠিক?'

লবঙ্গীর নেশা উৎরে যাচ্ছে ক্রমশ। বাইরের রোদ ভিতরেও চিড়বিড় শুরু করে দিয়েছে। ফ্যানের বাতাসে মাল কুলোচ্ছে না। রাস্তা, কলাপসেবল গেইট, করিডোর ভেঙ্গে ভেঙ্গে, একধাক্কা খেয়ে পুসডোর এখন বুক চাপড়াতে লাগল, যেন একঝড় তন্ময় এসে ঢুকল এই ঘরে। ঢুকেই শব্দ করে, সামনেই শাণিতের ডেস্ক—এখানেই রাখল ছাতি ব্যাগ ইত্যাদি। এখানেই শাণিতও হাত বালিশ করে শুয়ে আছে। তাকে এক ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল তন্ময়—শাণিতদা বলো--তুমিই বলো—

—কী ? কি বলব ? এতো জোরে ধাক্কা দিলি কেন ?

—আজ জুন মাসের কয় তারিখ বলো তো ?

—কয় তারিখ ?

—পাঁচ। আজও আমাদের বেতন হল না। আজ শালা ম্যানেজার উত্তমের একদিন না হয় আমার। বলেই যেন পুসডোরটার প্রতি মায়া হল এইবার, আস্তে আস্তে খোলে, কিন্তু খট্ খট্ করে চলে গেল।

শাণিত পর পর হাই তুলল দুইবার। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বকা দিল তন্ময়কে—দিন দুপুরেব চামচিকা ! তারপর এশ্‌ট্রে থেকে এক টুকরা চারমিনার নিয়ে টানটান করে। এইবার দেশলাই পাব কোথায় ? দেখে তন্ময়ের ব্যাগ থেকে ডায়রী উঁকি মারছে। তার ভিতরে ভাজ করে রাখা, অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে, কোন আর্টিকেল ফার্টিকেল হবে নিশ্চয়। শাণিত টান দিয়ে বের করে নিয়ে আসে, মেলে ধরে সূর্য গ্রহণের উপরে একটা রিপোর্ট। এঁকেবেকে পড়ে নিচ্ছিল দ্রুত। পয়েন্টগুলো শুধু। তারপর ভাঁজ করে রেখে দেয় জায়গামত।আর তো কিছু করার নেই আমার। সুতরাং আবার ডেস্কে হাতবালিশ রাখে। তার উপর মাথা। একটু এদিক সেদিক করে মেরুদণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শুয়ে থাকে।

সত্যি একটা গ্রহণ গেল বটে। ১৯৮০ সালে এটিও একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। অনেকদিন আগে থেকেই চলছিল সতর্কবাণী। ভুলেও যেন কেউ খালি চোখে সূর্যের দিকে না তাকায় তখন। অপটিকস কিং-এ কালো চশমা বিক্রির ধুম পড়ে গিয়েছিল। হাতে হাতে কালো কাঁচের টুকরো, এক্সরে ফিল্মের ছড়াছড়ি। তবে তন্ময় যে লিখেছে সূর্যগ্রহণটি আরো স্মরণীয় হয়ে থাকবে আগরতলায়,কারণ সেদিন উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা জয়সিংহের মিটিং ছিল একজন শীর্ষস্থানীয় বামপন্থী নেতার সঙ্গে। তাতে কি হয়েছে? গ্রহণের হেরফের হয়েছে কিছু ?

তন্ময় আবার শব্দ করে ঘরে ঢুকল । মাথা তুলল না শাণিত।

—কিরে মিলল কিছু ?

—বিকেলে দেবে বলল। আর শোনো ! সরি শাণিতদা, তখন আমি শুধু শুধু তোমার ঘুম ভেঙে দিয়েছিলাম।

—ও কিছু না। এখন কয়টা বাজে দেখতো ?

—কিন্তু তুমি আমি ছাড়া আর কই ?

— ওরা আসছে না কেন আজ !

—আসবে। তুই তোর কাজ করগে যা। আমাকে ঘুমোতে দে। লবঙ্গী বিনা দিবসরজনী বিষাদময়। লবঙ্গী বিনা ! ধূস্ শালা ! ঘুম আসছে না। শুকনো গলা জিহ্বা তালু। থুথু পর্যন্ত মাগ্‌না ছিটোতে চায়না বজ্জাতনী। পকেট হাতড়ে হাতড়ে কানা করে ফেলেছি কবে ! এখন ঝিম মেরে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তাহলে কি চিন্তা করছিলাম এতক্ষণ ! কিছু না।

ভাবছিলাম শুধু। তবে চিন্তার বিষয়ও আছে। জগদীশদার মত মক্কার এখনও আমাকে সহ্য করে চলেছে কেন ? আমি তো অচল হয়ে গেছি কবে ! তবু কেন আমাকে দিয়ে লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। মাসে মাসে টাকা হাতে তুলে দিচ্ছে উত্তম। ব্যতিক্রম হল এখন আর গুনে টাকা নেইনা আমি। সেও গুনেটুনে দেয় না। কোন লাভ নেই কারণ মাসের প্রথম দিকে পত্রিকা অপিসের গেইটে দাঁড়িয়ে থাকে লবঙ্গী। পুরুষালী হাতে সার্চ করে নিয়ে যায় সব।

অনেক দিন হয় বাড়ি যাই না। টাকা পয়সাও পাঠাই না কারণ আমার হাতে থাকে না কিছুই। ওদের জন্যে দুই মিনিট নিরবতা পালন করে শাণিত।

আরো কে কে যেন ঢুকল এই ঘরে। সমীরটাই ঘা ঘা করে বেশি। আরেকটা জলের ঘূর্ণী অনেকক্ষণ ধরে শাণিতকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঘূর্ণীটির শরীর, উর্দ্ধবাহুদ্বয় সবই জগদীশদার মত। স্বভাবতই ছিন্ন মস্তক এবং একটি গহ্বর থাকে ঘূর্ণীর জলে। তারমধ্যে আমাদের জুঁই, খানে খানে কী সুন্দর হয়েছে— সে আমি খবরই রাখি না। বানের জল ঘোলা ঘোলা, আর ডাঙায় খালি চাবুক মারার শব্দ হচ্ছে চতুর্দিকে। তারমধ্যে মা বাবার হাহাকার শোনাই যাচ্ছে না প্রায়। আর আমার একটা মস্তবড় মুখ এখন আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি, ঘর্মাক্ত, ঘূর্ণীটির ঠিক উপরে আকাশে স্থির। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হাত পা ছুড়ে ছুড়ে একেবারে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে জুঁই। তার মুখ নাড়া দেখে মনে হচ্ছে—দাদা দাদা চিৎকার করছে সে। কিন্তু জগদীশ তাকে পেছন থেকে কোমড় জড়িয়ে তুলে ধরেছিল। তারপর জলদেবতার মতই ডুবে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আমি কি করতে পারি ! আমার কি করার আছে ! আমি যে ভূত ! ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকি।

এবার সমীর মনীষ তন্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুনিয়া ঝাড়ুদারনীবও গলা। আর তো টেকা যাবে না মনে হচ্ছে। তাব সঙ্গে লিলি দিদিমণির গলা যুক্ত হলেই—ব্যাস্ ষোল কলা পূর্ণ হযে যাবে।

আমাদের পরিবারে মা যেমন অনিবার্য রমনী, তেমনি আবার যাবতীয় দুর্ঘটনার জন্যে দাযী এই ভদ্রমহিলা। আমি কতবার বলেছি—মা, আমাকে খুঁজতে তুমি পত্রিকা অফিসে এসো না । কিন্তু কে শোনে কার কথা ! ছিন্নমস্তা আসবেই । সঙ্গে নিয়ে আসবে জুঁইটাকে। এখানেই আমার আপত্তি। কোনদিনই আমার সাথে দেখা হয়নি ওদের। কিন্তু আমি শুনেছি—প্রতিদিনই জগদীশদা ওদের আদর যত্ন করেছেন বেশ।

এবার কৃষ্ণগুর্খার পায়েব শব্দটা টক্ করে আমার সামনে এসে থেমে গেল। তার সাথে আব কোন বিবাদ নাই আমার। —বাবু আপনার টেলিফোন। শাণিত মাথা না তুলেই বলল—তুমি যাও আমি আসছি। তারপর দেয়াল ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা বাজতে লাগল এক দুই করে। শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে।

উঠে দাঁড়াতেই, সাপের হিস হিস শুনতে পেল — শাণিতদার শরীরের অবস্থা কী হয়েছে—দেখো দেখো !

এসব নষ্টামিগুলোকে সোসিও পলিটিক্যাল ভাইসেস-ই মনে করে সে। হাড়পিত্তি জ্বলে তবু মুখভঙ্গী অবিকৃত রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। করিডোর, বস্ এর চেম্বার, টুলে কৃষ্ণগুর্খাকে দেখছি না। তাহলে জগদীশদাও রুমে নেই নিশ্চয়। কোথাও গেছে বেধ হয় ! ভেতর বাড়িতে খুব সম্ভব। এরকম সময় একবার চা খায় বাবু। সেকারিন দেয়া।

এবার দুহাতে পুসডোর ঠেলে ঢুকতে হবে বস্এর চেম্বারে। নাহলে ধাক্কা মারে ! এখন জগদীশদা চেয়ারে বসে নেই ঠিকই, কিন্তু ক্রমটন ফ্যান ঘুরছে তার মাথার উঁপরে। মিনি ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন ! টেবিলে টেলিফোন কাৎ করে রেখে কৃষ্ণগুর্খা কোথায় গেল ? অন্তত বসের সঙ্গে বা তার চেম্বারে কোন গলতি করে না কৃষ্ণ ! আজ কী হল ! মন খারাপ নাকি ? বা মানুষ মাত্রেই তো ভুল হয় ! ধারে কাছে খৈনী টৈনী কিনতে গেছে বোধ হয় ! শাণিত এখন টেবিলে উরু ছুঁইয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। রিসিভার তোলে—হ্যালো !

—বাব্‌বা; এতসময় লাগল ?

—কেগো ! শিখা !

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তোমার চাকরিটা পাকাপাকি ভাবে গেছে। এবার কি করবে ? এতদিনের মধ্যে অফারটা পর্যন্ত নিতে এলে না তুমি ! কেমন মানুষ ! আজকাল তোমার নামে অনেক কথাই শুনি ! বিশ্বাস করি না। বলো না প্লিজ কেমন আছো ?

—ভালো ।

শাণিত রিসিভার রেখে, ফ্যান অফ করে চেম্বারে থেকে বেরিয়ে এল । একইতো করিডোর, আগের মতই কেউ নেই। কিন্তু পায়ের শব্দ হচ্ছে দ্বিগুণ জোরে। সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই মনীষ জিজ্ঞেস করে—বস্‌ কি চেম্বারে ?

—না ।

শাণিত তার চেয়ারে বসে। সার্টের আরেকটা বোতাম খুলে। দুই হাতে কলার ঠেলে দেয় আরেকটু পেছনে। উপরে ফ্যানের দিকেও দেখল।

পাশেই সমীরেরা আবার ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিল। গ্রাম পাহাড় ছেড়ে মানুষ যে ভাবে দলে দলে চলে আসছে শহরে। আরেক দল আগরতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কলকাতায় !

কোথায় ? কেউ যাচ্ছে না তো ! —এমন জোরে একটা চাপড় বসিয়ে দিল শাণিত ডেস্কে ! সবাই থ। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল—কয়জন ত্রিপুরাবাসীর ক্ষমতা আছে যে পশ্চিমবঙ্গে জমি কিনবে ? কাপুরুষের দল—অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না ! এই হল উদ্বাস্তু মানসিকতা। ভাবতবর্ষের কোনখানে সাম্প্রদায়িকতা উগ্রপন্থা নেই বল ?

তন্ময় মনীষ তো প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল— তুমি ঠিক বলেছ শাণিতদা।

বেচারাবা চুপ। তাবপর দুইহাতের চেটো দিয়েই ঘাড় গলা মুখের ঘাম মুছে ফেলে। আবার অনন্ত মুদ্রায় ফিরে যায় শাণিত !

ছোটবেলায কাঁচের বয়ামই ছিল আমাদের এ্যাকুরিয়াম। অতো নামধামও জানতাম না আমরা। পানা পুকুর খালপাড় হেলেঞ্চার ঝোপজলে আমি আর জুঁই গামছা খেউ দিয়ে তুলে নিতাম দাড়কিনা আর ইঁচা মাছ। গুণে গুণে যত্ন করে রাখতাম বয়ামে। তাদের খেতে দিতাম মুড়ি আর মায়েব বকুনি। কিন্তু অসভ্যগুলি একটিও খেত না। একদিন জুঁই আমাকে বুঝিয়ে বলল—দাদা, তুই কি বোকা রে ! আস্ত মুড়ি কি খেতে পারবে ওরা ? ওত ছোট মুখ ! তবু কুতর্ক করি—নিশ্চয়ই পারবে। মুড়ি তো ভিজে গেলেই লোল লোল, ঠোকর দিলেই টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু জুঁই আমার কোন কথাই শুনতে চায়নি। জামার নিচে প্যান্টের প্যাচ থেকে বের করে নিয়ে আসে কাগজের মচা। তারপর জলের উপর থেকে কোলবালিশগুলো তুলে তুলে, আচ্ছা করে ঢেলে দিল মুড়ির গুড়া। তারপর তো আমরা বই খাতা নিয়ে সারাদিনের জন্যে চলে যেতাম স্কুলে। তবে ছুটির পরে সোজা বাড়ি, বয়াম, প্রায়শই দেখতাম মাছগুলি পেট মোটা মুড়ির মত ভাসছে জলের উপর। জুঁইতো কেঁদেই ফেলত।

ছোটবেলায় আমারও প্যাচপ্যাচি বাতিক ছিল। বিশেষ করে কুশিয়ারায় চান করতে যেতাম যখন। আমার পাঠশালার বন্ধুদের অনেকেই জমিদার বাড়ির রাইয়ত ছিল। শেখর অমিয় সুভাষ মিলে মাঝে মাঝে ওদের বারোয়ারি দীঘিতেও চান করতে গেছি। দাপাদাপি করলে কানমলা খেয়েছি। তারপরই চলে গেছি স্বাধীন কুশিয়ারায়। সেখানেই আমার জন্যে অপেক্ষায় থাকত দুঃখ। কারণ সুভাষ শেখরেরা নুলিয়াদের মত গামছার লেংটি পরে সাঁতার কাটত নদীতে। পীড়াপিড়ি করত আমাকে। কিন্তু আমি কখনও লেংটি পরতে পারিনি। বন্ধুদের সঙ্গে দুরত্বও সইত না। তাই পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাকি সুরে কাঁদতাম খালি।

সেই দৃশ্যগলি আবার ঘুরে ফিরে আসছে কেন বুঝতে পারল না সে। নদীর পাড়ে পলির মধ্যে

পা ডুবিয়ে রয়েছে। যে মাটিতে সোনা ফলে—শসা খিরা তরমুজ। আমি যদি তাদের একটি বীজ হই, আমার কেন অঙ্কুরোদগম হবে না ? অমিয় পি ডাব্লু ডির এস, ডি ও , সুভাষ ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়েছে। যদিও সেখানেই থেমে নেই ব্যাপারটা। এখন দুই হাতি গামছা পরে যে বালক চানের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরিধেয় ধরে টানাটানি করছে কেন ওরা ? এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকা ও শূয়োর মার্কা চিৎকার করছে সে — আমি লেংটি পরব না। কিছুতেই না।

তবু একসময় তাকে উলঙ্গ করে ফেলা হয়। এবং সে আবিষ্কার করে লজ্জা নিবারণের জন্যে এই দুটি হাত সত্যি অপর্যাপ্ত। এবং নিজেকে আবিষ্কার করে সে আর সেই ছোট্ট বালকটি নেই। শরীর জুড়ে লোমের ছড়াছড়ি ।একটি ব্যর্থ মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছি বৃত্তের মাঝখানে। নাগাসন্ন্যাসীদের মত ছাই ভস্ম মেখে নয়। চর্মরোগ বিহীন পূর্ণবয়স্ক একটি শরীর। শিক্ষায় সভ্যতায় সিটিয়ে যাচ্ছি। যদিও দর্শকেরা প্রত্যেকেই পরিচিত। লজ্জাও মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বাকি মুখগুলোকে আবিষ্কার করতে পারছিলাম না কিছুতেই। কারণ আমার চোখে জল। দুই হাত দিয়ে মুছে দেখব—তাতেও লজ্জা। এই অবস্থায় বাতাসই সহায়তা করল। আমি দেখলাম করিমগঞ্জে চিত্রবানী সিনেমা হলের সামনে টুনটুনওয়ালার মুখ। ছাত্রদের পাঠ্যবই কিনে কিনেই ঠোঙা বানাত মনীন্দ্রদা। বলত—এত জুয়া খেইল্যা না ভাই—ভাল না। তারপরই আমাকে শিলচর শহরে পাঠিয়ে দেয়া হল। সেখানেও জি সি কলেজে অধ্যয়নরত আমি শালা আমার মুখটাই দেখছি শুধু। পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেদিন আমার অন্নদাতাদের মুখ। আরেকজন ট্রাক ড্রাইভারকেও দেখতে পাচ্ছি —সারথি হয়ে যিনি আমাকে আগরতলায় নিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল এপয়েন্টমেন্ট লেটার আর একটি উদ্বাস্তু পরিবারের প্রাণ পাখি।

প্রত্যেকেরই চোখে মুখে এখন উদ্বেগ। ইয়ার্কি অবহেলা কেউ করছে না। তবু বাল্যবন্ধু অঞ্জন নির্মলের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সে একদৃষ্টে। ওরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনে। একদিন সে-ই ওদেরে বলত—নিজেকে বিকশিত করার মধ্যে কোন পাপ না থাকলেও, প্রতিষ্ঠার পেছনে ইঁদুর দৌড় অবশ্যই আদিমতা। এখন ওরা কি ভাবছে কে জানে ? শিব সত্য ও সুন্দরের প্লে-কার্ড হাতে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে এখন ওরা কী দেখছে —আন্দামানের মানুষ !

রঞ্জিত নন্দন রমন চয়ন পর্নই সবাইকেই এখন দেখতে পাচ্ছি। নেংটো থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি আমরা। পাপপুণ্য নিয়েছি ভাগাভাগি করে। বাবা তখনও বলত, এখনও বলে—ওদের মূল ঠিক আছে— তুই দেখে নিস্। তবে দেরী হয়ে যাবে ততদিনে। আর ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবি আমাদের সঙ্গে নিয়ে।

মূল ! মূল মানে কি গাছের শিকড় ? প্রকৃত সত্য ? জড়িবুটি ? মূল মানে কি সত্যের সন্ধানে যাত্রা ? বাবা কি অর্থে ব্যবহার করেছিল কথাটা ?

যাই হউক এখন আমি একটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। কারণ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে ডাইন পিটিয়ে মারা ওদের দ্বারা হবে না। ওরা প্রত্যেকেই অনেকগুলি সার্টিফিকেটের অধিকারী। সবাই বিচারক, জুরি বা খুব বেশি হলে দর্শকের আসনে বসে রয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজ। তাদের ফাঁকে ফাঁকে এখন বাচিত মিঞার বুড়ো আঙ্গুল খেলা দেখতে পাচ্ছি। ছোটদের নুনু ধরে একদিন যে সুখ পেত। কয়েকটি পোষা উদ্‌বিড়ালও ছিল তার।

তারপর আমার শিলচরের বন্ধুদের দেখলাম আরেকপাশে দাঁড়িয়ে। প্রেমিক প্রবরদের। বিমল শ্যামল বেনু মাধব মানিকেরা এখন আমার দিকে করুণ মুখ করে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকেই প্রেমে সার্থক। জীবনেও। না হলে প্রেমিকারা নিশ্চয়ই তাদের ছেড়ে চলে যেত। বাকি রইল শিলচর শহরের এষা। এই ভিড়ে তাকেই শুধু দেখছি না আমি। আমার প্রথম প্রেমিকা—যার কাছে চুমু ভিক্ষা চেয়েছিলাম।

শাণিত চোখ বন্ধ করে। থর থর করে কাঁপতে শুরু করে হঠাৎ। এই জনতার ভিড়ে যদি নকশালপন্থী উদাত্ত লোকেশও লুকিয়ে থাকে ? আমার ইয়ার মেইট। তাদের রিভলভারে সায়লেন্সার

লাগানো ছিল। আমার হাতে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার আর দুটি ঠিকানা দিয়ে বলেছিল— জায়গামত পৌছে দিস্। কিন্তু আমি দিতে পারিনি। এতগুলো টাকাইবা কোথায় পাব এখন!

—এই শাণিতদা, এসব হচ্ছেটা কি ? দিনের বেলায়ও বোবায় ধরে নাকি তোমাকে ?

শাণিত তাড়াতাড়ি লজ্জা নিবারণের ভঙ্গিতে দুই হাত রেখে উঠে দাঁড়ায়।

—ধুস্ শালা! দিবা স্বপ্ন!

—তখন কার টেলিফোন এসেছিল শাণিতদা।

—শিখার। এজি অফিস থেকে।

—কোই খাস্ বাত্?

—হ্যাঁ। সেই চাকরিটা ফাইনেলি গেছে।

ওরা মিনিটখানেক চুপ করে থেকে কথাবার্তা শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে। শাণিতও আবার ফিরে যেতে চাইল সেই ভিড়ে। কেন্দ্রবিন্দুতে একটি উলঙ্গ পুরুষ। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। তার পরনে ময়লা শার্ট পেন্ট আর একমুখ দাড়ি। চুল অবিন্যস্ত। দাঁতে হলদে আস্তরণ পড়েছে। মনে হয় অনেকদিন ধরে চান খাওয়া বাহ্যি পেচ্ছাপ বন্ধ।

—তুমিই বলো —তোমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে ?

শাণিত প্রথমে কোনো উত্তর দিতে চায়নি। তারপরও ওরা পীড়াপিড়ি করতে থাকলে সে বলল—রাজনীতি। মানুষের রক্তে রাজনীতি। সম্পর্কে রাজনীতি। গ্রাম শহরের রাজনীতি। দেশী বিদেশী রাজনীতি। ভাগাভাগিব রাজনীতি। দখলদারীর রাজনীতি। শ্রেণী বর্ণ ও ধর্ম্মের রাজনীতি। বিদ্যা উদারতা আর মানবাধিকারের রাজনীতিও আছে। আরো কতো কী! শিল্প সংস্কৃতিতে রাজনীতি।

শাণিতের হাই উঠল, দুইটা। দেখল দিন ঢলে যাচ্ছে। তন্ময় মনীষের হাতে আবার এখন উঠে এসেছে ব্যাগ, ছাতা। শুধু টিফিন বক্সটাই শূন্য। বাড়ি যেতে দেরী আছে অবশ্য। থানা, পাবলিসিটি অফিস হয়ে। যদি খবর টবর মিলে কিছু। তারপর ঘরসংসার, বাজার, বিশ্রাম। হাতে মাত্র ঘন্টা দেড়েক সময়। সন্ধ্যার আগেই আবার ঢুকে যেতে হয় পত্রিকা অফিসে।

ওরা চলে গেলে সমীর এগিয়ে এল, চেয়ার টেনে বসল শাণিতের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে এমন জোরে চিৎকার করে উঠল সে —তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়।

প্রায় তিন হাত ছিটকে গিয়ে পড়েছিল সমীর। আবার হাসতে হাসতে উঠে আসে—কী যে করো! শাণিতও হাসে। ইন দি মিন টাইম সমীর টিফিন বক্স খুলে দুইভাগে রাখল শাণিতের ডেস্কে। তেমন কিছু না। হলুদ মাখা কিছু ফোলা ফোলা চিড়া। কাটা সুপুরির মত চিড়ল দু'একটি আদা কুঁচি। কাঁচা লঙ্কাও দেখতে পাচ্ছি লম্বালম্বি দুই আধলা। সমীর বলল—তেজ পাতাও আছে নিচে। তবু এই খাবারটিকে আমি পোলাও বলতে রাজি না। এ নিয়ে মা আর দিদির সঙ্গে আমার প্রায়ই ঝগড়া হয়। যাই হউক এখন তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো শাণিতদা! কে না কে আবার এসে যাবে! তুমি বাটি ধরো, আমি ঢাকনায় নিয়ে নিচ্ছি।

—নারে সমীর! আজ উপোস দিচ্ছি। পেটটা ভাল না। তাছাড়া চিড়ে খেলেই এ্যাসিড হয় আমার।

—তাহলে আমিও আর খাচ্ছি না এখন। সময় নষ্ট করে লাভ নেই এখানে। বাড়ি গিয়ে খাব। তুমিও চলো শাণিতদা। সারা দিন পড়ে পড়ে কত ঝিমোবে!

আমার যে টেলিফোন আসার কথা! তুই যা আরেকদিন যাব।

—আর গেছ!

সমীর ঘট ঘট করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি আবার চলন্ত পাখার সঙ্গে সময় কাটাব। একই দৃশ্য বারবার। ইলেকট্রিসিটিও চলে যায় মাঝে মাঝে —

—এই যে স্নেহের সমীর শোনো!

—কি তাড়াতাড়ি বলো।

—দশটি টাকা।

একটু সময় চিন্তা করে সমীর বলল—আছে, কিন্তু দেব না। কারণ তুমি লবঙ্গীর কাছে যাবে। সেও তোমাকে দেবে না কারণ গত কিস্তির টাকা এখনও বাকি। সুতরাং সময় নষ্ট হচ্ছে—আমি চলি।

—ভাগ্ শালা!

—সায়োনারা!

এখন হাতের উপর আর মাথা রাখা যাবে না। রীতিমত ব্যাথা করছে। ঘরে কেউ নেই যখন চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে থাকবে। শাণিত দেখে—বিকেল হয়ে আসছে। চোখ বুজে চোখ খোলে, তেমন ফারাক নেই।

বালখিল্য। আমি কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব? এত অবিশ্বাস এত ঘৃণা! আমি কি অলরেডি পাগল হয়ে গেছি? নিজের হতেই চিমটি কাটে শাণিত। চোখে জল এসে যায় এমন। জীবনের আরেক নাম যুদ্ধ। যেখানে জয় পরাজয় উত্থান পতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমি কি এককোষী প্রাণী— আকাশ থেকে পড়েছি? আমি কি জানি না —পরাধীনতা, দেশভাগের মত ঘটনা ঘটতেই থাকে। কেউ থাকে উদ্বাস্তু শিবিরে। কেউ কেউ লাথি উষ্টা খেয়েও পড়ে থাকে আত্মীয় স্বজনের মাঝে। গঙ্গাজল আর মুখে আগুনের আশা ভরসা। জন্ম মুহূর্তে সে রাজা আমি ফকির—এর মধ্যে নতুনত্ব কি! শুধু কিছু ধন্দ খেলা করে আজীবন। ইচ্ছে করলে আমিও নাকি রাজা হয়ে যেতে পারি! শাণিত হেসে ফেলে। তাহলে চাণক্যবাবু এদেশে জন্মেছিলেন কি করতে? ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আছে কেন? আমাদের ইউনিয়ন এসোসিয়েশন? ননীদা অশীনদাদের মত নেতা! তার চেয়েও বড় কথা রাজনৈতিক দলগুলি কেন আছে? ইমারজেন্সি দিয়ে টুটি টিপে রাখা যায় না বেশিদিন। আমার মত কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে টারমিনেশন নোটিস দেয়া যেতে পারে শুধু। এরচে' বেশি কিছু নয়। তোমাকে জনতার কাছে যেতেই হবে। তাদের ক্ষোভগুলিকে একত্রিত করে সংগ্রামের কথা বলতেই হবে। মার্কসীয় বিজ্ঞানের কথা। পন্থা হিসেবে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা। যেমন এখন ওরা ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করছে। তাদেরই একজন নেতা পঙ্কজ তলাপাত্র—রোজ আমাকে টেনে নিয়ে যায় সমকামে।

ঘেমে উঠে। শিউরে ওঠে শাণিত। তখন তন্ময়ের চেয়েও জোরে এক ধাক্কা দিয়ে কে জাগিয়ে দিল আমাকে? রূঢ় বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এল। রীতিমত ক্ষুধা তৃষ্ণা ফিরে পেয়েছি। ইচ্ছে করলে বাহ্যি পেচ্ছাপও করতে পারি এখন। —কার এত সাহস? দেখি তিনি আর কেউ নন— জলজ্যান্ত রাক্ষস জগদীশ সিংহ আমার চেয়ারের দুই হাতল ধরে ঝুঁকে পড়ে আছে মুখের উপর! চোখ দুটি বিস্ফারিত —

—শাণিত ওঠো! মস্ত গন্ডগোল চলছে তো কামান চৌমুহনীতে! স্মাগলার আর পুলিশে গোলাগুলি। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই এখন। ক্যামেরাম্যানও বেরিয়ে গেছে। যেকোন স্টুডিও থেকে একজনকে ধরে নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি যাও! এই আইটেমটাকে কাল ক্যাপসান করতে হবে। রোজ রোজ বিচ্ছিন্নতা সাম্প্রদায়িকতা আর ভাল লাগছে না। যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে জানো তো! জনতাকে ডাইভার্ট করতে হবে—

হা করে তাকিয়ে থাকে শাণিত—এ কী শুনি আমি মন্থরার মুখে! ব্যাগটা টান দিয়ে এক দৌড়ে বেরিয়ে যায়। ওজনেই বুঝা যায় ডাইরী আছে, কিন্তু কলমে কালি কতটুকু আছে বলা মুশকিল। ব্যবহার করা হয়নি অনেকদিন।

আঠারো

শাণিত এখন রাণারের মত কাঁধে ব্যাগ ফেলে রেখে ছুটছে আর ভাবছে—আমি কি জগদীশের ছুঁড়ে মারা বল, নাকি খাঁচা খোলা পেয়ে পাখি ফুরুৎ করেছি বা এসব হয়ত কিছুই নয়—একটি ব্রেক ফেল গাড়ি ডাউন ধরেছি।

ঠাস ঠুস ধাক্কা খাচ্ছি গায়ে গায়ে। সবাই ছুটছে এখন। অন্য দিনের মত ছুটে চলা জীবন নয়। ভয়। সন্ত্রাস চোখে মুখে। তাহলে কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই গেল? যার আশংকা করা হচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে! আমাদের কাছে যতটা খবর আছে—কমলপুরের দিকে, মোহনপুর কামালঘাটের দিকেও গরম হাওয়া। পত্রিকা বিক্রি বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। জগদীশের মত লোক যেখানে ঘাবরে যাচ্ছে ব্যাপার নাজুক। বস্‌্রে ষ্ট্রিক্ট অর্ডার—আগামীকালের পত্রিকায় কোন সাম্প্রদায়িক উস্কানি উত্তেজনার খবর থাকবে না।

ছুটতে ছুটতে এখন শাণিত যতটা বুঝতে পারছে শুনতে পাচ্ছে বোমা পটকার শব্দ। দাঙ্গার আর্তনাদ অবশ্য একবারও শুনতে পায়নি। যার অর্থ স্মাগলার পুলিসে খন্ডযুদ্ধ এখনও চলছে। স্পিড বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। এবং যেদিক দিয়ে যাচ্ছে, তার বিপরীত দিক থেকেই বেশি মানুষ আসছে যেন টর্পেডো। আরো একটা কথা মনে হল—গরু ছাগল ভেড়া, যারাই সংঘবদ্ধভাবে চরে খায়, ওদের মধ্যে কিছু সংখ্যায় আঁতেলও থাকে। সারাক্ষণ ভারিক্কি চালে জাবর কাটে আর মির মির চোখে দেখে—সবই অনিত্য। এরকম কিছু লোকজনকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে দেখল শাণিত। যেন কিছুই হয়নি। এদেরই বেশি ঘৃণা করে সে।

কোন ফাঁকে যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেয়াল করেনি। বা যতটা খেয়াল করেছিল তারচে বেশি স্পিড সন্ধ্যার। রাস্তার আলো হয়ত অনেকক্ষণ জ্বলছে। মাঝে মাঝে অন্ধকার। আর ছুটে চলা মানুষের সাথে ছায়াগুলিকেও লক্ষ্য করছে শাণিত লম্বা বেঁটে। সাইকেল রিক্সার ক্রিং ক্রিং টেম্পো টেক্সির পেঁ পেঁ। কে বা কারা ডেকেও ওঠে— এই শাণিত! কিন্তু তার সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার দরকার নেই এখন। সে ছুটছে আর ভাবছে—বাল্যকালে এখানে ওখানে গন্ডগোল শুনলে আমরা ভাবতাম চোর ধরা পড়েছে! ডাকাত পিটিয়ে মারা হচ্ছে ইত্যাদি। তারপর পাড়া বেপাড়ায় গুন্ডার আবির্ভাব হলে মা পিসীরা বলত—ঘুমিয়ে থাকো বর্গী এসেছে। ওদের কাছে ছুরি চাকু জল ভাত। যখন তখন চলে! ষাটের দশকে এল সোডা বোতলের ফাটাফাটি শব্দ। কত লোক যে অন্ধ হল! প্রেমিকার শরীরে এসিড বাল্ব ছুঁড়ে মারার ঘটনাও তখন থেকেই। উন্নত শহরগুলির সঙ্গে আমাদের কোন তুলনা হয় না। আমরা দশ সাল পিছিয়ে আছি। আমাদের এখানে মাস্তানি শব্দটি সত্তরেরই ফসল। সব পাড়াতেই একজন দুইজন করে গজিয়ে উঠল। চাঁদার জুলুম মেয়েবাজি আর রাত বেরাতে বোম পটকা। মলটব ককটেল দিয়ে রাস্তা পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা—আরো কত কী! সেটি নকসাল পিরিয়ডও বটে। গ্রেনেড পিস্তল স্টেনগানের খেলা। অনেকদিন পর স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আবার টুকরা টুকরা শোনা গেল। তখনও দড়ি প্যাঁচিয়ে বোমা বানানো হত। পিস্তল চালানোর কথা আমরা অনেক শুনেছি। তবে সত্তরের মত এত ব্যাপক হারে নয়। এবং নকশালদের কথা বাদ দিলে, বাকি কমিউনিষ্টরা সরকার গড়ার আগে পর্যন্ত, তাদের হাতেও কিছু কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, তবু সাঁওতালি তীর ধনুকই বেশি চলত তাদের। আর এখন তো অস্ত্রের ছড়াছড়ি। শমীবৃক্ষে নকশালদের লুকিয়ে রাখা গান্ডিবের প্রয়োজন নেই এখন। কেবল জয়বাংলার যুদ্ধে যা এসেছে এখানে, তাতেই পাহাড়ে কন্দরে গ্রামেগঞ্জে, আগরতলা সহ অন্য সহরগুলিতেও মানুষ গোলাগুলিতেই মরছে বেশি। তদুপরি জয়সিংহ আছেন, দালাল আছি আমি আর আছে আমাদের পারাপারের সীমান্ত।

পালিয়ে যাব কোথায়? শুধু ত্রিপুরায় নয়। পুরো ভারতবর্ষেই দাঙ্গা চলছে এখন। জাতপাতের লড়াইকেও আমি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলি। আমাদের এদিকে একশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ আছেন

যারা আর আর সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে পর্যন্ত সম্বন্ধ গড়তে চান না। তাই অন্যরা রসিকতা করে ওদেরও 'সাম্পু' সম্বোধন করতে শুনেছি। সাম্প্রদায়িক।

হঠাৎ শাণিতের পিঠে যেন কোন এক পেত্নির হাত পড়তেই চমকে ছুটন্ত অবস্থাতেই সে পেছন ফিরে, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে। এক টুকরি কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে পড়লে যেমন ধ্বনি প্রতিধ্বনি হবে, শাণিত আশ্চর্য হয়—মৃত্যুভয়ে আগরতলার মানুষ যখন দিকবিদিক ছুটে পালাচ্ছে তখন আবার শীতের-সাপ জ্ঞানে রঙ্গব্যঙ্গ করতে পারে এরা কারা ? সন্ধ্যা হতে না হতেই যদি গ্রাহকেরাও পালিয়ে যায় তাহলে কী-ই বা করার আছে বৃষ্টি বাতাসীদের। ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে চিলড্রেন পার্ক থেকে রাস্তায় বেরিয়েছে। বেরিয়েই শাণিতকে পেয়েছে— দেখ দেখ ! আমাদের ছবিবাবু যায় !

কথা ঠিক। একবার শাণিত ওদের ইন্টারভিউ নিয়েছিল, ছবি তুলেছিল অনেকগুলি, দুষ্টুমিও করেছিল কিছু। কিন্তু কথা দিয়েছিল—একটা করে কপি সবাইকে দেবে ! এখন সবাই তাকে ঘিরে হাসাহাসি করছে—হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে গেল ! হাতের ব্যাগটাকে লক্ষ্য করল একটু দূরে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু ওদের মাঝে আবার পম্মী এল কিভাবে ? আমাদের সেই পম্মী দেববর্মা, তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে এখন। পাগলির শরীরে কাঁচা মাংসের বিটকে গন্ধ। দাঁতগুলি মাগ্নো ! সে ফিসফিস করে বলছে—তোরও নাই আমারও নাই—আয় আমরা বিয়া বই।

অবশেষে এক ধাক্কা দিয়ে পম্মী দেববর্মাকে রাস্তায় ফেলে দিল শাণিত—বাতাসীরা পর্যন্ত চুপ মেরে গেল। এই ফাঁকে রাস্তা থেকে ব্যাগ কুড়িয়ে শাণিত সেনগুপ্ত দিল ছুট। সোজা দুর্গাবাড়ির সামনে এসে থামল। তার বুকের বলটাও এখন পম্মীর মতই ছটফট করছে। কী শরীর ছিল পম্মীর ! যাকে দেখতে সারা আগরতলার মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ত ! এখন কি হয়েছে ! সুটা আম। আমারও একই পরিণতি কি ! আজই প্রথম শাণিতের মনে হল—আমি হয়ত আর বেশিদিন বাঁচব না। আমার মৃত্যুর কারণ তবে কি হতে পারে—ভাবতে থাকে শাণিত ! কোন কুল কিনারা পায় না। এক বার ভাবে ঘুমের মধ্যে বন্যা। মানে ৪৭ এর দেশ ভাগ। তখন আমার জন্মও হয়নি। শুনেছি উদ্বাস্তু কলোনি পালিয়ে স্থায়ী ভিটেমাটির খুঁজে মানুষের এই জীবন। বার বার পা পিছলে পড়ে যাই আমি। আমার মতে এই পুরো বৃত্তটি তৈরী হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে। একই এস্কেলেটারে চড়ে এখন আমি তার মুখোমুখি এসে পড়েছি। দুর্বার আকর্ষণ তার।

তাই একবার মায়ের মুখ মনে করতে লাগল, একবার বাবার। তারপর জুঁই আমাকে আর জড়ো করতে দিল না কিছুই। ছোটবেলায়ও তেমনি সে ছোট ছোট হাতে বড়দের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেই কথা বলতে চাইত। যেমন এখন এক দৌড়ে মা বাবার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তার দুষ্টুমিভরা হাসি।

আবার মৃত্যুচেতনা থেকে শুরু করে শাণিত। আবার প্লেনসেটে জড়ো করার চেষ্টা করে মা জুঁই বাবার মুখ। তারপর আরো একটু সময় নিয়ে স্থির জলে লালিমার মুখ মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুই পাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল দুষ্টরা। সামান্য নুড়ির ঢিল ছুড়ে তছনছ করে দিচ্ছিল সব।

শাণিতের দাঁড়াবার সময় নেই। সে ছুটছে তো ছুটছেই। এখন তার একটাই পরিচয়—জগদীশের দূত। যাচ্ছে স্মাগলার পুলিসে খন্ডযুদ্ধ কভার করতে। বারবার স্পিড বেড়ে যাচ্ছে তার। আর এই বাড়া কমা ব্যাপারটা নিজের উপর নির্ভর করে না বুঝা গেল। বুঝতে পারল না শুধু—কিছু না কিছু কথা সবসময় তার মনে আলোড়ন তুলে কেন ? আর যদি সারাদিনই কিছু কাটতে না পারে ইঁদুর, তাহলে তার দাঁতের যা অবস্থা হবে, আমারও তাই হবে মনে হয়। মৃত্যু।

—ভাল লাগে না হে ! অকাজ কুকাজ আর ভাল লাগে না। ভাতের জন্যে কাজ সবাই করে। আমিও করি। আত্মার মুক্তির জন্যেও কিছু করার কথা ভাবছিলাম একসময়। সভ্যতার কাজে যদি

আমার হাতে একটি ইটও তৈরী সম্ভব হয় ! সুন্দরতার জন্যে যদি শঙ্কর জাতীয় কোন ফুল নয়, অন্তত একটি পাতা থেকে একটু ধুলো বালি পরিষ্কার করতে পারি ! পারিনি ।

শাণিত সবই বুঝে । কিন্তু রাজনীতির প্যাঁচ খুলে বেড়িয়ে আসতে পারে না কোনভাবেই । আর রাজনীতির কথা উঠলেই কেবল কমিউনিষ্টদের পিন্ডি চটকায় কেন সে ? অন্য কোন দল তার চোখে পড়ে না নাকি !

একটা সিগারেট ধরাতে পারলে খুবই ভাল লাগত এখন । কিন্তু উপায় নেই । সে জগদীশের চাবি দেয়া পুতুল । তাকে ছুটতেই হবে । তবে এতদিন গদি আঁকড়ে পড়ে রইল যারা, তাদের সম্বন্ধে তার কোন কথা নেই—তা কি করে সম্ভব !

সম্ভব, শাণিত বিড় বিড় করে । ওদের বিরুদ্ধে আমি কি করে বলব ! যা বলার দিব্যেন্দুবাবু অতসীদেবীরাই বলেন । ভারতের স্বধীনতা আন্দোলনের শেষদিকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন ওদের । ত্যাগের কথাও এতটুকু মিথ্যে না । তারপর ক্ষমতার চোরাবালিতে ওরা প্রত্যেকেই ডুবে গিয়েছিল । অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে । আমি তো ওদের ছেলেপুলেদের শাসন শোষণ দেখেছি মাত্র । রাজার ছেলে রাজার নষ্টামি । তাই ওদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই । আমাদের মনে আশা জাগিয়ে ছিল ঐ কমিউনিষ্টরাই । মানুষের অধিকারের জন্যে কেবলি চিৎকার চ্যাচামেচি নয়, প্রকৃত সংগ্রাম একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । অনেকটা নদীর মত । অন্য কোন রূপে তাকে কল্পনাই করা যায় না । এবং তার কোন পরিণতিও নেই । সাগরে মিশে যাওয়া নদীকে আমরা বরং এইভাবে দেখতে পারি যে— প্রতিটা মানুষের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারিত করা গেছে । বিপ্লব বা সংগ্রামের এরচে বড় কোন লক্ষ্যই থাকতে পরে না । গেরিলাদের গোপন সরকার বা বেতার কেন্দ্র—ব্যাস্ ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত । কমিউনিষ্টরা আবার সরকার গড়বে কী ! প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই যাদের লড়াই !

তুলসীবতী স্কুলের সামনে এসেই তাকে থামতে হল ।—এতক্ষণ তার চারপাশে তাড়া খাওয়া মানুষ পাখি কুকুর-বিড়াল জিকজাক পালিয়ে যাচ্ছিল । দোকানপাট ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে আগেই । সময় এখন সন্ধ্যা সাতটার বেশি হবে মনে হয় । এখন জেকসন গেইট আর তুলসীবতীর মাঝখানে শুন্‌শান্ রাস্তায় দক্ষিণদিকে মুখ করে দাড়িয়ে থাকলে নাক বরাবর কামান চৌমুহনী দেখা যাচ্ছে । ওখানে আমার জানা আছে একটি ডাক্তারখানার ছাদে বেশ্যারা সন্ধ্যা কাটায় । আজ কি করছে কে জানে ! গোলাগুলির সময় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে হয় শুনেছি । কচ্ছপের মত পিঠ দেখা গেলেও বিপদ হতে পারে ।

সেভিনটি ওয়ানে যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চ কাটতে হয়েছিল আমাদের । এখনও গুলির শব্দ হচ্ছে থেমে থেমে । একটা ফটাসের প্রতিধ্বনি দুইটা ফটাস ফটাস । তবে জয় বাংলার যুদ্ধে আমরা কেবল শব্দ শুনিনি, সুরুৎ সুরুৎ আগুনের লুক্কাও দেখেছি । আর এখন কি সবই বডি লাইন ছুড়ছে ওরা বিজলি আলোয় ! ফাঁকে ফাঁকে দু একটি দোকানপাটও খোলা পড়ে রয়েছে । দূর থেকেই বুঝা যাচ্ছে জনমানব হীন পরিত্যক্ত । এবং হাটখোলা ঘর থেকেই বেশি বেশি আলো ফেটে বেরোচ্ছে এখন ।

এই মুহূর্তে কোথাও কিছু একটা নড়ে উঠতেই শাণিতও কেঁপে উঠল । তার মানে প্যাঁচা চামচিকা বা বাদুর নিশ্চয়ই আশপাশে ছিল । খুব সম্ভবত জেকসন গেইটে । ভ্রম হল যেন অন্ধকারে উড়ে যাওয়া অতিরিক্ত কালো আমি দেখেছি । গুলিটুলি এসে লাগেনি তো পাখির গায়ে । কথাটা মনে হতেই বোকার মত নীচের দিকে নিজের শরীরটা দেখে নিল শাণিত । আবার ছুটতে লাগল । যুদ্ধক্ষেত্রের দিকেই । নিয়তির টানে । হারেঙ্গাজাওয়ের পাখি যেভাবে জহরব্রত করে, ঠিক সেভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল সে লক্ষ্যে স্থির । আর ডানা ঝাপটাচ্ছে না একবারও । যে কোন সময় একঝাঁক গুলি এসে ঝাঁঝরা করে ফেলতে পারে । জায়গামত পড়লে একটা গুলিই যথেষ্ট । আমি তো মরেই আছি । আবার নূতন করে মরব কী ! বরং স্বর্গ প্রাপ্তির এইতো সুযোগ । শাণিত সেনগুপ্ত

একজন ট্রেডইউনিয়নিষ্ট ছিল। আন্দোলন করতে গিয়েই তার চাকরি চলে গিয়েছিল ইমারজেন্সির সময় । অন্যরা মুচলেখা দিয়ে আবার ফিরে পেলেও তিনি মাথা নুয়াতে চাননি। শাণিত একজন সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন । নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পর্যন্ত পিছ-পা হননি । তিনি ত্রিপুরার একজন গল্পকারও বটে ।

শাণিত ভাবে—বেশ কিছুদিন ধরে আমার নামটা আত্মীয় বন্ধুরা ভুলেই যাচ্ছিল প্রায় । আবার জানান দেয়ার সময় এসেছে । শাণিতও হাসে—আজান দিতে হবে নাকি ! আসলে আমি তো জলোচ্ছাস নই—কেনই বা মনে রাখবে ! বদ্ধ পুকুরের সর পরা জল নিথর নিশ্চল । শীতকালে স্তর আরো নিচে নেমে গেলেই হুতাস উঠে । আমার প্রতি ঘৃণাও বিস্মৃতির কারণ মনে করে শাণিত । কারণ আমি প্রতিপালক হতে পারিনি । আমার বুড়ো মা বাবা ডাগর বোনটা এখন কি করছে !

সেই শাণিত্যাই কিনা এখন আবার স্মাগলার পুলিসে খন্ডযুদ্ধ কভার করতে যাবে ! ছুটছে শাণিত । মৃত্যু উপত্যকার দিকে ছুটে যাচ্ছে । যেন বাসুকী উল্টোশ্বাসে টেনে নিচ্ছে তাকে গন্তব্যে । কে আছ বাঁচাবে আমাকে ! ঠিক পুঁথিঘরের সামনে এসেই একটা টাল খেয়ে থেমে গেল সে । আমি না দুঁদে সাংবাদিক ! প্রবীর দত্তের মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে গিয়েছিলাম পত্রিকা অপিসে ! আর এখন আমিই কিনা আত্মহত্যা করতে চলেছি হারমানা মানুষ !

এই প্রথম শাণিত একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারপর আত্মগ্লানিতে ভুগতে লাগল । তার হতাশাগ্রস্ত চোখে আস্তে আস্তে সতর্ক চঞ্চলতা ফুটে ওঠতে লাগল । আবার ভাবল একটা সিগারেট ! কিন্তু রাতের যুদ্ধক্ষেত্রে একটি দেশলাই কাঠির আগুনও কত ভয়ঙ্কর হতে পারে শাণিত জানে । সে একটা থামের আড়াল থেকে আরেকটা থামের আড়ালে বিদ্যুৎ বেগে গেল গিয়ে । তারপর লম্বা লম্বা শ্বাস ছাড়ল আরাম করে ।

আমাদের মটরস্টেন্ড কামান চৌমুহনীতে এলে প্রথমেই মনে পড়বে রাজন্য ত্রিপুরার কথা । আগরতলার দোকানপাটগুলি পর্যন্ত কত সুন্দর করে বানিয়েছিলেন রাজ আমলের মানুষ । এখনও সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে স্মৃতি সত্তা । তাদের বারান্দাগুলি কত প্রসস্ত । অসংখ্য থাম দেখে মনে হবে যেন গ্রীক নগরীর মধ্যে ছুটে এসেছি । স্পার্টাকাস । এখানে রতনমনি রিয়াং নামে পরিচিত।

সেই ফাটুস ফুটুস শব্দেই আবার সম্বিৎ ফিরে পেল শাণিত সেনগুপ্ত । ঝোলা ব্যাগের উপর দিয়ে টের পেল ডাইরী কলম । কিন্তু জগদীশদার কথামত কোন ফটোগ্রাফার নিয়ে আসা যায়নি । যা করার আমিই করব । অদ্ভুৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল তার মধ্যে । এখন আর আত্মহত্যামূলক ছুটাছুটি কবছে না । বরং গেরিলা এমবুসের মতই বারান্দার এক থাম থেকে আরেক থামে, যেন বেয়নেট তাক্ করে ছুটে যাচ্ছে । কিছুদূর যাওয়ার পর তার মনে হল—পরিকল্পনাহীনভাবে কতদূর যাওয়া ? এখান থেকে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে সব । তবু ষোল আনা যুদ্ধক্ষেত্র তো নয়, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে ।

এমন সময় তার হাত ধরে হেচকা টান মারল কে ? বাঁহাতটা ভেঙেই গেছে মনে হয় ! —শুয়ে পড়ুন ভাই শুয়ে পড়ুন ! ওরা রিট্রিট করবে এখন । এ সময়টাই বেশি খারাপ । প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ব্রাশ করতে করতে পিছিয়ে যাবে ।

ততক্ষণে বারান্দায় শুয়ে পড়েছে শাণিত—আবু ভাই দেখি !

—হ দাদা । প্রাণ বাঁচাই ।

আবু সাহা একজন শিক্ষিত বেকার । রেজাল্টও ভাল করেছিল । কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এসে নিয়ম করল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কিছু পরীক্ষা ছাড়া চাকুরিক্ষেত্রে এরাজ্যে আর কোন প্রতিযোগিতা চলবে না । এখন থেকে যোগ্যতা মান বলতে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাই কেবল বোঝাবে । মাঝরা এখানেই । চূড়ান্ত দলবাজি আর স্বজন পোষনের বিধিবদ্ধ উপায় । সঙ্গে লেবেলিং -এর কাজ ও শুরু হয়ে গেল—দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি ইত্যাদি । কী আর করা যাবে ! আবু সাহা একটি ছোট টেবিল নিয়ে পান বিড়ি সিগারেটের দোকান দিল কামান

চৌমুহনীতে। মজজিদ পট্টির কোণায়। ডিম দোকানের লাগুয়া। একবার শুনলাম স্মাগলারদের ইনফরমার সে। আরেকবার শুনলাম পুলিশের হয়ে কাজ করছে আবু। দু-একবার আমাকেও তোলা দিতে হয়েছে তার কারণ একসময় সে বিস্কুটের ব্যবসা করত। পারাপার।

আবার আবু শাণিতের মাথা চেপে ধরল।

—কিছুতেই তুলবেন না।

—আহা—লাগছে তো!

—স্যরি স্যার।

—এবার পরিষ্কার করে বলুন—এতক্ষণ কি দেখলেন?

—নুতন আর কি দেখব! এতো রোজকার ঘটনা। শান্তিপাড়ায় লোডিং হচ্ছিল চার পাঁচটা ট্রাকে। রোজই হয়। সারাদিন ধরে হয়। কাপড় চোপড়, অষুধপত্র এককথায় সব জিনিষই বাংলাদেশে যায়। আর আঙুল চুষি আমরা। বাকি যা ছিটেফোটা পড়ে থাকে তাও মজুতদারের কৃপায় ব্ল্যাকে কিনতে হয়। সবই তো জানেন! সরকারও জানে, পুলিশও জানে। বোঝাপড়ার কোন অভাব নেই আমাদের মধ্যে। মাসোহারা নিয়েও পুলিশের সঙ্গে মাঝে মাঝে গড়মিল হয়। যেমন ধরুণ—ইনফরমার এসে বলে গেল— আজ হাফানিয়া বর্ডারে চৌকি বসবে না। কিন্তু দেখা গেল বসেছে—নড়সিংগড় সীমান্ত খোলা। মাঝে মাঝে এমন ভুলভালও হয়। আশ্বাসও দেওয়া হয়--নেকস্ট টাইম-লস্ পুষিয়ে দেয়া হবে। উপরতলার নির্দেশে স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা—পুলিশের সঙ্গে নুতন করে গন্ডগোলের কারণ কি হতে পারে? ব্যাটারা নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হারে মাসোহারা চেয়েছিল! স্মাগলাররা গররাজি। বাবাজিরা এবার ঠেলা সামলাও!

—জখম হয়েছে নাকি কেউ?

—হাঁ। সাবইন্সপেক্টার নিরঞ্জন বৈদ্য। মাইনর ইনজুরি অবশ্য। বাঁপায়ের বল ছুয়ে গেছে গুল্লি।

—এরেষ্ট ফেরেষ্টও হয়েছে নাকি?

—পুলিশ এসেই যে দোকানগুলি থেকে লোডিং হচ্ছিল তাদের মালিক কর্মচারীদের তুলে নিয়ে গেছে ভ্যানে। শালারা আমার দোকানের দিকেও এগিয়ে আসছিল দেখে আমি পালিয়েছি। অন্যকোন কারণ নেই। তখনও তেমন কিছু গন্ডগোল বাধেনি। কিন্তু যেই একটা অসুধের দোকান থেকে তোফাইল আহমদ নামে একজনকে ধরে নিয়ে এল পুলিশ, অমনি শুরু হলে গেল গোলাগুলি। ওরাও যে কতটা তৈরী হয়ে আসে তার প্রমাণ পাওয়া গেল আজ। গ্যাং-লিডার তোফাইলকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল পুলিশের হাত থেকে। শুধু তাই কী! এত এত সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ওরা —কত ক্ষমতা! আর যদি বলেন কয় রাউন্ড গুলি ছুড়া হয়েছে ইতিমধ্যে -আমি বলতে পারব না! প্রকৃতপক্ষে আপনাকে দেখার আগে পর্যন্ত ঢোক গিলিনি, হুস ছিল না।

আচ্ছা আচ্ছা এবার বিশ্রাম করুন। শাণিত ভাবে—সত্যি, একটি আর্তনাদ বা একজোড়া বুটের শব্দ কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না। মগজ জোড়া শুধু সন্ত্রস্ত শূন্যতা, মাঝে মাঝে গুলির শব্দ যেন বুড়বুড়ি। এবার কী হবে? একটু সময় চুপচাপ থেকে শাণিত আবার তার শিয়রের দিকে আশপাশ হাতড়াতে লাগল। আমার ব্যাগটা গেল কৈ? নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে —তার না, আবু সাহার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। —ভাই দেন না একটু, আমার ডাইরী আর কলমটা। উঠতে হবে না। পা দিয়ে ঠেলে দিন। সরীসৃপ হয়ে গেল আবু সাহা। লেজ দিয়ে একটা ধাক্কা দিল। ডাইরী লিখতে হবে। বারান্দার নিজস্ব কোন আলো নেই এখন। রাস্তার আলোই ছিটকে ছিটকে এসে আলোকিত করেছে। কিন্তু এতক্ষণ যে চূণসুরকি ঝুরঝুর করে পড়ছে থামের মাথা থেকে, যে থামটাকে আড়াল করে শুয়ে আছে ওরা, চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঢুকে যাচ্ছে, গুলির আঘাত থেকেও এমন হতে পারে। শাণিত লিখল সাবইন্সপেকটর নিরঞ্জন বৈদ্যের নাম। কোন্ নিরঞ্জন বৈদ্য? জুইয়ের পেছনে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করত—সে কি? অভয়নগর বাড়ি।

— আবু ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন ? গোলাগুলির শব্দ কি সেন্ট্রাল রোড হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ?

—আগেই তো বলেছি—ওদের ভাগতে হবে। না হলে পুলিশের বেড়াজালে ধরা পড়তে হবে।

—একবার আমিও পড়েছিলাম।

—কিভাবে কোথায় ?

সঙ্গে সঙ্গে কথা গিলে ফেলে শাণিত। বলে—চিলড্রেনস্ পার্কে। পুলিশ নয়, একদল উঠতি মস্তানের বেড়াজালে পড়ে বেধড়ক মার খেয়েছিলাম। শুনে আবু সাহা এমনভাবে হা হা হিহি করে উঠল যেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

আর শাণিত মনে করার চেষ্টা করছে উগ্রপন্থী নেতা জয়সিংহকে ফার্স্ট এসাইনমেন্টের মাল সাপ্লাই করেছিলাম কিভাবে ? ধোকা খা গয়া থা পুরা নরসিংগড় চৌকি। কিউ কি ম্যায় উ'হা গয়া থা 'উইথ্ এ স্পেসিফিক ইনফরমেশন অফ স্মাগলিং' আমার খবর পেয়েই ওরা হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল অনুপ্রবেশকারীদের। এবং এই কর্মকান্ড যখন চলছে কাছাকাছি আবেকটি পয়েন্ট থেকে শাণিত সেনগুপ্তের মাল পৌঁছে গিয়েছিল জয়সিংহের কাছে। মামলা ফতে।

তবে এই মুহূর্তে নিরবতা ভাঙল একটি কুকুর। তারপর অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। যদিও কোন শালা মুখ দেখাচ্ছে না। সব ব্যাটাই একেকটা শাণিত সেনগুপ্ত। আবারো মনে হল কিছু হারিয়েছি। সে পাশ ফিরেই দেখল আবু অদৃশ্য। কাছে পিঠে কোথাও নেই। ঠিক যে জায়গায় গোলাগুলি, অর্থাৎ কামান চৌমুহনীর কামান ঘিরে এই গোল চক্কব, তার পূবে পশ্চিমে দুইদল যুদ্ধ করে মরছে। সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। কই-রে আমাব আবু সাহা ? শাণিত হাসে। আরেকটা কথা —যতক্ষণইবা তাকিয়ে রয়েছি, একটি গুলির শব্দও তো কানে এল না !

শাণিত লাফ মেরে উঠে বসল। এখনও থামের আড়ালেই আছে। ঝুরঝুর চূণসুরকি পড়ে চেহারা বদলে গেছে তার। যদিও শাণিতের চেহারা আর কতটা বদলেছে, পরিবেশ বদলে গেছে তারচে অনেক বেশি। সামনের দৃশ্যপটের দিকে দেখতেই চোখদুটি চরকগাছ হয়ে গেল। সে দেখল তার মতই এখন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাড়িয়েছে অজস্র মানুষ। বিচিত্র মানুষ। জন্মমৃত্যুর মাঝখানে মানুষের এমন ঝোপ ঝাড়।

অবসাদ। শাণিত আরেকটু সময় চুপচাপ বসে থাকল। আর্যুবেদীয় ডাক্তারখানার বারান্দায় বসে, নিচের সিড়িতে পা, চূণসুরকি বৃষ্টিপাতের মধ্যেও সে থামে ঠেস দিয়ে বসেই থাকল।

হঠাৎ একটা ঢেকুর উঠে সারাটা মুখ তিতায় ভরে গেল তার। হঠাৎ আবার কী। কতক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি। পিত্ত উঠেছে। সঙ্গে মাথায় চড়েছে ডাইরীর পাতা। একটু আগে নোট করে রাখা পয়েন্টগুলো। নিরঞ্জন বৈদ্য, তোফাইল আহমদেরা।

কথাটা শেষ করতে পারল না। আবারো কেঁপে উঠল। এরই মধ্যে একদল লোক মাইকিং-এ বেরিয়ে পড়েছে। 'বন্ধুগন, পুলিসি দুর্নীতি— চোরাকারবারি সমাজবিরোধীদের দৌরাত্য ও প্রশাসনিক অযোগ্যতার প্রতিবাদে আগামিকাল আগরতলা বন্ধের ডাক দেয়া হয়েছে। আপনাদের একান্ত সহযোগীতা কামনা করি। আপনারা জানেন ! গোটা ত্রিপুরা-রাজ্যই আজ সাম্প্রদায়িক উস্কানির কবলে। এই বিস্ফোরণোন্মুখ ত্রিপুরাকে বাঁচাতে সবাই আমাদের হাতে হাত রাখুন। গণতন্ত্র জিন্দাবাদ। ক্যাডার-রাজ নিপাত যাক্।'

যা বাবা যা। অনেক শুনেছি। আরো বেশি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। আসলে তো অবসাদ। লাস্ট ভাতের থাল মনে করার চেষ্টা করে। পেট ভরে খাইনা কতদিন ! আর ইদানিং রাস্তা ঘাটে হাঁটলেই লঙ্কাপোড়া গন্ধ পাই আমি। আগে পাঁচ ফোরনের গন্ধ পেতাম। আজকাল নাকটাই বেশি খাই খাই করে। আর সিঁদলনাড়ার গন্ধ পেলে চিরদিনই আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। সে যেখানেই হউক। যারই

রান্না ঘরের পাশে হউক। ধোয়াটে কড়াই থেকে ঘ্রাণ শুষে নিতে থাকি।

অভুক্ত ! সত্যি লজ্জা সরমের কোন বালাই নেই। আর এখন তো শরীরেই ধারণ করি না এসব। যাবতীয় কথাবার্তাই চলছিল তার ঘুমের মধ্যে। হঠাৎ ফায়ার ব্রিগেডের শব্দ শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠল। সত্যি তো তেনা পোড়া গন্ধ করছে। তখন আবু সাহাও কথাটা বলেছিল। আস্তে আস্তে যেন কুয়াশায় ছেয়ে যাচ্ছে পুরো কামান চৌমুহনী। চোখ জ্বালা করছে। পাগলা ঘন্টা বেজে চলেছে তবে ওখানে গিয়ে আমি কি করব ? আমি বরং ঘুমাই। চোখের জলে আবার অগ্নি সাক্ষাৎ করল সে। খানে খানে অন্ধকার পোড়া আগুন। তেনা পোড়া ধিকি ধিকি জ্বলছে।

আসলে কি হয়েছিল ! হয়ত যে লরীগুলোতে কাপড় চোপড় বোঝাই করা হচ্ছিল, ফাঁদে পড়ে গিয়ে তাতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল চোরাকারবারিরা। শেষে পুলিশ এসে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে সব। এখন যদিও নির্বাপিত প্রায়। কিন্তু ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে একাকার। আর তুমি চোখ বুজে থাকলেই বা কি হবে ?

ধোঁয়া চোখের পাতায় বসে পোড়াবে। তার মধ্যে বাতাস লেগে লেগে ভালই লাগছে এখন। জ্বালায় পোড়ায় আবার মলম লাগায়। কিন্তু বারবার ঘুম এসে যাচ্ছে কেন ? তবে কি অনন্ত ঘুমের দিকে যাত্রা শুরু হয়ে গেল আমার। এবং ত্রিপুরার। যদিও মুখপাত্ররা বারবার বলে যাচ্ছেন—দাদা, বুঝতে পারতাছেন না কেন ! দুই পয়সা রেভিনিউ নাই রাজ্যের। নাই-রাস্তাঘাট, চাষ আবাদ, নাই কলকারখানা। হতে গোনা মাষ্টারি চাকরি দিয়া খাইব কয়জনে। ফলে পারাপারের উপরেই বাইচ্যা আছে যারা, লোকসংখ্যা খুব কম আইত না স্যার, চাকরি বাকরি থাইক্যা কয়েকগুন বেশিই অইব, তাদের ভাত মাইরা আপনার আমার লাভ কিতা কন !

ঘুমের মধ্যেই এবার শাণিত দেখল—সমীর আসছে হন্তদন্ত হয়ে। এসেই থমকে দাঁড়িয়ে বইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে করে ধাক্কাও দিল তার কাঁধে। শাণিতের হুস নেই। তার পাশেই সিঁড়িতে বসে সমীব বিড়ি ধরাল একটা, ধোঁয়া ছাড়ল ছাড়া ছাড়া ভাবে—

—এই শাণিতদা শুনছ !

—কি বল।

—ভাবছ কি ?

—এজি অপিসের চাকরিটার কথা। ফাইনেলি গেছে।

—ক্ষিদে পায়নি তোমার ?

--ভীষণ।

—যাবে আমাদের বাড়ি ? কাছেই তো।

—চল যাই —

উনিশ

মসজিদ পট্টির ভেতর দিয়ে না গিয়ে, ঘোষপট্টি হয়েও সমীরদের বাড়িতে যাওয়া যায়। মটরস্ট্যান্ড আর কামান চৌমুহনীর ঠিক মাঝামাঝি শান্তিপাড়া। বড় রাস্তা থেকে পেট কেটে ঢুকে গিয়েছে ভেতরে। সেখানে দীঘি। যার পুবপাড়ে প্রতি বছরই দুর্গাপূজা হয়। তবে জায়গাটা খুব ঘিঞ্জি। একের মাথায় আরেক। মধ্যবিত্ত মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। আসলে শান্তিপাড়াকে ঘিরে রেখেছে মটরস্ট্যান্ড গোলবাজার কামান চৌমুহনী। সবই বিজনেস সেন্টার। গোলাকৃতি এই অঞ্চলে যত দোকানপাট আছে তাদের প্রত্যেকেরই পেছন দিকে আরেকটা দুয়ার। যার নাম শান্তিপাড়া। এখানে ব্যবসায়ীরা যেমন আঁটোসাটো হয়ে থাকেন, ছড়িয়ে থাকার কোন উপায় নেই আবার এই দোকান ঘরগুলিতেই যারা মাল ওঠায় নামায়, লম্বা ঘরবস্তি করে রয়েছে খাস জমিতে। কুলিবস্তি। ওদেরই তৈরী ছোট্ট একটি ছাপড়ায় থাকে সমীরেরা। বলে —দাদা, এটি আমার আবিষ্কারও বলতে পারেন। ওরা যেহেতু ছাপড়া জেলার মানুষ, তাই ওদের তৈরী ঘর মানে ছাপড়া শব্দটিও তাহলে বিহার থেকেই এসেছে—কী বলেন!

শাণিত হেসে ফেলে। ওরা একটি গলিস্য গলি ধরে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। দুইপাশ থেকেই টাট্টিবেড়া বেশ্যা পল্লীর মত গায়ে পড়ে অনবরত খোঁচা মারছে এখন। খাট্টা পায়খানার জমা রসকষ চটচট করছে। চেনা গোবরও আছে রাস্তায়। মাছের পাতি মাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। আরেকটু এগিয়ে সমীর বলল—ঐ তো আপনার ঠিক ডান পাশে। শাণিত পেছন ফিরে পুরো রাস্তাটা যতটা দেখা যায়, আবার দেখল— কোন ল্যাম্পপোষ্ট নেই। তবে বাড়িঘরের টুকরা টাকরা আলো এসে বিভ্রান্ত করে, পথও দেখায়।

—এখানে সবই হুক লাইন।

তার এই মন্তব্যটির কতটা প্রয়োজন আছে বুঝতে পারল না শাণিত। ইতস্তত কবতে লাগল। সমীর আবাব বলল—দাদা, আমরা দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হয়েছি, কথাটা মনে রাখবেন!

তারপরও শাণিতকে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল কত সময়। ব্যাপার কিছু না। কতকগুলো পরিচিত শব্দ তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না এখন। এক মুহূর্ত শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। আবার এক সঙ্গে অনেকগুলি শ্বাস পড়ার শব্দ। মুখ্যত ফরফর শব্দ শুনেই শাণিত দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কম করেও তিন-পিট তাস একত্রে সাফল করার শব্দ। এই শব্দে এখনও তার মধ্যে যেন যৌন উত্তেজনার মতই কিছু একটা হয়। আবার খেলায় হেরে গেলে তীব্র ঘৃণাও জন্মাত। তখন তো তাস খেলার জন্যে কুশিয়ারা নদী সাঁতারে পার হয়ে গেছি আমরা জকিগঞ্জে। সেখানেও আমাদের একটা টিম ছিল। কেউ বিশ্বাস করলে কর না করলে নাই। ক্ষিরাক্ষেতে আনসারদের সঙ্গে রমনা খেতে খেতে তাস খেলা। একস্ট্রা থ্রিল।

প্রথমে সমীর ঢুকল। ঢুকেই লেকচার—এই হল ত্রিপুরার যুবসমাজ! শাণিতও ঢুকে দেখল—সাত আটটি ছেলে গোল হয়ে বসে রয়েছে ঠিকই তবে এদের মুখে এত ভাঙচুর কেন? রীতিমত সন্ত্রস্ত হল সে। তিনটে আদিবাসী যুবককেও দেখল, স্বভাবে ভীষণ একরোখা হবে।

—এরা প্রত্যেকেই আমার বন্ধু। প্রত্যেকেই প্রতিক্রিয়াশীল বিপথগামী দক্ষিণপন্থী বা অতিবাম।

এরা শিক্ষিত বেকার হলেও কোনদিনই চাকরি বাকরি পাবে না—এটা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে তাদের। তবে দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে মনে করার কোন কারণ নেই। এখনও দল বদল করলে কিছু একটা হতে পারে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে এরা কোনদিনই কোন দল করেনি। কোন দল করবে বলুন? ফলে বদল করারও কিছু নেই তাদের। তাছাড়া একদল লোক চিরদিনই ঘাড়কাটা স্বভাবের থাকে। ভাঙবে তবু মচকাবে না। এখন ওরা চোরাকারবারিদের মদতদার। সমাজ বিরোধী। রাত পোহাবার আগেই রোজগার সেরে ফেলে। বাদবাকি সময় খায়

দায় জুয়া খেলে। মাঝে মাঝে জেল খেটে আসে যখন, আমরা উৎসব করি।

আরো শাণিত সেনগুপ্ত আছে দেখি! যেই যেই নাচতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু সে কিছুই না করে ঝপ করে বসে পড়ল তাদের মাঝখানে। সমীরকে মিষ্টি করে ডাকল—সমু শোন্! কানে কানে বলল—সামান্য কটি টাকা দিলেই চলবে। ভয় পাসনে—এক্ষুনি ফিরিয়ে দিচ্ছি।

গা রি রি করে উঠলেও মুখে হাসি টেনে সমীর—

—শর্ত সাপেক্ষে দিতে পারি!

—কি?

—আজ নিশি ডাকাডাকি করলেও বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। নো মদ নো গাঁজা —নাথিং।

একটু অবাকই হল শাণিত। বড্ড রূঢ় শোনাল সমীরকে। তবু মদের গ্লাস ঠোকাঠোকি করার মত সমীরের একটা হাতে হাত ছুঁইয়ে রাখল।

সবাই বসেছিল শুধু সমীর দাঁড়িয়ে। আবার গলা পরিষ্কার করে নিল একটু। এবং পদবী ছাড়া তার বন্ধুদের নাম বলে যেতে লাগল এক এক করে। আলমপনা, মুর্শেদ, বিটলভাই, দিমিত্রি, দাদানুভালা, সুরঞ্জন এবং সমীর মজুমদার। আর ইনি আমার দাদা শাণিত সেনগুপ্ত। শুধু শাণিতই নমস্কার করল। তারপর তাস সাফল করে কেটে দিল বিটল। মুর্শেদের বাট। বিটলভাই, দিমিত্রি, দাদানুভালা, সুরঞ্জন, সমীর, তার দাদা, আলমপনা আর আমি। মুর্শেদ থামল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আমাদের নিয়মকানুন জেনে রাখুন। বোর্ড দুইটাকা। একটাকা চলা। সাইড করা নেই। হিট নেই। সবার বড় ট্রায়ো। তারপর কালারিং রান। রানের মধ্যে একনম্বর টাক্কা সাহেব বিবি। দ্বিতীয় এক দুই তিন। তৃতীয় সাহেব বিবি গোলাম। সবার ছোট দুই তিন পাঁচ পেলে বোর্ড ফেরৎ পাওয়া যাবে।

আবাব বাটতে থাকে মুর্শেদ। শেষ কার্ডটা উল্টে গেল। মুর্শেদেরই তিন নম্বর তাস—হরতনের আট। আলমপনা জিজ্ঞেস করল—স্টেক থেকে আরেকটা নিবি নাকি এটাই থাকবে?

—থাক।

ব্যাস্, টুক টুক করে পড়ে গেল আটটা দুই টাকার নোট। তারপর একটাকা একটাকা। একটাকা একটাকা। একটাকা একটাকা। কেউ কার্ড তুলতে চায় না। শালারা ভীতু। সবাই দেখেছে আমার মূল কুড়িটাকা মাত্র। এবং দুইটাকার একটি নোট এখন সামনে পড়ে রয়েছে। আমি সমীরকে দেখলাম। সমীর আমাকে। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। আমি তাস তুলে না দেখেই স্টেকে রেখে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে ঘরে ঢুকল একজন মা কালী। —আজ আর হবেনা। আনেক রাত হয়েছে। বাড়ি যাও। কাল এস। কার লোকশান হল? কার লাভ? নিশ্চয়ই বিটল। রোজ পায়। শুধু লোকশান যাদের তারা কেউ মুখ খুলছি না। মুর্শেদকেও আমরা মুচকি মুচকি হাসতে দেখলাম। এপর্যন্ত তোমরা পঁচিশ ডিল খেলেছো। সুতরাং পঁচিশ টাকা রেখে চলে যেও। যেন কুক্কু ক্লকের সেই পাখিটি—ফুরুৎ করে এল সুরুৎ করে চলে গেল ভিতরে। অর্থাৎ আর কোন বক্তা রইল না। সবাই ওপেন করে দিল কার্ড। শালা দাদানুভালা। কপালির কপাল। রুহিতনের টাক্কা সাহেব বিবি। মুঠোভর্তি করে দলামচা টাকাগুলি সব পকেটে পুরে নিল। তাস পড়ে রইল তাসের জায়গায় আর দুদ্দাড় হাওয়া বইছে এখন ঘরে। মেঝেতে বিছানো বস্তা, পোড়া দেশলাইকাঠি, সিগারেট কুচি সবই পড়ে রইল।

— আপনি এত উচ্ছৃঙ্খল কেন? তখন ঘরে ঢুকেই খেলতে বসে গেলেন। আপনার না খুব খিদে পেয়েছিল! ফলে আমাকেও বসতে হল।

—হ্যাঁ সমীর! পেটটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে রে ভাই!

—তবে!

—হস্ বুঝিস তো, হস্?

—তার মানে কি ?

—টিলা। অর্থাৎ চরিত্র বলতে আর কিছু বাকি রইল না আমার ! সমীর হা হা করে উঠতেই একটা ধাক্কা। আমরা দুইজনই দেখলাম—ঝাড়ু হাতে, গাছ কোমর করে সেই কালিন্দী —

— তোরা উঠ উঠ, উঠে দাঁড়া।

আঙ্গুলের কারিশমা। চায়ের কাপগুলো সরাতে গিয়ে জোরে শব্দ হল কিন্তু ভাঙল না। তবপর বস্তাগুলোকে টান মেরে তোলে, বেশ ভারি আছে, একটু একটু ঝাকার দিয়ে কোণে ফেলে রাখল। পরে ভাঁজ করবে।

—দিদি, ইনিই শাণিতদা, কতবার বলেছি। ভীষণ খিদে পেয়েছে তার।

তথাপি কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বরং মাটির মধ্যে খস খস শব্দ বেড়ে গেল। একটু পরে টক্কাস করে শব্দ হল মেঝেতে। ঝাড়ু পড়ে রয়েছে। কোমরে হাত রেখে এখন—কি দেখছে সে? শাণিতই নামিয়ে নিয়েছে চোখ। এমন কষ্টিপাথরে ফকফকা হাসি জানি কেমন দেখাবে !

—তোদের কামকাজ দেখে তো মনে হয় না ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে ! শেষে হাতজোড করে বলল— আমি মানসী। আর জরিপ করে নিচ্ছিল আমাকে।

—প্রথমেই মুখের জংগল পরিষ্কার করতে হবে। শরীরে কয়েকপল্লা মাটি মানে তেলেজলে কাজ হবে না। গরমজল করে দিচ্ছি। সাবান দিয়ে খলখলা হয়ে আসুন।

—আজ থাক্ না দিদি, রাত হয়ে গেছে !

—তাহলে আমি কিছু জানি না। তোমাদের যা যা লাগে—মাকে বল।

—না না, খারাপ লাগবে না তো ! তাছাড়া দরকারও । কতদিন জলস্পর্শ করি না !

ফিক্ করে একটা শব্দ হল। ফিঙে। শাণিত চেয়ে দেখল — মানসী চলে গেছে ওঘরে।

—দে এবার একটা সিগারেট দে।

—দিদি যখন একবার হস্তক্ষেপ করেছে তখন আর আমার কোন দায়দায়িত্ব রইল না। শুধু পাহাড়াদারের ভূমিকা এখন।

—মানে ?

—আপনাকে বাইরে যেতে দিচ্ছে কে ?

তখন মানসী আমাদের পাছার নিচ থেকে বস্তা টেনে নিলে, আমি আর সমীর গিয়ে বসেছিলাম দুটি হাতল ছাড়া চেয়ারে। বাঁশের পার্টিশনে ঠেস দিয়ে। তারপরও দুই পা তুলে রাখতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। মেঝে পরিষ্কার করছিল মানসী। আমাদের মাঝখানে একটি টুলও আছে পার্টিশন ঘেষে। তাতে পুরনো শাড়ির টুকরো ঢাকনা রয়েছে। প্রয়োজনে টি টেবিলের কাজ চলে যায়। আরেকটা তক্তাপোষ । বাদবাকি সবটা ঘরই মেঝে মানে নিকানো মাটি।

—মা আর দিদি বেশিদিন হয়নি এখানে এসেছে। আগে তেলিয়ামুড়ায় ছিল। দেখছেন না সারাঘরে ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই !

—উনারা বেড়াতে এসেছেন বুঝি !

সমীর হাসে । আগে কী বলেছিলাম আপনাকে ?

—কি ?

—আমরা দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হয়েছি ।

—ও ! আসাম মেঘালয় মণিপুর মিজোরামের মতো কি ? বিদেশী ছাপ্পা লাগিয়ে দিয়েছে পিঠে ?

—ঠিক তা নয়। তেলিয়ামুড়ার বাড়িটা আমরা এক্সচেঞ্জ করে পেয়েছিলাম জানেন তো ?

—না।

—একজন মনতাজ মিঞার বাড়ি। নদীর যেখানে দশমিঘাট তার ঠিক পূব পাড়ে। পাকিস্থানে বসতবাটির তুলনায় এটি নিতান্তই বারবাড়ির উঠান তুল্য হলেও কিন্তু ছোটমোট স্বর্গ

ছিল আমাদের। একটি শ্রীমতি পুকুর। মনতাজ মিঞা নাকি পীর ছিলেন। সেখানে ফলন্ত গাছের বাগান।নারকেল আম জাম আর কাঠাল। সকালবেলার পুকুরে সর পড়ে থাকত শীতের বালি হাঁসে হাঁসে। তাদের রূপ দেখতে দেখতেই হয়ত পীর বনে গিয়েছিলেন মনতাজ। আরেকদিন নোটিশ এল আমাদের কাছে। আদিবাসীদের জমি ছাড়তে হবে। অবৈধভাবে দখল করা হয়েছিল কোন একসময়।

—কবেকার ঘটনা বলতো ?

—গতবার এমনদিনে। শুধু আমরা নই, আরো অনেকেই পেয়েছিল।

—তারপর কি হল ?

—তারপর চা, চা খেয়ে চান। মাঝে দাড়ি কামানোর জন্য পাঁচ মিনিট মাত্র।

মানসী হাতে হাতেই দিল চা। ভেজা আঙ্গুল। বগলতলা থেকে গামছা সাবান আর সেভিংবক্স রাখল তক্তাপোষে। চলে যাওয়ার আগে আবার সমীরকে দেখল। যেন তাড়া দিয়ে গেল। অথচ তার শাড়ির আঁচল দেয়াল দরজা ছুঁয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

চায়ে চুমুক দিয়েই মাথা গরম হয়ে গেল শাণিতের। একটাও সিগারেট নেই।

—তারপর ?

— কি আর হবে! সেভেনটি নাইনের জুন মাসে মিনি দাঙ্গা হয়ে গেছে তেলিয়ামুড়ায়।সেই আগুন এখনও জ্বলছে।

—আসলে কি জানিস তো! এসবই রাজনৈতিক উস্কানির ফল। নইলে কজন উদ্বাস্তু ত্রিপুরার আদিবাসীদের এক্সপ্লয়েট করেছে বল। যারা নিজেরাই চাল চুলো হারিয়ে বিপন্ন। প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের শোষন করেছে স্থানীয়রাই। সম্পন্নরা।

ইশারায় দেশলাই চেয়ে নিল শাণিত। শুরুতেই নিবে যাওয়া চারমিনারটা আবার ধরাল। ধূয়া ছাড়তে ছাড়তে নিকোটিনে গলা ধরে এল তার।— তখন তো ভূমিপুত্ররা থাকত পাহাড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একদল তরুণ সেখানে জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। যুদ্ধ ফেরৎ সৈন্যরাও ততদিনে সভ্যতার মুখ দেখে ফিরে এসেছেন। কিন্তু কেউই প্রদীপের আলো জ্বালাতে পারলেন না ত্রিপুরায়। উল্টো কমিউনিষ্টরা করলেন কি, গণমুক্তি ফৌজ গড়ে পাহাড়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখে দিলেন। এই বেহড়টি ছিল তাদের রাজরোষ থেকে দূরে থাকার স্থল। লক্ষ্মণরেখা টেনে দিলেন তারা। কিন্তু তোমরা তো পারতে! জনশিক্ষা আন্দোলনের সুবাদে তোমাদের সমর্থনও ছিল পাহাড়ে। কি করলে তোমরা ? গাদাগাদা বই পড়ে কমিউনিষ্ট! উন্নত কৃষির তাৎপর্য জানো, শিল্পের প্রয়োজন! অথচ সর্বস্বান্ত জুম চষীদের বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় চাষাবাদের কথা বলতে চাইলে না এতটুকু! কেন ?

সিগারেটটা আবারো নিবে গিয়েছিল মাঝপথে। শাণিত উঠে গিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে এল। আসতে আসতে বলল—পি সি যোশী, নাম্বুদ্রিপাদেরা যখন এখানে আসতেন তখন কি হত জানিস তো ?

—কি ?

—ধর আস্তাবল ময়দানে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব নিয়ে লেকচার দিচ্ছেন নেতারা। লোক কিন্তু টেনে আনা হয়েছে ত্রিপুরার পাহাড় থেকে!

—দাদা, মানুষ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার একই রাজনীতি তো এখনও চলছে। ফলও ফলতে শুরু করেছে তেমন!

—ফলবেই ফলবেই। সেভেনটি নাইনে তোমরা আর কতজনইবা দাঙ্গার শিকার হয়েছো! দুনিয়া কাঁপানো বিস্ফোরণের মুখে পড়বে ২/১ দিনের মধ্যে। রক্তের লাভায় ডুবে যাব সবাই। অপেক্ষা করো।

—দোহাই মধুসূদন রক্ষা করো।বলতে বলতে একজন জরাজীর্ণ বিধবা মহিলা এসে ঢুকলেন

এ ঘরে। যেন নাট্যমঞ্চ। নিশ্চয়ই সমীরের মা, রুগ্ন হলেও চুলে পাক ধরেনি এখনও।

—আমাদের যা হবার হবে বাবা, হচ্ছেও। তোমরা আর দুশ্চিন্তা করো না। চান করবার হলে করে ফেল। খাবে কখন ? কটা বাজে ?

—যাচ্ছি মাসিমা।

তবু দাঁড়িয়ে রইলেন নিরুপমাদেবী। ঘরময় তারই উপস্থিতি এখন প্রকট। চাপা অস্বস্তিও। ভদ্রমহিলার নাম নিরুপমা নাও হতে পারে। হালকা পাতলা শ্যামলা সুন্দর মুখশ্রী ছিল মনে হয় একসময়। এবং শাণিত এখন পোষাক আষাক খোলার উদ্যোগ নিতেই তিনি চলতে শুরু করলেন। আর দেরী না করে সমীরের একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেলল শাণিত—তখন আমার কথা শেষ হয়নি। কোথায় থেমে গিয়েছিলাম বলতো ?

—এই তো মানুষ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে রাজনীতি করার ফল। কিন্তু এত উচ্চগ্রামে কথা বলছেন কেন আপনি ! খুব টেনশন হচ্ছে নাকি শাণিতদা ?

—হলেইবা দোষের কী ! যারা রাজনীতি করে খায় ওদের আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।

—এমন করলে চলবে কেন দাদা ! দেশের চাকা ঘুরতে হবে তো ! দশের-ই বা কি হবে! মাথার উপর দাদা অর্থাৎ একটা সরকার অন্তত থাকা চাই। আর মধুর ভাণ্ড থাকলে লুটেপুটে খাবেই সুরাসুরে।

—তাহলে আমারও দুটো কথা আছে। মাথার উপরে নয়, তোমাদের সরকারকে থাকতে হবে জনসাধারণের পায়ের কাছে। যাতে প্রয়োজন পড়লেই অনায়াসে সরিয়ে দেয়া যায়। আর রাজনীতিতে অমৃতের ভাণ্ড থাকলেও, সুরা-সুর বলতে তো কিছু নেই। এক্ষেত্রে সবাই অসুর।

সমীর হাতজোড় করে বলল-ক্ষমো ক্ষেমংকরে ! তবে চলুন আবার আমবা আগের জায়গায় ফিরে যাই। সেই মানুষ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে রাজনীতির কথায়!

—তার আবার দুই মুখ ! একমুখে ঘৃণ্য উদ্বাস্তুদেরও তোষামোদ করতে হয় ভোটেব সময়। আরেক মুখে এতদিন যাদের অন্ধকারে রেখে দেয়া হয়েছিল নিজেদের স্বার্থে, এখন তাদেরই কর্ণমূলে গরল ঢেলে যেতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমাদের দেশে বিরোধী রাজনীতির চেহারাও একই—সেই আদি ও অকৃত্রিম উস্কানি। এতদিন সভ্যতার আনাচে কানাচেও ভিড়তে দেয়া হয়নি যাদের, জানতেই দেয়া হয়নি সভ্যতা কাকে বলে, উন্নত চাষ আবাদই বা কি—আজ তাদেরই কানে মন্থরা হয়ে মন্ত্রনা দিতে হচ্ছে—দেখোরে ভাই ! এদেশে এসে, তোমারই জমি চাষ করে লাভ তুলে নিচ্ছে ওরা ! আর তোমরা কিনা মূলা ভাজো !

—দাদা, আপনার লেক্চার শুনে তো আমারও রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে এখন ! দুষ্টরা কেমন ছারখার করে দিচ্ছে। আদিবাসীদের নিঃস্ব করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। আরেকদল যখন মরিয়া—স্রেফ ঝড়ঝঞ্ঝা মাথার উপর, পায়ের ছাপ ফেলে যাওয়ার মত পদযুগল পরিমাণ মৃত্তিকা পর্যন্ত নেই ! কাজকর্ম নেই মানে পেটে ভাত নেই। উদ্বাস্তু হওয়ার পর দুটি হাতই যাদের সম্বল। এখানে সমতল কতটুকুই বা আছে ! পাহাড়ে জঙ্গলেও ঢুকতে পারব না আমরা। নিষেধ আছে।অতএব দুই টিলার মাঝখানে যা একটুখানি লুঙ্গা জমি, জুমচাষের অনুপযুক্ত। সেখানেই মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জলকষ্ট, ঘাম রক্ত ঝরিয়ে যতটাই বা ফসলের মুখ দেখা গেল, শালা উটকো চাঁদ এসে বলে কিনা— আমরা দেখে নেব কত ধানে কত চাল ! অর্থাৎ সেভেনটি নাইনের জুন মাসেই ত্রিপুরায় প্রথম দাঙ্গা হয়ে গেলে দ্বিতীয়বাব উদ্বাস্তু হয়ে পড়লাম আমরা। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তখন থেকেই চাপা উত্তেজনা। অস্ত্রে শান্ দেওয়ার ফিসফিস কিচ্‌কিচ্ ভ্রম সারাক্ষণ কানে বেজেই চলেছে।

—গরম জলও হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চলে গেছে বাথরুমে !

মানসীর কাটা কাটা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল সমীর, ধাক্কা দিল শাণিতকে —দাদা, আর এক মিনিটও দেরী করবেন না !

শাণিতও চিৎকার করে বলতে ল'গল—আমি তো তখন থেকেই গামছা সাবান সেভিং বক্স

নিয়ে তৈরী। কিন্তু কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না —

আবার যেন ফিঙে পাখির ফিক্ কানে বাজল। সমীর তড়াক্ করে উঠে শাণিতের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। ঢুকল গিয়ে পার্টিশনের ওপাশে, দ্বিতীয় ঘরে। তুলনায় অনেকটা বড়। সবই বাঁশের পালা, তরজা বেড়া, পায়ের নিচে ঠাণ্ডা ঠান্ডা মাটি। এমনকি দরজা জানালা পর্যন্ত বেড়া দিয়ে তৈরী। ঘরের চালও। শাণিতও জিজ্ঞেস করল—চালে দুই পল্লা বেড়ার মাঝখানে কি পলিথিনও আছে।

—আছে। দিনের বেলায় পলিথিনের চিরল চিরল সবুজ আলোয় ঘর ভরে থাকে।

তাতে শাণিতেরও অদ্ভুত রিঅ্যাক্শন হল। যেন এখনও সে ছোটবেলার মতই প্লাষ্টিকের চশমা আর ঘড়ি হাতে পরে চারপাশে দেখছে সব কিছু। দুটো তক্তাপোষ, আলনা, বাকি সংসারটা তক্তাপোষের নিচেই পড়ে রয়েছে। ট্রাঙ্ক বাক্স প্যাটরা। তাছাড়া দুটি পাতিলও আছে। নিশ্চয়ই ডিমের পাতিল, চূনের পাতিল হবে। প্লাস আমার মায়ের ছিল দুটো ছিক্কা —একটা রান্নাঘরে আরেকটা শোবার ঘরে। ওদের তাও নেই। আর পানের বাটা দেখা যাচ্ছে। শুধু শুধু শর্তার কুট কুট শুনল। হাসল—স্মৃতিও কেমন শব্দ করে ! আলনা আর তক্তাপোষগুলোর মাঝখানে বেশ কিছু খালি জায়গা লক্ষ্য করল শাণিত। নিকোনো। নিশ্চয়ই এখানে ওরা খাওয়া দাওয়া করেন, রান্নাঘরে নয়। ঐতো পার্টিশনের গায়ে দুটো পিড়িও ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাস্। আর পরখ করার কিছু নেই। ওরা নেমে এল উঠানে।

রান্নাঘর বলতে বড় ঘরের গা ঘেঁষে বাক্স মতো চার পায়ার ওপরে পলিথিনের ছানি। বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়নি তবে একটা দিক বড়ঘরের কাছে হওয়ায় কিছুটা বাতাস আটকায়। সেদিকেই চুলা। একটায় মাসীমা, আবেকটাতে মানসী। একজনের হাতে ছেনি, আরেকজনের হাতা। কি রান্না করছেন ওবা ? গন্ধ শুঁকে মনে হচ্ছে লাবড়া খিচুরি। তিতা মেথি পর্যন্ত অমৃত মনে হয়। আবার জ্বালা পোড়া বেড়ে যায় পেটের। নড়াচড়া পড়তেই বিয়ারের বোতল যেন উপচে পড়ে। সত্যি সত্যি উপচানো পিত্তরসে তিতা হয়ে যায় তার মুখ। থেকে থেকে অনেকক্ষণ ধরেই এমন হচ্ছে।

হূক লাইনের আলো। রান্নাঘরে কোন বেড়া না থাকায় চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর পাশেই একটা মস্তবড় মানকচু গাছ। গোড়ায় ছাই ঢিবি। বাতাসে একটু একটু দুলছে কুলোর মত বড় পাতাগুলো। এত বেশি আলো যে তার শিরা উপশিরা পর্যন্ত গুনতে পাবছে সে। একটু দূরেই আবার যথেষ্ট অন্ধকার। কৃষ্ণ কচুর পাতা নাকি, হাত ছানি দিচ্ছে যে বড় ! সেখানেই দরজা বন্ধ বাথরুম। ভেতরে আলো।

কিছুদিন আগে সমীর একবার বলেছিল তারা সুলভ পায়খানা ব্যবহার করে। এবং মালিকের অনুমতি নিযে সে নিজেই একটা পাতকুয়ো করেছে বাসায়। ওগুলো কোথায় ? নিশ্চয়ই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকবে। থাকুক। তাতে কি হয়েছে ! আমার এত খোঁজ খবরে দরকার কী ! আজ রাতে আব পায়খানা পাবে মনে হয না, কিন্তু পেচ্ছাপ তো পেতেই পারে ! সে দেখা যাবে তখন ! প্রায় সব বাড়িতেই আলাদা ব্যবস্থা থাকে। না থাকলে নাই। রাস্তা খালপাড় অন্ধকার কত কিছুই তো আছে। সবার উপর আছে সমীর। সমীরকে কি জিজ্ঞেস করতে পারি না আমি —বেগ পেয়েছে, কোন দিকে যাব রে !

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছে শাণিত — এত যে ঘরছাড়া ছন্নছাড়া, এখনও বাড়ি ঘরে ঢুকলে কেমন যেন গৃহী মানুষের মতই ভাবনা চিন্তা শুরু করে দেয় সে। হাসিও পায় আবার আশ্চর্য হয়—তারমধ্যে কি আর এতটুকু মানুষ অবশিষ্ট আছে ! ঠোঁট উল্টায়, ব্যঙ্গ করে নিজেকে। ইচ্ছে করে রামকৃষ্ণের মত নূতন কোন মুদ্রার জন্ম দেয় ! কিন্তু সে তো গদাধর বা গিরীশ ঘোষ নয় ! সে শাণিত সেনগুপ্ত—নিঃস্ব ভিখিরি। এরই মধ্যে শরীরে কত শত রোগের জন্ম দিয়ে ফেলেছি। তারা বেড়ে উঠছে, তা খিন। আরেকদিন চোরাশিকারীর কোপে বনের গাছ হূড়মুড় করে পড়ে যাব। এবং

অচিরেই। শুধু উপমাটি নিয়ে একটু উসখুস রয়ে গেল। আমি কি শালা মহীরুহ নাকি! একটি বুদবুদ মাত্র। কখন জন্ম হল কখন মৃত্যু—কেউ জানেই না। আমার আবার বাহ্যি পেচ্ছাপ! হা হা।

তবে না খেয়ে পারি নারে ভাই! পেট পুড়ায়। আহার—আজকাল যার দেখা সাক্ষাৎ খুব কম হয় আমার সঙ্গে। মনে মনে বলল—ভোগের অন্ন ভগবান।

আবার পাঁচফোড়নের গন্ধ তার নাকে লাগে। এতক্ষণ বাথরুমে ঢুকে পড়েও কি করছে সে! বাঁশের তৈরী চারদেয়ালে মাকড়সার জাল দেখছে। দু'একটা ক্ষুদে পোকা ছুটাছুটি করছে, ওঠানামা। তাদের ধরতে পারছে না মাকরসা। ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যায় পোকাগুলি। শুধু একজোড়া স্বামী স্ত্রী টিকটিকি, শাণিতও আগে লক্ষ্য করেনি, আড়াল থেকে এসে খপাক্ খপাক্ গিলে ফেলল পোকা দুটোকে।

যে পারে সে পারে। বাথরুমের দরজাটা এবার আরো কাছে টেনে নিল শাণিত। পাতকূয়োর মত এটিও তবে সমীরের কীর্তি হবে। কারণ তাদের থাকার ঘরে সাধারণ তরজা বেড়ার হইন হলেও বাথরুমটা বেশ শক্তপোক্ত ও-পিঠ্যা ধারি দিয়ে নক্সি করা। স্নানরত শরীর বলে কথা! কিন্তু এই, এই শরীরটাতে আর কিছু নেই। নো রস কষ। সুতরাং দেখলেই বা কি না দেখলেই বা কি! শাণিত কাপড় খুলে ফেলে একে একে। তারে টাঙিয়ে রাখে। উপর থেকে নিচে চোখ পড়ে আয়নায়। বুক পর্যন্ত দেখা যায়। এর নিচে না। তাই আয়না ছেড়ে এবার নিজেব নিম্নাঙ্গে চোখ রাখে— এভাবে কতদিন দেখি না! আঁতকে উঠে! যেন ভূত দেখল! প্যাকাটি। এবং মাংসল স্থলগুলি সুটো আম। তলপেটের বাঁদিকে যখন তখন ব্যাথা করে আজকাল। বিশেষ কবে নেশা করে পেচ্ছাব করতে গেলেই জানটা বেরিযে যায়। যেন একটা পলিথিন ব্যাগ ভারে ফাটে ফাটে, কিন্তু কোন ফুটো নেই। কোন কোন সময় দুএক ফোঁটা চনা পড়ে। ব্যাস। এটুকু হলেও ব্যাথা সেরে যায়। হাতায় শাণিত। আঙ্গুলে আলতো হাতায়।

এবাড়িতে শরীর বলতে একটাই আছে—কালিন্দীর। কিন্তু তাও তো ফাঁক ফোকব দিয়ে কিছু দেখা যাবেনা। অন্ধকারে কি দেখা যায়! আলো! তাও যদি সে হাসে! তাছাড়া নিজের সম্বন্ধে বড বেশি উদাসীন সে! খসে খসে পড়ে আঁচল। ধূলায় লুটায়। আবার তুলে দেয় কাঁধে। কিন্তু পর্দা টানাব মত টানাটানি করেন্য কখনও। সমীরের মতে নূতন বাতিক হয়েছে নাকি—বার বার স্নান করা আর যখন তখন উপোস দেওয়া। আজ মঙ্গলচণ্ডী কাল শনি সত্যনাবায়ণ লেগেই রয়েছে। তাছাড়া কোথাও কোন কালী পাওয়া মেয়ে মানুষের কথা শুনলেই হল। মানসী ছুটে যাবেই যাবে।

এখন শাণিত দেখল তার চুল সহ এক অংশ শরীর সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়ে গেছে। আবছা আবছা কপাল। আর কোটরোগত চোখ দুটি শুধু গিলে খাচ্ছে শাণিতকে। রাবারের নাক। বাদবাকি সবটা মুখেই জিতা মরা যত জংগলে ঘেরা। গলায় পাখির ঠোঁটের মত স্পষ্ট কণ্ঠ। কাঁধে কাঁধে হাড় আর বুকের পাতি হাড়গুলো।

নিচে গরম জলের সস্‌পেনটার গায়ে হঠাৎ পা ঠেকে গেলে লাফিয়ে উঠল শাণিত। টাঙানো তারে গামছা লুঙ্গি, আর আয়নার নিচের অংশে সেভিং বক্স সাবান আগেই রেখে দিয়েছে সে। তাবপর দাড়িতে আঙ্গুল চালাতে গিয়ে বুঝল—অসম্ভব, অনেকক্ষণ সাবান জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, বা কেঁচি দিয়ে ছেঁটে ফেলতে হবে প্রথমে।

সেটাই ভাল। সেভিং বক্স থেকে কেঁচি বের করতে গিয়ে মাইকিং শুনল শাণিত—বন্ধুগণ! কোন্ রাজনৈতিক দলের টেঁটনামি বুঝতে পারল না যদিও; কান পেতে রইল। 'গুজবে কান দেবেন না। প্ররোচিত হবেন না বন্ধুগণ! সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা আজ আমাদের একান্ত কর্তব্য।'

দাঙ্গা কি লেগেই গেল! আবার ভাবল—টুকটাক লাগলেও নিশ্চয়ই বিস্ফোরণ ঘটেনি

এখনও। তবেই তো মাইকিং—আরো কত কিছু শুনব। খুব ভাল—লাগুক! একই আগুনে সবাই জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাই! এই উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা আর ভাল লাগে নারে ভাই! বিতাড়িত হতে হতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা! বলা নেই কওয়া নেই ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল একদিন। আরেকদিন সেই পাকিস্তান থেকেই দাঙ্গার শিকার হয়ে একবস্ত্রে ফিরে আসতে হল। কেউ আশ্রয় নিল ত্রিপুরায়। কেউ আসাম মণিপুর মিজোরামে। এখানেও জাতি উপজাতি দাঙ্গার শিকার হয়ে দ্বিতীয়বার-তৃতীয়বার উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে। ভূমিপুত্ররা বলছে—তোমরা বিদেশী? আমরা কি সত্যি তাই? কার পাপের ফল কে ভোগ করছি! নিতনাইয়া জাত! আর কবে উগ্রপন্থী হব। মায়ের কথামত—রাজনীতিয়ে খাইল দেশটারে। রাজনীতি মানেই দুষ্ট রাজনীতি! তার বিরুদ্ধেই আমার যুদ্ধ। নিধিরামের!

ঢাল নেই তরোয়াল নেই। তার হাতে এখন ছোটমুটো কেঁচি। দাড়ি ছাঁটতে ছাঁটতে যার মুখ বেরিয়ে এল—সে তো আমি নই। শাণুর চেহারা। মা বাবার মুখে এই একটা ডাক শোনার জন্যে হঠৎই খুব কাতর হয়ে পড়ল সে। মা মাগো! আর ভাবতে লাগল—কতদিন বাড়ি যাই না! জুইটা আমাকে দেখে টুপ করে মুখ ফিরিয়ে নেবে। মা বাবা রাগ করলে তবু চলে যায়। সঙ্গে সে মুখ ভার করে থাকলে বোঝা যায় কত বড় পাপ করেছি আমি!

আর সেভিং বক্সে ক্রিম নেই। তাই জলে গাল ভিজিয়ে সাবান মাখতে থাকে। দাড়িগুলি ভারি হয়ে গেলে রেজারে ব্লেড লাগায়। আয়নার খুব কাছে মুখ নিয়ে জুলফিটাকে বুড়ো আঙ্গুলে চেপে ধরে কোদাল চালায়। তারপর বাহাতের মধ্যমায় ডানপাশের জুলফি চেপে ধরে চাপ দেয়। যা শালা! কোনদিন যা করেনি—আজ অন্যমনস্কভাবে গোফ কেটে ফেলল। ক্লিন সেইভ মানে মাকুন্দা বনে গেল। অবশ্য মৃত ব্যক্তির ঠোঁটে প্রজাপতির পাখা সাজে কি আমার! এবার বকের মত গলা তুলে শেষ টানগুলি দিচ্ছিল। শেষে দেখব কেমন চেহারা ধরে!

পরের বাড়িতেও বাথরুমের দরজা বন্ধ করে তুমি স্বাধীন। যেমন এখন আমি শরীর থেকে সব খসিয়ে দিয়েছি। তারপরও কি মুক্ত মনে কর শাণিত? না দাদাভাই! কতদিন বাড়ি যাই না! তাছাড়া দাঙ্গার ভয় অনেকদিন ধরেই চেপে বসেছে। অমরপুরে নাকি একদল আরেকদলকে লাগাতর তাড়া করে ফিরছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করছে না কেউ। গান্ধীগ্রামেও শুনেছি কোন্ এক আনারস ক্ষেতে একজন আরেকজনকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। রীতিমত শীতকাটার ঝাপটা লাগছে এখন শাণিতের গায়ে।

সে দাড়ি কাটা শেষ করে, একটু নুয়ে ঠাণ্ডা জলের বালতি থেকে হাতকুশ করে, আরেকটু সরে এসে মুখে জলের ঝাপটা দিল পর পর তিনবার। তারপর ঝোলানো গামছার এককোণ টেনে চেপে মুখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ফ্রেস। থ্যাঙ্কস্ কালিন্দী। কিন্তু এ কী! আয়নায় এমনভাবে জল পড়ল কি করে! রীতিমত বন্যা। একটার পর একটা ঢেউ উপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। আর ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাচ্ছি আমি। গুলে যাচ্ছি।

তাই আরুণির মত প্রথমে হাত দিয়ে বাঁধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। পারে না। তারপর গামছা দিয়ে জোরে জোরে ঘষটাতে থাকে আয়না। আরো ঝাপসা হয়। এখন সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে টির টির কাঁপছে। একসময় বাতাসই তাকে সাহায্য করল। আয়না থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল মেঘ। সঙ্গে সঙ্গে বুকের পাতিহাড় আর গলার কণ্ঠ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। আর্তনাদ করে উঠে। হতাশ হয়। —এতো পঙ্কজ তলাপাত্রের মুখ! দ্রুত নামিয়ে ফেলে চোখ।

—না তোমাকে দেখতেই হবে! পঙ্কজের চোখে চোখ রাখলে কি হয় বল?

—কখনও সি পায়। কখনও!

—কি?

— সম্মোহিত হয়ে পড়ি!

—বলো কী? এর থেকে মুক্তি কিভাবে?

—অতিক্রম করে যেতে হবে তাকে।

—কিন্তু কিভাবে ?

—ক্ষুদিত পাষাণে পাহারাদারের খাঁড়া পেরিয়ে গিয়েছিল যেভাবে অশরীরী।

কিছুই বুঝল না শাণিত। বোকার মত তাকিয়ে রইল। ভ্যাবলা চোখেই দেখল—পঙ্কজ তলাপাত্রের দুইটা বড় অণ্ডকোষ একত্রে একটা পেণ্ডুলাম যেন দুলছে এখন। মনে মনে খপ্ করে ধরে ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করেও পারল না। এপাশে ওপাশে সরে যায়। ঠিক জাহাজী বাচিত মিঞার খেলুড়ে বুড়ো আঙুলের মত।

ব্যর্থ হয়ে শাণিত যেন এবার নিজের কবরের সামনেই মাথা নিচু দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। আর মা বাবা জুঁই কারোর মুখই মনে করতে পারছে না। শুধু লালিমা। নামটা মনে হতেই মনকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিল শাণিত। একটু সময় তার সম্বন্ধে কিছুই ভাবতে চাইল না। কে সে ? কি তার পরিচয় ? পর মুহূর্তেই ভাবল—এই একটি মাত্র মুক্তির পথ এখনও আমার জন্য উন্মুক্ত আছে । এবং সর্বশক্তি দিয়ে নিজের মুঠো শক্ত করে করে কখন যে ধড়াম করে ঘুষি বসিয়ে দিল আয়নায় । উল্টো আয়না থেকে কে যেন কাটারি দিয়ে আঘাত করল তাকে । লেগে গেল যুদ্ধ । ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হল লম্বা তালে বড় করতালের মত ঝন ঝন শব্দ করে । এবং শাণিত ভাবল—আমার যাবতীয় রাহুগ্রস্থ অতীতের মৃত্যু হউক আজ ।

—হলো কি ?

—শাণিত শাণিতদা শাণিতবাবু ! বাইরে হৈ হট্টগোল । একটু সময় বিরতি । বাথরুমে আবার উদোম দুদোম জল ঢালার শব্দ শোনা গেল । আবার বিরতি । কুট্ করে শব্দ হল । শব্দ করেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল শাণিত । সবটা শরীরই প্রায় ভেজা । লুঙ্গি পেঁচিয়ে রেখেছে কোনরকমে । বাঁ হাত দিয়ে গামছায় মাথা মুছতে মুছতে। হুক লাইনের আলোয় জ্বল জ্বল করছে বাড়িটা । তারমধ্যে লুটের বাতাসার মত ডান হাত থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরতে দেখা গেল । উঠোন পেরিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল শাণিত । মুহূর্তে বিকট চিৎকার করে পথ রোধ করে দাঁড়াল ওরা । মানসীর গলাই বেশি শোনা গেল । —কী পেয়েছেন আপনি ! আঁচল দিয়ে শাণিতের রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল কতোসময় । এবং তখন থেকেই ঠোঁটের কোণে একটু একটু হাসছিল শাণিত ।

—কি হলো ?

—চক্কর খেলো মাথা ।

তারপর ওরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে ।

—আমাকে ছেড়ে দে । তেমন কিছু হয়নি । সমীর বরং আমার পেন্টটা নিয়ে আয় ।

—বাঁশের পালায় ধরে দাঁড়িয়ে থাকুন । আনছি । গেল আর এল । তারপর পেন্টের হুক লাগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল—তখন কি হয়েছিল দাদা !

শাণিত হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে নাড়তে —কী আর হবে ! ভূতটা চলে যাওয়ার আগে তেঁতুল গাছের ডাল ভেঙে প্রমাণ দিয়ে গেল । ডাল বলতে এখন বাথরুমের আয়নাটাকেই বোঝানো হচ্ছে ।

আর তাকানো যাচ্ছিল না মানসীর দিকে । উৎকণ্ঠা, সদ্য আবিষ্কৃত এই রক্তারক্তি কান্ড, একটা যুদ্ধংদেহি ভাবও ছিল তার চোখে মুখে । বুকের উঠা নামা । শাণিতের হাত থেকে আঁচলের দলা হঠাৎ তুলে নেয় মানসী । মুহূর্তে তরল রক্তে ছেয়ে যায় আবার । আবার চেপে ধরে সে ।

—এভাবে হবে না । শার্টটা গলিয়ে নিন তো দাদা ! ভি এম হাসপাতাল বেশি দূরে না । দেখিয়ে আসি । আপনার কীর্তির কথা তো বলে লাভ নেই !

এই সমীরই পরিয়ে দিল শার্ট । বোতাম লাগিয়ে দিল । মানসী দলা করে রাখা শাড়ির আঁচল আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতেই, সমীর প্রস্তুত ছিল, রুমাল চাপা দিল শাণিতের হাতে ।

—বেশি নাড়াবেন না । এবার চলুন ।

—ক'টা বাজল রে!

—দশটাও হয়নি বোধ হয়!

রাস্তায় নেমেও পেছন ফিরে দেখল। যেন বিদায় লগ্ন। মানসী দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাসীমাও। আমার রক্ত মাখা শাড়িটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে না কেন কালিন্দী! শাণিতের যে কতরকমের অস্বস্তি! তার দূষিত রক্ত!

এখান থেকে রিক্সা করে ভি এম হাসপাতালে যেতে আসতে খুব বেশি সময় নেবে না। রাতের রাস্তা, যান চলাচলও কম। রিক্সাওয়ালাটা কে? ভিন্সেন লাগারডো নাকি? না। হাওয়া আছে বেশ। বাঃ। রাস্তার বাতিগুলি যেন পাকা আলো ফল। টপ টপ করে যদি মাথায় পড়তে থাকে! মসজিদটার সামনে তখন যেন কাকে দেখেছিলাম? মনে করতে পারে না। বিষণ্ণতা বাড়ে। এ জি অফিসের অনুপ রমাপদ দীপু প্রদীপ একটাকেও চোখে পড়ে না আজকাল। শালারা থাকে কোথায়?

সমীর রিক্সাওয়ালাকে বলল—দাঁড়াও। আমরা নেমে সোজা ইমারজিন্সি ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানেও খুব কম সময় নিলেন ডাক্তারবাবু। বুড়ো মানুষ, তবু ভদ্রলোকের হাত কাঁপে না। দুটো সিলি লাগল হাতে। আরেকটু হলে প্রাণটাই বেরিয়ে আসত। বড্ড পীড়াদায়ক। বাইরে আমাদের রথ অপেক্ষায় রয়েছে। এসে দেখি নেই। ছি ছি, টাকা না নিয়েই চলে গেল লোকটা! একটু পরে সমীরই ধরে নিয়ে এল কোথা থেকে। কানে কানে বলল—গাঁজা টানছিল। আসার সময় হাতের ব্যাথাটাই শুধু ব্যস্ত রাখল শাণিতকে।

হঠাৎই হেসে ফেলে। ততক্ষণে রিক্সাওয়ালার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল ওরা।

— একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস সমীর! একটু আগে এখানে খন্ডযুদ্ধ হয়ে গেল স্মাগলার পুলিশে। কিন্তু সে ঘটনার এতটুকু লক্ষণ অবশিষ্ট আছে কি এখন!

— বাদ দিয়া থন আপনার খন্ডযুদ্ধ! সামনে চোখ রাখেন।

সত্যিই তো! এখনও একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মানসী। এটা বেশি বেশি! যেন বহুদিন পর ভীষণ লজ্জা পেল শাণিত। মাথা তুলতে পারল না। অথচ তার গা ঘেষেই যেতে হল ঘরে। এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সে! আঁশানো আখের গন্ধ শরীরে। শুনেছি কিছু কিছু প্রাণী অন্যদের আকর্ষণ করার সময় সুগন্ধ ছড়ায়। তেমনি আরো কিছু প্রাণী আছে যাদের শরীর থেকে আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়ে মমতা। কালিন্দীর শরীরে অবশ্য কাঁচা হলুদের গন্ধও থাকার কথা।

মানসী ঘরে ঢুকে সোজা শাণিতের সামনে এসে দাঁড়ায়। অনায়াসে তার আহত হাতটাকে নিজের হাতে নিয়ে স্পষ্ট অথচ আস্তে বলে—আমাদের বদনাম হবে। সবাই বলবে—সমীরেরা কেমন মানুষ! মাত্র একটি রাতের জন্যে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না একটা এক্সিডেন্ট।

—ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে দিদি।

—তোরচে' বেশি ক্ষুধার্ত ইনি, কিন্তু কেমন পাকস্থলী খাওয়া স্বভাব দেখ!

শাণিত আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল—সত্যি ক্ষিদে পেয়েছে।

—তবে আর দেরী না করে ওঘরে চলে আসুন। হালকা হয়ে আসুন। মা পাতপিড়ি দিয়ে তখন থেকে বসে। ঘরের চালে কিছু একটা পড়ার শব্দ হল ধুপ্ করে।

—কি রে?

—রাতের পাখি, পাকা পেঁপে বা ঢিলও হতে পারে। ইদানিং আমাদের বাড়িতে ঢিল পরে। মাঝে মাঝে।

—কে মারে, কেন?

—কি জানি!

কিন্তু শাণিত যেন তরজা বেড়ার ওপাশ থেকে জোড়া দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনল। তারপর সে সমীরের লুঙ্গি পরে দ্রুত ওঘরে ঢুকে পড়লেও কিন্তু ওরা তাকে পিড়িতে বসতে দিলেন না। একটু উচ্চ আসন মানে একটা জলচৌকিতে বসতে দিয়ে পিড়িতে দিলেন থালা।

—এসবের কোন প্রয়োজন ছিল না।

এই জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে ! বলতে বলতে মানসী একটা চামচ দিয়ে লাবরা খিচুড়ি মেখে দিচ্ছিল।

— কেন খুব গরম নাকি ?

—না।

—তাহলে হাত দিয়ে মাখছেন না কেন। আজ আমি থালের ঘি-ও খাব।

মানসী তবু চামচ দিয়েই শাণিতের মুখের সামনে তুলে ধরল লাবরা খিচুড়ি। শাণিত নিল। চামচটাও নিল মানসীর হাত থেকে। বৃথাই নিল। লাঙ্গলের মত থালের এমাথা থেকে ওমাথায় ছুটে গিয়েও একদানা দুইদানার বেশি উঠে এল না। মাসীমা পর্যন্ত না হেসে পারলেন না—

— দে দে মানু, তুইই খাইয়ে দে ওকে।

যেন সে জানতো। জানা কথা। চামচটা নিয়ে আবার দিল। সমীর হাসল। মাসীমাও হাসলেন।

—ইস্ ইস্ কাঁচামরিচ পড়ল নাকি একটু দেখবেন ! শাণিত মাথা নাড়ল যদিও চোখ দিয়ে দর দর করে গড়িয়ে পড়ছিল জল। কোন যুক্তি দেখাতে পারল না সে। মিনমিন করে বলল—পোকা পড়েছে বোধহয়। মানসী হাসল।

আবার আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল চোখ। আর কত শাড়ির আঁচল নষ্ট করব আমি। শাণিত কাতর হয়ে পড়ে।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। আগে জল খেয়ে নিন।

—শাণিত বাবা, গোলাগুলির সময় তুমি নাকি কামানং চৌমুহনীতেই ছিলে ?

—আজ্ঞে।

—না বাবা না ! এত সাহস ভাল না। আমার ছেলের মত তুমিও রাজনীতি কর নাকি ? পাড়ায় শুনেছি সমীরের আর চাকরি হবে না।

—কিন্তু মাসীমা সে তো !

কথাটা কমপ্লিট করতে পারল না। তার আগেই আরেক চামচ এগিয়ে দিল। এই শেষ। তারপর মাসীমাকে বলল—তোমার পাঁচালি বন্ধ করো তো মা ! সারাদিনের ধকল শেষে সবাই ক্লান্ত। যত তাড়াতাড়ি পার খাওয়া দাওয়া শেষ করে চল, আমারও দুচোখ বুঁজে আসছে।

সমীর উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। কারণ ওর হাতেই ভর দিয়ে উঠতে হবে শাণিতের। মুখ ধোয়ার জল বাইরে। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল দাওয়ায়। সেখান থেকে আবার নেমে আসতে হল উঠানে। দুচোখ ঝলসে গেল। হুক লাইনের তীব্র আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে এখন একটা লাল বালতির জলে। তার মধ্যে হলুদ মগ ঘোরা ফেরা করছে। কেননা তার পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করে চলেছে প্রায় কুলার মতই বড় একটা মানকচু গাছের পাতা। যার গোড়ায় ছাই ঢিবি। এখন জলের ছিটা পড়তেই উড়তে শুরু করে দিল। প্রথমে সমীর খুব ভাল করে ধুয়ে নিল হাত। কিন্তু কুশ করে জল এগিয়ে দিল শাণিতের মুখে। সে কুলকুচি করে ফেলল যে, পড়ল গিয়ে সেই হাতির কানের মত বড় মানকচু গাছের পাতায়। বাতাসও আছে। সমীর আরো দু এক কুশ জল দিল।

—ব্যাস। আর কত করবি তোরা !

যেসব কথার কোন অর্থ হয় না। আবার হাত ধুয়ে নিল সমীর। এবার সে কুলকুচি করবে।

—তুই সেরে আয় !

—আপনি যান। আমার দাঁত খুঁচাতে হবে।

উঠোন থেকে দাওয়া, দাওয়া থেকে ঘর, ভেতর ঘর থেকে তারপর বাইরের ঘরে ঢুকেই শাণিত দেখতে পেল—মানসী বিছানা মশারি সবই টান টান করে দিচ্ছে। কাজ শেষ করে ফিটফাট বালিশ

দুটোয় আলতো চাপড় দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কী করে কী হল! শাণিত টের পেল মানসী তার খুব কাছে এসে পড়েছে। যেন শ্বাস পড়লে এলোমেলো হয়ে পড়বে বুকের পশমগুলি। তারপর শাণিতের চোখে চোখ রেখে বলল—কয়েকদিন আর এমুখো হবেন না! বলতে বলতে তার হাতে দুটো লঙ্ আর মৌরী তুলে দিল।

— কেন কেন?

—মায়ের মতলব ভাল না।

—কি?

—এভাবেই ফাঁদ পেতে আগেও বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছে মা!

—তাতে কি হয়েছে?

—আমাকে কেউ বিয়ে করবে না —আমি জানি!

তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল মানসী। কিন্তু শাণিত আর কথা বাড়ায়নি।

কুড়ি

তলদেশে ব্যথা বাড়তে বাড়তেই কি তার স্বপ্নভঙ্গ হল নাকি স্বপ্নটা মাঝপথে ভেঙে গেল বলেই ওটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে — বুঝতে পারল না শাণিত। এই ব্যথার অন্তিমে কি হবে! শুধু টের পেল ঘামে একেবারে জবজবা। নোনাজল সব সময়ই ঠান্ডা হয়ে শীতকাঁটা দেয়, ঘুম ভাঙে। ফলে সে স্পষ্ট অনুভব করছে ফোস্কার মত টইটুম্বুর অথচ গরম অথচ জলবলের মতই এখন গড়িয়ে পড়ছে শরীর থেকে। তারপরও কেন ঠান্ডা ফিরিয়ে দিচ্ছে না ? কারণ তোষকের ওম শুষে নিচ্ছে সব। এবং শাণিত বুঝতে পারল কোন স্বপ্ন নয়, ব্যাথাও নয়, ব্যাপার হল নেশা। যার ঘোর বিরোধী সমীর।

ইদানীং আমার হাত পা মাথা কাঁপে। চট্ করে নজরে পড়ার মত না হলেও কাঁপে আমি বুঝি। তখন এক বোতল মদ অবশ্যই দরকার। ব্যাস্ শাণিত সেনগুপ্ত ফিট। নো-মোর কাঁপাকাপি। বিজ্ঞ মানুষের মত ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে রাখাও তার অভ্যাস আছে। কিন্তু শালা সমীর! আজ রাতে এক ছিলিম গাঁজা পর্যন্ত টানতে দেয়নি আমাকে! নরকে পৌঁছে দেয়া লোকের যেমন অভাব হয় না কোনদিন, তেমনি অনেক গার্জিয়ানও থাকেন যেমন—সমীর এখন দাবি করছে সে আমাকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনবেই আনবে।

পারবে কী ? বেচারা! তাকে অন্তত শালা ভেবে গালাগাল করা উচিত হয়নি আমার। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে যে আশ্রয় দিল। এই তো দেবালয়! এবং আমিই সেই কচ। যা চাই ভুল করে চাই, যা পাই তা চাই না। খুব যে লালিমা লালিমা! তাকেও কি পাওয়া হবে ? বামন হয়ে কি চাঁদ পাওয়া উচিত ? পাওয়া কি যায় ?

অর্থাৎ অতৃপ্তি থেকেই কি জন্ম হতে পারে এমন মূর্খের! যে চাঁদ ধরতে যায়! রাজকুমারী লালিমার চাঁদ! তাই তাব স্বপ্নের পুকুরে ক্রমাগত ঢিল এসে পড়ে। গুলে যায় চাঁদটা। তাকে আবাব ঢেউয়ে ঢেউয়ে খুঁজতে যাওয়া কেন ? নিদেন পক্ষে কলসির কানাও মিলবে না। জলেব ওপব দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে তান্ত্রিক ব্যাঙ। আর শাণিত এখন সরীসৃপের খোলস যেন পডে বয়েছে এপারে। মেরুদন্ডের আংটি ভেঙে পঙ্গু। যতদূর স্মৃতি যায সে মনে করার চেষ্টা করে —তখন কী স্বপ্ন দেখছিলাম আমি !

ঘরের কোণে ডিম্ করে রাখা একটা লেন্টন শুধু। এতটুকু অন্ধকার সরানো জ্যোতি। সবই ঠিকঠাক আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একবিন্দু জলের জন্যে সারারাত ছটফট করেছি। তুমি এক গ্লাস জল অন্তত ব্যবহৃত কোন পোষ্টকার্ডে ঢেকে রেখে যেতে পারতে মানসী! এ কী তৃষ্ণা জাগিয়ে রাখা!

গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ঢোঁক গিলতে পারছে না। নিজেও বন্ধ করতে চাইছে না দুই চোখের পাতা। একবার যখন স্বপ্ন ভেঙে ঘুম ভেঙে ঘামে চুবাচুবা হল! হঠাৎই ঘরের মধ্যে আরো কিছু আলো আবিষ্কার করে লাফ মেরে উঠে বসল শাণিত। আজ তারিখ কত ? কাঠ খড় পুড়িয়ে অঙ্ক কষে দেখল—ছয় জুন, ১৯৮০।

যদিও সন তারিখে আমার কাজ নেই। এও একজাতের বোঝা মনে হয় তার। গলার কাঁটা। সে হাত রাখল কন্ঠনালীতে। তৃষ্ণা ছাড়া আর কি! কোথাও কি ভোরের বাতাসে জলের কলকল ধ্বনি শুনা যাচ্ছে ? কান পেতে রইল সে। তবে কি পাশের ঘর থেকেই ভেসে আসছে শব্দব্রহ্ম! দূর প্রভাত-ফেরীর মত ক্ষীণ। মাসীমার সঙ্গে এবার কি মানসীও গলা মেলাল নাকি! লহ গৌরাঙ্গের নাম রে!

পালাবারও প্রকৃষ্ট সময় এটাই। সমীর ঘুম থেকে উঠার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। মানসীর মুখোমুখি হবার আর দরকার কি! ওদের দেবার মত আমার কিছু নেই। না বিষয় আশয়, না নাম। আর এই শরীরে যে মৃত্যুঘন্টা সকাল সন্ধ্যা বাজে সে তো শুধু আমিই জানি।

বিদায় দেবযানী বিদায় !

এইবার মাটিতে পা ছুঁয়েও সে অনুভব করতে পারল সকাল। লেন্টনের আলো আরো মরো মরো। তাড়াতাড়ি পোষাক আষাক পরে নিল শাণিত। সমীরের লুঙ্গিটা ভাঁজ করে রেখে দিল মশারির গুণে। পরের বাড়িতে ঘুম থেকে উঠে বিছানা টান টান করে রাখাই উচিত। যদিও কালি' দীর নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই। করেন কী, করেন কী মশাই ! ডাকাত বটে ! তাছাড়া পালিয়েই যাব যখন ইত্যাদি ন্যাকামোর কোন মানে হয় না। ব্যবহারের স্মৃতি থাক্‌না আরো কতোটা সময় ধরে।

ঈশ্বর কি এখন তার মনের অবস্থাও অনুধাবন করতে পারছেন ! সর্ব ভূতে বিরাজ করেন তিনি। হঠাৎ এ কী বিস্ফোরণ ! ছিন্ন ভিন্ন যাবতীয় চিন্তাসূত্র ! আমি বেঁচে আছি তো ! এইবার সে টের পেল থর থর করে কাঁপছে। শুধু সে না, সমীরের ঘর বাড়ি, মশারি মল্লার সব কিছুই। কাঁপতে কাঁপতেই অবশ্য কুল পেয়ে গেল সে। শব্দটা যে মোটেই অপরিচিত নয় ! পাড়ায় পাড়ায় এই তো ফ্যাশান আজকাল। যখন তখন টেস্টিং। তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করে ! তার জন্যে কি এমন একটি ভোরও পোড়াতে হবে রে পোড়ামুখ বাঁদরেরা !

বড় রাস্তায় পা দেয়া অব্দি, কোথা থেকে এক টুকরো হাসি লেগে ছিল শাণিতের ঠোঁটে। আমি বয়স্ক লোকের মত ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিলাম কবে থেকে ! হ্যাজ অটাম ফিনিসড্। ভগবানই জানেন। অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। এই মৌল পরিবর্তনগুলি ঘটে কোন্ ফাঁকে ফাঁকে। সহায় সম্বলহীন মানুষ। কেবল তিনিই হয়ত জানেন—তখন সমীরদের বাড়ি থেকে শত চেষ্টা সত্বেও পালিয়ে আসতে পারেনি সে। মানসীর কাছে বাধা পড়ে যায়নি যদিও, ধরা পড়ে গেছে। ফলে বড় রাস্তায় পা দিয়ে শাণিত এখন হাঁফাচ্ছে রীতিমত। শান্তিপাড়া মসজিদ পট্টি পার হয়ে এল অথচ যেন অন্ধ, কিছুই চোখে পড়ল না। ব্যাপার শুধু মানসী নয়, সেই বিস্ফোরণটিও এখন তাকে ভাবাচ্ছে মনে হয়। এবং ভাবতে থাকলেই কুঁজো হয়ে পড়ে সে। পায়ের নোখে কি প্রাগৈতিহাসিক তথ্য জমা থাকে ? কাঁচা রক্তমাংসের কণা ? তাতে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকলে হয়ত বা এমন গুমোট ভোরের আসল কারণও জানা যাবে।

সে মাথা তুলে এদিক ওদিক দেখে। মূলত কামান চৌমুহনীর কামানটিতেই আটকে থাকে তার চোখ। সোজা বাংলাদেশের দিকে মুখ করে রয়েছে। তাকে ঘাড়ে ধরে ফিরিয়ে দিতে পারত শাণিত। কিন্তু আমি পাবলিক—আমার এত শক্তি কোথায় ! ত্রিপুরায় বলার মত নদী নেই। তাতেও দুঃখ নেই যদি ! শুনেছি বাংলাদেশের ভিটেমাটিতে নাকি আমাদের একটি ডোবাও ছিল। কিলবিল করত জিয়ল মাছে। তার জল যেন চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে।

আজ এই ভোর তবু একরাশ গরম হাওয়া এসে পোড়াল তাকে। গরম হাওয়া বলতে বলরাজ সাহানির মুখটাই কেবল মনে পড়ছে এখন। সে থর থর করে কাঁপছে। কোন্‌দিক থেকে আসছে এমন উড়নচন্ডী হাওয়া ? মেঘালয় মিজোরাম মণিপুর আসাম না কি পার্বত্য ত্রিপুরাতেই তার জন্ম ! সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলটাই জ্বলছে। গ্রাম পাহাড় বনে জংগলেও একই টিন পিটুনি শব্দ।

অর্থাৎ আর কোন পূর্বাভাস নয়। রীতিমত কোলাহল কানে এল এখন। মন যদিও মানতে চায় না। তারও একটা কারণ আছে দাদা ! রোজ ভোরবেলা মিষ্টির দোকানগুলির সামনে অজস্র কাক এসে কাড়াকাড়ি শুরু করে ! কা কা। খা খা বাসি মিষ্টি। ওদেরই চিৎকার চ্যাঁচামেচি কিনা !

অবশ্যই না। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে দিশেহারা আতংকগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদ— আইল রে আইল রে !

যেন জোয়ারের জল দিনের প্রথম আঘাত করে ফিরে গেছে। এক্ষুণি আসবে আবার। পাড়ে পাড়ে ফেলে গেছে ফেনা। উঁচা নিচা অসংখ্য মানুষ ! নানা জাতের ঝিনুক শঙ্খ ইত্যাদি। তখন শাণিতকে দেখে কি এক অণুমূহূর্ত থেমে গিয়েছিল ওরা ?

হয়ত বা। কিন্তু একটা কথা মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না ! ওরা কি গতকাল রাত থেকেই

রাস্তায় ? নাকি সব ব্যাটাই প্রত্যহ প্রাতভ্রমণ করে ! এত এত আবাল বৃদ্ধ বণিতা ! বুঝতে পারছে না সে । কেমন যেন একটা ভেমতালা ভাব । কিছু দেখছি নাকি সবই বিভ্রম ! তখন ওরা এতটুকু থেমে গিয়ে থাকলেও তার মনে হয়েছিল আমি ডাইনি বুড়ি আর জনতার হাতে হাতে আধলা ইঁট দেখতে পাচ্ছি ! এমনও হতে পারে শ্রীমানের প্যান্ট নিচের দিকে ভিজে গিয়েছে ! কিন্তু তার আগেই তো জনতা নদীর যাত্রা শুরু হয়ে গেছে অন্য পথে । তখনও আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি হাবার মত । নদীটির আগে আগে ভগীরথ ব্যাটাকেও দেখা যায় নি । না উলু না শঙ্খধ্বনি—কিছুই শুনতে পাচ্ছি না এখন । হর হর মহাদেব না আল্লা হু আকবর ! আমি একটি গর্ধব । স্থান কাল ভুলে কিসব হাবিজাবি ভাবছি !

তাহলে কি করা উচিত আমার ? কতদিন বাড়ি যাই না কতদিন ! যেন পর পর অনেকগুলি ঢোক গিলতে হল তার । আমার মা বাবা জুঁই । জুঁইয়ের কথা মনে হতেই আমাশা রোগীর মত পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে ! ছোট বোনটাকে জলে ফেলে দিলাম !

তাছাড়া নিজেও এখন এই জনস্রোতে মিশে যেতে চাইছে সে । কিন্তু উত্তাল ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ফিরে যেতে হচ্ছে প্রতিবার । দমলে চলবে না আমার ! ফলে রাস্তার কিনার ধরেই এবার ছুটতে থাকে লাইনসম্যান । তার মনে হল এখন আমি একজন দর্শক এবং রেফারিও । দুটো কাজই একসাথে করতে হবে । তারপর আরো ভালোভাবে দেখল আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের ঢল । তার মধ্যে কিছু কিছু হাতে লাঠিছুটাও দেখতে পেল। এবং আগরতলার সবকটি রাস্তাই যে জনস্রোতে নিমগ্ন— এমনও নয়। ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ব্যক্তিগত দ্বীপও চোখে পড়ল তার। দুই পা পরিমাণ স্থলভাগ প্রত্যেকের আছে। এই জনস্রোতে এবার কি তাদেরও পদচিহ্ন গুলে যাবে? জলোচ্ছাস আছড়ে পড়ছে বারবার। জনতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছে । ওরা আর কেউ নয় ! ত্রিপুরার পাহাড় থেকে ক্রমাগত গড়িয়ে পড়ে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জর্জরিত টুকরো টুকরো ধ্বস। এবং লক্ষ্য করার ব্যাপার হল এমন উন্মত্ত জনতার ভিড়েও এখন তাদের পা মাড়িয়ে দিচ্ছে না বা আঘাত করছে না কেউ। প্রকৃত আঘাত কোথায় করতে হবে, সেটাই তো জানে না !

'দড়ি ধরে মারো টান' চিৎকার করলেও কোন কাজ হয় না। এখন রাজা হয়েছেন রাজনীতি। দুষ্ট রাজনীতি কোন ব্যক্তি নয়। একটি বিষয় যার ক্ষয় নাই । তাই শাণিত ভাবে পাহাড় থেকে একইরকম গড়িয়ে পড়ে আমাদের তখিরাই খুমতিদের কি অবস্থা এখন ! সে ছুটতে ছুটতেও চলমান জনস্রোতের মধ্যে দ্বীপ সদৃশ দেবতাদের দেখতে থাকে। এরাই কি তবে চতুর্দশ দেবতা ! শাণিত মনে মনে গড় করে দৌড়োয়। ভাবে খার্চি, কের বা দুর্গা পূজার সময় ভক্তদের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্য করা গেছে কখনও ? তবে আর দেরীও নেই ! অর্থাৎ রাজনীতির হাত জলে তলে সবখানেই যায় যেহেতু !

জোরে, আমাকে আরো জোরে ছুটতে হবে এখন। এই ছুটে চলার দিন কবে শেষ হবে ভাই ? শরণার্থী কথাটির মানে কি তবে অনন্ত বিবরে ! আমার মা মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলে। কোন একসময় হয়ত একটি পাখির নাম বলেছিল রিফিউজি। আমি কোন উত্তর না দিয়ে তার দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়েছিলাম। আর অপেক্ষা করছিলাম আরেক গ্রাস ভাত কখন মুখে পুরে দেবে মা ! তার গল্পগুলি তখন দীর্ঘই হত। ঘুম-পাড়ানি গল্পের চেয়ে দীর্ঘ। মা বলেছিল তাদের একজনও বেঁচে নেই। সবাই শিকারী মানুষের পেটে গেছে। কারণ যেখানেই গেছে ওরা স্থানীয় আকাশ আর পাখিরা বিরোধিতা করেছে। যেভাবে অনেকগুলি কাক একটি কাকের বিরোধিতা করে। আর গুলতি হাতে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে বালকেরা দেখে তামাশা।

রূঢ় বাস্তবে ফিরে এসো বাছা, ফিরে এসো ! এইতো আমি এখানে ! নাড়ির টানে খরস্রোতা নদীটির পাড়ে পাড়ে ছুটে চলেছি। বিচিত্র শব্দ আর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি এখন—আইলো রে আইলো রে !

কোথায় কে ? কামান চৌমুহনীর বাঁক ঘুরে জনতা প্রায় মটরস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে।

শাণিত ছুটতে থাকলেও খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। পরিত্রাণের চেয়ে প্রতিহিংসার জোর কি তবে বেশী? সেখানে যদিও পূর্ব কতোয়ালি আছে। পুলিশ ব্যরিকেডও থাকা সম্ভব। দেখা যাক কি হয়! তার মানে আমি এখন রেফারীর রুল প্লে করব বলে ঠিক করেছিলাম। তাই সে জোরে জোরে সিটি বাজাতে থাকে— থামুন ভাই থামুন ! ফাউল করবেন না প্লিজ !

কিন্তু কে শোনে কার বা সবাই চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনছে। তারই মধ্যে কে আবার শাণিতের একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেলেছে। তবু তো ছুটে যেতে হবে। এখন সুমিত ঘোষের হাতে হাত গচ্ছিত রেখে হলেও ছুটতে হবে তার।

—কি হল, দাঁড়াও !

—না না ! না না !চিৎকার করতে করতেই সেও এবার মটরস্ট্যাণ্ডে। রাস্তায় কি মেঘলা আকাশ চোখে পড়েছে ! বা হয়ত জাতীয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে ভোরের যত কাক এসে জড়ো হয়, প্রথম প্রথম কুকুরেরাও আনাগোনা করত। তাদের রক্তাক্ত করে তাড়িয়ে দিত কাকেরা। আজ নিজেদের চেয়েও হিংস্র চিৎকার চেঁচামেচি শুনে, ওরাই বোধহয় এখন গাছে গাছে মাথার উপর মেঘবর্ণ হয়েছে।

শাণিত দেখল পূর্ব কতোয়ালি। তারপরই গণরাজ চৌমুহনী স্পষ্ট। এত ভিড়ের মধ্যেও আগরতলায় তার প্রথম ঠিকানা খুঁজে পেল সে। বন্ধু সুমিত ঘোষের এলাকা। তখন জুঁইকে ডিস্টার্ব করত যে ছেলেটা—অভয়নগরের নিরঞ্জন বৈদ্য, তাকে এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল সুমিত।

সে যাই হউক, এখন পূর্ব কতোয়ালির সামনে একটিও ভ্যান নেই কেন ? দু'একজন মাত্র লাঠি হাতে পুলিশ এদিক ওদিক করছে। জনতার রোষও এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এই ক'জন পুলিশ কর্মীকে কিমা-কাবাব করে খেয়ে ফেলতে পারে ! কিন্তু বোকা পুলিশের কথা তো কোনদিন শুনিনি ! উন্মত্ত জনতার হাতে ঠেঙানি খাবে বলে কি কেউ থানায় বসে বসে ঝিমায়? কক্ষনো না ! নিশ্চয়ই দাঙ্গা দমনে গেছে লেইট লতিফেরা।

আরো একটি কথা আছে ! এমন উত্তাল জনতা মটরস্ট্যাণ্ডে এসে এখন শুধু থানা শব্দটিতেই আটকে পড়ল কেন '? পুলিশ মিলিটারির ভয়ে নিশ্চয়ই নয়। আমার মনে হয় থানা নামকরণের স্বার্থকতাই এর কারণ। মন্দির মসজিদের সামনে যেভাবে ধীরে হাঁটে পা, ঠিক সেভাবে এখানেও একই ব্যাপার। সংস্কার। আর বিগ্রহের মুখোমুখি না হলে নমস্কারের রীতি নেই।

এখন যদিও জনতার মধ্যে কখনও গহ্বর, কখনও গিরিশৃঙ্গ সবই সৃষ্টি হচ্ছিল তবু বাঁধ ভেঙ্গে পড়েনি। এমন সময় পূর্বদিক অর্থাৎ আসাম আগরতলা রাস্তা ধরে পড়িমরি ছুটে আসতে দেখা গেল মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোককে। ভূতে ধরলে যেমন মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে আসে, আমরা আগেও এমন শুনেছি। তবে লোকটা কি শুধু নিজের বুদ্ধিতেই এমন মোক্ষম স্থলে পৌঁছে গেল ? নাকি কচুরি পানার মত জনতাই তাকে মধ্যমণি করে নিয়েছে আতংকে উৎকণ্ঠায়? এবার গ্রহণযোগ্য হয়ে কেমন হাত পা ছুঁড়ছে দেখো লোকটা। চাবি খাওয়া পুতুলের মত।

—দাদাও দাদা, কাইট্যা শেষ কইরা লাইল !

—কোনখানে ভাই কোথায় ? আপনার নিজের চোখে দেখেছেন তো ?

—হ্যাঁ ! না ! আমি না দেখলেও !

—ব্যাস ব্যাস।

এবার নিজেদের মধ্যে মুখ দেখাদেখির ফাঁকেই আবার ধপাস করে পড়ে গেল লোকটা। তাহলে কি কথাগুলি সত্যি ! মূর্ছিত পড়ে রইল যেন পড়ে থাক। সবাই হারড্ল বার পার হয়ে যাচ্ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। আসলে তো বান ডেকেছে অনেকক্ষণ। প্রথম থেকেই পাড় ভাঙছিল চুরি-চুপি। এবার বাধ ভেঙে জনস্রোত ভাসিয়ে নিচ্ছে আসাম আগরতলা রোড। আশ্রম চৌমুহনীর দিকেই যাচ্ছে ঢেউগুলি। পোকারা তো সবসময়ই আগুনের দিকে যায়। সবার সাথে এখন সেও

আছে—শেষ দেখতে চায় শাণিত।

দেখে কানায় কানায় ভরে রয়েছে রাস্তা । মাঝে কে বা কারা হাঁক পাড়ছে—আই—লোরে ! শাণিতও দু'একবার গলা মিলিয়ে পরে লজ্জিত হয়েছে। বিপদকালে মানুষের স্বরে শেয়াল ভর করে। শাণিত দেখে সেই কচি ভোর আর নেই। রীতিমত সকাল হয়েছে । রোদের জ্বালা। তার মধ্যেই জনতা ছুটছে।

শাণিতও।

ছুটতে ছুটতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি তার জায়গা মত নেই ।

সামনের ভদ্রলোক ও বারবার পিছিয়ে পড়ছেন। বুড়ো মানুষ। তখন আতংকে উন্মাদনায় বেরিয়ে পড়েছিলেন হয়তবা, আর তাল সামলাতে পারছেন না। আমার মত উনারও হাতে লাঠিসোটা নেই কিন্তু বেতালা মানুষ থেকে থেকে আইলোরে আইলোরে—চিৎকার করে উঠছেন কেন ! শাণিত পেছনের লোকটিকে বলল—দাদা একটু দেখবেন ! তারপর সামনেব দিকে উদভ্রান্ত বুড়োর কানে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—এই একটু একটু করে রাস্তার কিণারে চলে যান আপনি !

প্রথমে যদিও তিনি শাণিতের সহানুভূতির হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন তবু ধীরে ধীরে তরী তীরে ভিড়বে মনে হল । তাহলেই হল।

অন্তত ব্যাঙ-পিষ্ট হয়ে মরতে হবে না।

হঠাৎ যেন রেলগাড়ির ডাব্বা উডুম ধুডুম জুড়ে যেতে লাগল ইঞ্জিনের সঙ্গে। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে শাণিত দেখল তার সামনে অগুনতি মানুষের মাথা। কিন্তু আশ্রম চৌমুহনীর পর আর এক পা'ও এগোতে চাইছে না কেউ। এমনকি দুন্দুভি বা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না কোন। কি হল ? শাণিত সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে যেতে লাগল সমানে। ততই এলোমেলো শব্দ সমষ্টি আছড়ে পড়তে লাগল তাব গায়ে। ছোটবেলায় যেমন মান্দার গাছের নাম শুনে গায়ে কাঁটা দিত—তেমনি এখনও মান্দাই মান্দাই শুনে শির শির করে উঠল। আগেও শুনেছি আগরতলার খুব কাছেই একটি গ্রামের নাম মান্দাই । তাতে কি ?

—দাদা-ও রক্তের নদী ! কাটামুণ্ডু আর ধড়ের ছটফটানি চতুর্দিকে। কই যাইতাছেন আপনারা !

শাণিত আর একমুহূর্তও দাঁড়ায না সেখানে। আশ্রম চৌমুহনী থেকে উল্টো জেল রোড ধরে। ধলেশ্বর পোস্ট অফিস হয়ে ইন্দ্রনগর। সেখান থেকে জগৎপুর খুব কাছে। ফাঁড়ি পথও আছে। শাণিত ছুটতে থাকে। এবং মা বাবা জুঁইয়ের কাটামুণ্ডু মানে তাদের মুখটাই শুধু মনে পড়ছে এখন। এ্যাকোরিয়ামে যেমন বুদবুদ। একের পর এক। বাজার বয়কট। অমরপুরের ঘটনাবলী এবং সম্প্রতি গান্ধীগ্রামের । ক্রমান্বয়ে এতসব সাজাতে গিয়ে দাঙ্গার পূর্বাবাস ঠিকই পায় সে। কিন্তু যা হবার তাতো হয়ে গেছে। সতর্ক হবার সময় সবাই ঘুমিয়ে ছিল। এখন ভেবে কি লাভ হবে ! শাণিত ছুটতে ছুটতে ভাবে—পৃথিবী যদি সত্যি ভেঙে পড়ে তাহলে আর পালিয়ে যাবার জায়গা কোথায়! তারচে' হে অতীত আবাব আশ্রয় কর আমাকে, অন্তত পথের ক্লান্তি ভুলে যাই।

যেন ম্যাজিক। ভাবতে না ভাবতেই ভিন্সেন লাগারডো এসে হাজির। একা নয়। সঙ্গে তার বাহনও আছে। রিক্সার ঘন্টাধ্বনি। আবাব শাণিত এ্যাকোরিয়াম হয়ে নিজের মধ্যে বুদবুদের জন্ম দিল। তখন যত্রতত্র দেখা যেত আমাদের। সে সওয়ার আমি সওয়ারী। উল্টাউল্টি করেও দেখেছি। আমি পারিনা। রিক্সা সবসময় বাঁদিকে কেন্নাতে কেন্নাতে, একদিন তো লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির সামনে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে যথারীতি হাততালি দিচ্ছিল ভিন্সেন।

—তুই কখন নেমে গেলি শালা !

আর কি হাসি তার ! করিমগঞ্জে থাকতেও আমার একজন রিক্সাওয়ালা আত্মীয় ছিল. আক্কল

ভাই। আমি যাকে বিবেক বলি। চলতে চলতে সে একটি গানই শুধু গাইতো —তোরা মনো বড় পাপী। তথাপি হে শহর করিমগঞ্জ, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। তোমার কোলে কুশিয়ারার বুকে যার শৈশব কেটেছে। হে কুশিয়ারা, তোমার স্টিমারঘাটে একজন বাচিত মিঞা খালাসি থাকতো, মনে আছে? সে আমার প্রথম কদমফুল ছিনিয়ে নিয়েছিল। বন্ধু মঈনের সহোদরা কচি কলাপাতা রঙের ফতেমা বিবি। এবং আমি বুঝতেই পারিনি কোন্ ফাঁকে তেচাইল্যা বাচিত আমার শৈশবের সব সবুজ শুষে নিয়েছিল।

সে তো গেল! কিন্তু এখন এই বিপদকালে ওরা আমাকে কি মনে করিয়ে দিতে চায়! কোথায় বুদ্ধি জোগাবে তা না! চোখের সামনে অতীতের আয়না এভাবে মেলে ধরার মানে কি! যদি বুঝতাম এই রূঢ় বাস্তবের হাত থেকে পরিত্রাণের হাতিয়ার শুধু সেখানেই প্রোথিত আছে। আমি যদিও তা পাইনি। তখনও দাঙ্গা হতো, এখনও হয়। তবে কি ইহা একটি নেচারেল কেলামিটি! ভুমিকম্প বন্যার মত? নাকি তাল পড়ার শব্দ শুনেই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হরিণ হাতি ইত্যাদির সঙ্গে এবার শাণিতও ছুটছে! সাধারণত বাতাসই হু হু শব্দ করে। কিন্তু বুকের ভেতরে কিসব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে কাকে বোঝাবে সে! ছুটতে ছুটতে হঠাৎ মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে—আমার মা বাবা জুঁই!

এককথায় দুঃখের প্রতিমূর্তি অতসী দেবী। তখনও আমাদের শরীর থেকে নাকি উদ্বাস্তু শিবিরের গন্ধ মিলিয়ে যায়নি। শাকচুন্নী মা আমার সংসার গুজরান করত কোনো ভাবে। এমনকি দিব্যেন্দু সেনগুপ্তকে পর্যন্ত সব বাড়বাড়ন্তের কথা বলতে চাইত না। পরে আমরাও পরখ করে দেখেছি বাবার বড় মুখ ছোট হয়ে গেলে মায়ের গলা দিয়ে আর ভাত নামে না। দেখিনি কেবল কোন্ ফাঁকে তার মনে এত এত উচ্চাশা জন্ম নিয়েছিল। বা আমি যখন হারামের পয়সা রোজগার করতে শুরু করলাম তখন থেকেই তার চোখে মুখে অপদেবতার দীপ্তি। প্রতিহিংসাপ্রবণ হলেও নাকি এরকমই হয়। ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠে, ক্ষণে ক্ষণে মুখচোরা—কিন্তু চোখের কোণা অস্বাভাবিক।

বাস্তবে ফিরে আসে শাণিত। দেখে ভোর বেলার মতই শহর আগরতলায় এখনও লোকজন ছুটোছুটি করছে। তবে গায়ে গায়ে ধাক্কাধাক্কি নেই। আগের তুলনায় হালকা। বাকিরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে তাহলে। সময় কত হল? বড্ড ভারি লাগছে তলপেট। অর্থাৎ অপেক্ষা করা যাক্ কখন সে ধপাস্ করে পড়ে। পড়বেই। দৌড়তে দৌড়তে যখন তিন মাথা এক হবে, তখনই পড়বে।

কেন এমন হয়! কী পাপ করেছে সে! করেছে। যেন আরো স্লো হয়ে পড়ে গতি। পাপ পূন্যের খাতা দুটি মেলে ধরে দৌড়তে দৌড়তেই। পূন্যের খাতাটি এমন হিবিজিবি কিছুই বুঝা যায়না। পাপের খাতা অপেক্ষাকৃত ভারি। হালখাতার মত দড়ি দিয়ে বাঁধা। শাণিত সেটা খোলে, যেন স্বর্ণাক্ষরে লেখা! পড়তে পড়তে ভাবে সেদিন অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা নিয়ে আমি কোন পাপ করিনি। বা আমার নক্সালপন্থী মিত্র উদাত্ত লোকশের কথা মতো কাজ না করে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে! অনিমাদি রুবিদি আমি তোমাদের কথাই কেবল ভাবি। তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছো! তোমাদের শরীর বিক্রির টাকায় যে কৃমিকীট ভাগ বসিয়েছিল!

গতস্য শোচনা নাস্তি। এরই মধ্যে শাণিতের গলা বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে ছুটছে। তাহলে আর দেরী নেই। তিন মাথা এক হলেই লুটিয়ে পড়বে সে। কুকুরের জিহ্বা লালা ইত্যাদি তো তখন থেকেই মাটিতে গড়াচ্ছে। শাণিত ভাবে শরীরের যা অবস্থা—এতটা রাস্তাই বা কি করে ছুটে এলাম! প্রায় এসে গেছি। দিব্যেন্দুবাবু অতসীদেবীরাই হয়ত টেনে এনেছেন আমাকে। যেভাবে প্ল্যানচেটে নিয়ে আসা হয় অনিচ্ছুক

অশরীরী। আবার উল্টোটাও হতে পারে—মৃত্যুকালে প্রিয়জনের মুখ খুব জরুরী হয়ে পড়ে বলেই কিনা এমন প্রকটভাবে ছুটে আসা। জুঁইটা কি দাদার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে — নাকি তার আগেই চলে গেছে ভুল পথে ! বাড়ি না গেলে তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

শাণিত ছুটতে থাকে। একইসঙ্গে তার পতনোন্মুখ অবস্থারও কোন পরিবর্তন নেই। আবার একই ভঙ্গীতে ছুটে আসছে অনেকক্ষণ ধরে। এমতাবস্থায় কি তবে সে স্টেডি হয়ে গেল ! তবে তো আরো একপ্রস্থ ঘটনা দুর্ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তার এবং আমাদেরও। রীতিমত কেঁপে উঠল সে। জানি যম সত্য, যমদুয়ার সত্য। আর বেহুলা নয়। আমার ভেলায় কেউ কখনও ওঠেনি।

আর পারে না সে। শরীর চলে না। কেবল মনটা ছুটছে। একই ডায়নামোর জোরে বগিটিও ধক্কর ধক্কর করে। তবে এসে গেছি প্রায়। দুখের সমবায়, জি বি বাজারের দিকে না গিয়ে শাণিত এবার ফাঁড়ি পথ ধরে। বাংলার মাঠ পার হয়ে গেলেই পড়বে জগৎপুর। লোকজন কেউ চিনতে পারছে নাকি তাকে ! অনেকদিন পর এপথ কেমন কেমন লাগছে। ওরা কারা — আমার দিকেই আঙ্গুল তুলে কথা বলছে —

—চল ভদ্রলোকের কাছে যাই। পত্রিকা অফিসের লোক। নিশ্চয়ই বেশি জানে।

শাণিতের মনটা কয়—কচু জানি। ইনস্টেন্টলি গেলকাল রাতেব সেই মানকচু গাছটি মনে পড়ে গেল। একপলক মানসীও। তার অস্পষ্ট হাতছানি।

এখনও কি তেমনি ঘুমের ঘোরে ছুটছে সে ? না। পাড়া প্রতিবেশীর পিছু নেয়া ব্যাপারটাই ঘামে ক্লান্তিতে বেশি খিত্‌খিত্‌ করছে এখন। তাদের পদশব্দ শুনে শুনে হযবান সে। আসলে শব্দগুলি তার নিজেরই ধ্বনি প্রতিধ্বনি। এরপরই মুক্তি চায —যাবতীয় ইতিহাস থেকে মুক্তি। আমি যাচ্ছি আমার মা বাবার কাছে।

—বুঝলেন তো দাদা! প্রথমে ঘববাড়ি সব পুড়াইয়া দিল। তাবপব কুবুদ্ধি দিয়া ঘবপোড়াদেব নিয়া তুলল একটা স্কুলে। এত এতসব ঘটনার খবব নাকি কিছুই পাযনি পুলিশ ! হাযরে নিরাপত্তা! গভীর বাতে বক্ষকেরাই যখন ভক্ষক হল। একটু থেমে আবাব একজন আরেকজনকে বলল— তুমি কি মনে কর যারা মার খাচ্ছে—তারাই শুধু মাব খাচ্ছে ?

—না। আমি মনে করি না। এখনই জিবি হাসপাতালে গেলে সব খোলসা হযে যাবে—ক'টা দা বল্লমের ঘা আর কয়টা টাক্কালের ! তোমাদের মুখের ভাষা পুরোপুবি অবোধ্য হয়ে পড়লে মানুষ তার মনের ভাষাতেই কথা বলতে শুরু করবে। শাণিত ভাবে পশুশক্তিমুক্ত নরনাবী কেন কল্পনা করতে পাবি না আমরা ! বাধাটা কোথায় ? যদি একটা দুইটা ইন্দ্রিয়কে অন্তত বশে রাখা যেত! এভাবেই হয়ত জন্ম হয়েছিল স্বর্গের। প্রকৃতি প্রলয় ছাড়া যার ধ্বংস নাই!

এবং এই প্রথম শাণিত একটি হোঁচট খেল। পডতে পড়তে পড়ল না যদিও। যেন রাণার। ঠিকানায় পৌঁছতেই হবে তার যেকোন মূল্যে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে এখন। এতটুকু হুঁশ নেই। শাণিত এবার দেখল—জগৎপুর কালিবাড়ি রোডে সব ক'টি ফটকের সামনেই খণ্ড খণ্ড ভিড়। তাদের হাতে লাঠি-সোঁটা নেই যদিও, তবু যেন লাঠিয়াল। আর পারিবারিক লোকবল লক্ষ্য করল শাণিত। কেবল কৃষ্ণপণ্ডিতের বাড়িতেই জনা পঞ্চাশেক হবে। তারপর সে আরো দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। দেখল সর্বস্বান্ত কিছু মানুষের নমুনা। লুটিয়ে গড়িয়ে তবু এদিকেই ছুটে আসছে ওরা। ধারে কাছে কোথাও গণকবরের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা শাণিত জানে না। শ্মশানের ধোঁয়াও তো চোখে পড়ল না। তাহলে ? পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার সংশয় কাটছে না। কে হতে পারেন এই ভদ্রমহিলা ? মা। একজন মা ছাড়া এমন বুকফাটা কান্না আব কার হতে পারে! লাল পেড়ে শাড়ি, ভারি ভারি শরীর, পড়ি মরি আর কে ছুটে আসতে পারে এমন ভাবে! আসলে অনেকক্ষণ ধরেই অস্পষ্ট দেখছে শাণিত। জলে ভরে গেছে চোখ। আবার গড়িয়েও পড়ছে না।

—এতদিন কোথায় ছিলি বাবা ?

—মা ! আমার মা !

মায়েরই লুটিয়ে পড়া গড়িয়ে চলা শাড়িটা পথ থেকে তুলতে গিয়ে জুঁইয়ের হাতে হাত ঠেকে গেল তার—কিরে ! একি দশা হয়েছে তোর ! কোন উত্তর নেই। নাকের শ্বাসটুকু পর্যন্ত ফেলতে চাইল না জুঁই বরং ঝুলে পড়া অতসীর একটি বাহু খুব কষ্টে তুলে ধরল তার কাঁধে। দেখাদেখি শাণিতও তুলে ধরল অন্য বাহু। এতদিন পর এত কাছে পেয়ে অতসী আবারও জড়িয়ে ধরলেন তাকে। সে গলে গেল— মা মাগো !

যেন বানের জলে ভেসে যাওয়া গেরস্থালী আবারো কিছু কিছু ফিরে পাচ্ছেন অতসী। ছেলে মেয়ে দুটির দিকেই একবার একবার তাকিয়ে বললেন—চল ঘরে নিয়ে চল আমাকে।

জুঁই তো জানে না যে মায়ের আগে এখন আমিই মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারি। আমার কিছুই ঠিকঠাক নেই। যাই হউক পথের মধ্যে আর কোন কথাবার্তা হয়নি ভাই বোনে। মাঝে মধ্যে শুধু বিড়বিড় করে মা — এতো দিনে তোর সময় হল বাবা ! কোথায় ছিলি ! হঠাৎই মায়ের দেহটাকে একা আমার কাঁধে ছুঁড়ে দিয়ে একদৌড়ে ভেতর ঘরে ঢুকে গেল জুঁই। এখনও কুঁই কুঁই করছে দরজা। দস্তুর মত ফ্যাসাদে পড়ে গেল সে। নিজের শরীরটাকে নিয়েই যে ব্যতিব্যস্ত, তার আবার আরেকজনের ভার বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কোথায় ! তাহলে আমি আগে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে যাই, তারপর আমার উপর মা পড়ুক । এমনিতেই অসুখের ডিপো। মধুমেহ মৃগী আরো কতো কী ! এখন এই লাশ ছেড়ে দেয়া শরীর ধরে রাখতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে শাণিত। তবু ছাড়ে না । আমার মা ! আর জুঁই ছুটে গেলে এতক্ষণ এক পা'ও নড়তে পারেনি ওরা।

—মা মনে জোর আনো !

শাণিতের অবস্থা বুঝেই যেন পলকে প্রকৃতস্থ হয়ে পড়লেন অতসী। গলায় প্রত্যয় রেখে বললেন— ছাড় ছাড়, আমাকে ছেড়ে দে।

— না মা, তুমি বরং আমাকেই সাহায্য কর। সেটাই ভাল হবে। তাতে খুব বেশি কষ্ট হল না কারোরই। ঘরে ঢুকেই ছেলেকে মুক্ত করে আরো ভেতরে চলে গেলেন অতসী। মায়ের এই সংসারী পায়ে যাওয়া মানে মানুষের গণ্ডীবদ্ধ তাই প্রমাণ করে। একটু আগেও তিনি বিপর্যস্ত ঝড়ো কাকের মত পড়েছিলেন রাস্তায় ! পাঁচ মিনিট পর এখন আবার নিজের বিষয় আশয় ছাড়া কিছুই ভাবতে রাজি না । —কেন এমন হয় !

অনেকদিন পর শাণিতও যেন মঙ্গলা গাভির বাছুর মায়ের পিছু পিছু যায়—আমার পিতৃদেব কই মা ?

এবার ডাইনিং স্পেসে এসে আরেকপ্রস্ত চাঁছাছোলা রোদ দেখে দক্ষিণের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। যার দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করতে গিয়ে পেছন ফিরেই আৎকে ওঠে শাণিত। চিরদিনের ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন দিব্যেন্দু। শুধু শরীরটা অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি । শাণিত ফিরে এসেছে জেনেও কেন চোখ বুজে রয়েছেন তিনি– সেটাই কথা ! তাই হওয়া উচিত ! ছেলে যার কুলাঙ্গার । আর তখন যে আমাদের ফেলে চলে এসেছিল জুঁই ! এখন দিব্যে' দুর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে ।

—আমি ফিরে এসেছি বাবা !

বলতে বলতে সেও একটা চেয়ার টেনে দিব্যেন্দুর পাশে বসল ।

—দয়াল দীনবন্ধু সবই তোমার ইচ্ছা ।

কিন্তু চোখ খুললেন না তিনি । যথারীতি বিলি কাটাও বন্ধ করল না জুঁই । এতক্ষণে অতসীও আড়াল পেয়েছেন পাকঘরে । তাহলে আমি কি করব ? ঘামের মধ্যে আরেক প্রস্থ ঘাম ফুটে উঠল ।

—জল খাব মা !

—দিচ্ছি দাঁড়া। হাত পা, ঘাড় গলা ভাল করে ধুয়ে আয়। চা নিয়ে আসছি আমি।

—মা, তোমরা দাঙ্গা টের পেলে কখন ?

—শেষরাত থেকেই চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনছি। চুপ করেই শুনছিলাম কিন্তু অভাগীর শূন্য বুকে তর তর করে বেলা বাড়ছে দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি। ছেলে বাড়ি ফেরে না—তবু শ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে কেটে যাচ্ছিল দিন। কিন্তু দাঙ্গার চোখ মুখ নেই জানিস তো! তার শুধু হাত চলে।

—আজ সারথি দেববর্মা কি তোমাদের খবর নিতে এসেছিল ?

—তোর কি মাথা খারাপ হল! দাঙ্গাটাই যখন জাতি উপজাতির মধ্যে। আসবে কি করে বেচারা!

শানিত মাকে বুঝাতে পারল না ব্যাপারটা। সারথি অন্যরকম ছেলে। বন্ধু বৎসল এবং সাহসী। কিন্তু একবারও খোঁজখবর নিতে আসেনি শুনে ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল তার। সত্যি সত্যি কিছু একটা ঘটে গেল নাকি ? ইমিশ টিমিশ করতে লাগল সে।

—প্লিজ মা, দশটা মিনিট অন্তত সময় দাও আমাকে। পাশেই এক জায়গায় একট গিয়েই ফিরব। দেখবে চায়ের কাপে ধোঁয়া থাকতে থাকতেই ফিরে এসেছি!

—কিছুতেই না।

বিকট চিৎকার করে উঠল জুঁই—কি পেয়েছিস তুই ? ঢঙ দেখাতে এসেছিস কেন এখানে ? এখনও মরিনি দেখে ফিরে যাচ্ছিস বুঝি!

—জুঁই!

—বলবই তো! এতদিন কোথায় ছিলি! কেনই বা এলি আজ! তোর মত রোজগারি পোলা কি ঘরে ঘরে নাই রে! আমরা কি খাই, কি পারি, কে আমাদের খায়, কে-ইবা পরায়—তার খবর রাখিস্ কিছু!

—জুঁই!

— তুই যেখানে খুশি যা। কিন্তু তার আগে গলা টিপে মেরে যা তোর মা বাবাকে। ওরা কেন আমার শরীর বিক্রির টাকায় ভাগ বসাবে—ঐ শূয়োর!

তারপর কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল শাণিত। দেখল দিব্যেন্দুবাবুর চোখ গড়িয়ে দুটি ধারা। এদের মধ্যে কি সন্তানের ফিরে আসা জনিত আনন্দও আছে ? জানি না। তবে অতসীর চোখে শুধুই শূন্যতা।

—মা বিশ্বাস করো, তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যাব না কোনদিন। শুধু দশ মিনিটের অনুমতি দাও আজ।

তড়াক করে খাটের মড়া যেন সোজা হয়ে বসলেন দিব্যেন্দু—হবে না। এ হতে পারে না। দাঙ্গার শহর আগরতলা। এক্ষুণি কারফিউ জারি করা হল বলে!

—আমি তার আগেই ফিরে আসব।

—তা কি কখনও সম্ভব!

—মা!

—ঠিক আছে যা। কিন্তু কেন যাবি কিছু বললি না তো!

—তোমাদের বউ আনতে যাচ্ছি গো!

তারপর আর এক মিনিটও দাঁড়ায়নি সেখানে। এবং মনে মনে কল্পনা করে নিল—তিন বয়সের তিনটি বুসবেবি যতদূর দৃষ্টি যায় তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে অবাক বিস্ময়ে! শাণিতেরও বিস্ময় কাটে না। একটু আগে যে লোকটা মরেই যাচ্ছিল প্রায়, এখন আবার কে প্রাণসঞ্চার করল তার মধ্যে। সঞ্জীবনী সুধা বলতে এপর্যন্ত মায়ের হাতে একগ্লাস জল খেয়েছি মাত্র।

রাস্তায় নেমে এসে দেখল—আজ অনেক দেরী করে দুধের গাড়ি যাচ্ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত

লরীতে লাফ মেরে উঠে গেল। কেউ কেউ হেই হেই করে উঠলেও কিন্তু গাড়ি থামল না। সব খানেই উত্তেজনা আজ। কখন কি হয় ঠিক নেই। লোকটাও যেন শাণিতকে ছুড়ে ফেলে দেবে বলেই স্পিড বাড়িয়ে দিল। ড্রাইভারের সঙ্গে বসেছিল যে দুধবাবু তিনিই শুধু উচ্চবাচ্য করলেন—যাবেন কোথায় ?

—কর্ণেল চৌমুহনী।

—তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।

যেন সব পরিত্রাণমুখি মানুষই এখন উঠে পড়তে চাইবে নোয়ার নৌকায়। আমরাও উনামনা করে বেরিয়েছি আজ, দুধ কে নেবে বলুন! 'স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে হবে' উপরের নির্দেশ এই ভোরে। আপনিও চাকরি করেন নাকি ?

—পত্রিকা অপিসে।

—তবে তো আরো খারাপ। ইউনিয়ন এসোসিয়েশন ?

—নেই বললেই চলে। সেই ভাল। মাথা থাকলে পরিশ্রম এবং তোষামোদে যথেষ্ট কাম হয়।

—দাদা কি কর্ণেল চৌমুহনীর আশপাশে থাকেন ?

— না, যেখান থেকে উঠলাম—সেই জগৎপুরে।

—বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়েছেন মনে হয়—এই গণ্ডগোলে !

মাথা উপর নিচ করে মেনে নিল সে।

—ঠিক আছে, কাজেই বেরিয়েছেন বুঝতে পারছি, তাড়াতাড়ি সেরে ফিরে যান। ভাল ঠেকছে না কিছুই।

—ব্যাস্, এখানেই, নামিয়ে দিলে চলবে। অশেষ ধন্যবাদ।

দ্রুত নামতেও সহায়তা করেছিলেন দুধবাবু।

দুধবাবু, যিনি এজেন্টদের কাছে যার যেমন সংখ্যা, দুধের প্যাকেট বিলি করে করে যান, এখন তার উৎকণ্ঠার শরিক হয় শাণিত। তখন ডজ গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার সময়ই যেন দেখেছিল— দুধবাবুর এক ব্যাগ ভর্তি বাজার। উদ্বেগের বাজার এমনই হবে বেশি বেশি, কারফিউ প্রতিষেধক !

পথ স্পর্শ করেই এখন বুঝতে পারে —অন্যদিনের মত নয়। শঙ্কিত পায়ে আলগা উত্তাপ লাগছে যেন। তখন গাড়ি থেকে যা পরিস্থিতি দেখেছিল শাণিত, মনে হয়েছিল সচল, তবে এপাড় ভেঙে ওপার গড়ছিল এমন। অদৃশ্য শৃঙ্খল আছে, জাতিতে আদিবাসীতে আলাদা আলাদা।

এটি একটি মিশ্র এলাকা। কর্ণেল চৌমুহনী, কৃষ্ণনগর, লালবাহাদুর চৌমুহনী, এরকম কয়েকটি মিশ্র এলাকা আছে আগরতলায়। এখানেই ভয় সন্দেহ আর শঙ্কায় তেতে রয়েছে চারপাশ। একটা ফুলের টোকা পড়লেই নির্ঘাৎ বিস্ফোরণ হবে। শাণিত থোক থোক জটলা দেখে। প্রত্যেকেরই এক পা গৃহে উন্মুখ, অন্য পা ইতিউতি যত এন্টেনাগুলি, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নয় কিন্তু সাপমারার লাঠি বা বটি-দা সব ঘরেই আছে। কল্পনার হাতল ধরে কাঁপছে যত অনভ্যস্ত হাত।

এবার সে কর্ণেল বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। রাস্তার দুইপাশে মানুষ, মধ্যে মধ্যেও, ফলে পাশ কেটে কেটে যাচ্ছিল সে, তারপর বাঁদিকে বাঁক নেয়। এবং তার মনে হয় মুখগুলি সব শরণার্থীদের। কেবল পরিচিত বাড়িঘরে দু একটি আদিবাসী মুখ জানালা দরজায় দেখা যাচ্ছে ঠিকই, রাস্তার পাশে একটিও নেই। আবার ওরাই হয়তবা পাহাড়ে টংঘরে জটলা করে, অনুপজাতিদের খোঁজ নেই। আজকের পরিস্থিতিটাই এমন। এবং এতক্ষণ শাণিতের কান তালাবন্ধ ছিল বোধ হয়, এখন খুলে গেল। সে শুনল গুয়ের মাছি ভন ভন। এবং ঝি ঝি ইত্যাদি শব্দ মনযোগ দিয়ে শুনার অর্থ হল একই শব্দগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করা তাছাড়া সন্দিগ্ধ শম্বুকগতির জনতা, খানে খানে জটলাও এখন গলতে শুরু করেছে, প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে চলতে শুরু করেছে, অধোগতির জল জনস্রোত।

ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে, হয়তবা সে পিছিয়ে পড়ছে দেখেও, দৌড়তে শুরু করল শাণিত সেনগুপ্ত। লালিমাদের হাবেলি আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, পেছন থেকে ধাক্কাও খায়। দূর শালা, এত টেনশনে মগজ কিছু কাজ করে না! শাখা সিঁদুর পরিয়ে লালিমাকে ঘরে নিয়ে তোলা আর হবেনা। মনেই ছিলনা ওগুলো আনতে। হাবেলিতে কি কেউ কখনও ইত্যাদি ব্যবহার করত? করে থাকলে কবে? থাকগে বাবা, আমার মা বোনই বউ সাজাবে মনেব মত, আগে তো ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি!

এত লোকজন এখন যাচ্ছে কই? সবারই বাড়িঘর কি এদিকে! শাণিত সেনগুপ্ত আবারো ছুটতে থাকে। কিন্তু আগের মত স্বচ্ছন্দ এগিয়ে যেতে পারে না, ঠেলাঠেলি হচ্ছে খুব। হাবেলির পথে পড়েছে। ডুব সাঁতার দেয়ার মত ভিড় চিরে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। আরো সামনে কি আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে ভিড়? লালিদের হাবেলির সামনে এত জনতা! সারথিটা কোথায়? বুকটা ছ্যাৎ করে উঠে। যেন পুরনো কোন দুর্গের বন্ধ ফটকে শত্রু সৈন্যরা দীর্ঘগাছের গুঁড়ি ধরাধরি করে কেবলি ঠুকছে। হঠাৎই বিকট চিৎকার করে ওঠে শাণিত—লালি আমি আসছি! আর পায়রাগুলি ওদের বাড়ির উপরেই ওড়াওড়ি করছিল, একবারও বসছিল না।

একুশ

কুমার হাবেলিতে রাত কাটায় না — এটা কোন নূতন কথা নয়। অমাবশ্যা পূর্ণিমা বলে লাভ নেই। থাকলেই বা কি — রাতভর গ্লাসে বোতলে ঠোকাঠুকি আর নিশুতি কাঁপিয়ে চিৎকার —ছত্র ছত্র। লালিমা হেসে ফেলে—ছত্রমাণিক্য আমাদের কে হয়—দাদার দাদা পরদাদা ! প্রজাদের প্রিয় নক্ষত্র রায়। ত্রিপুরার নায়ক। বীর এই লোকটাকে নিয়ে ভাবতে থাকলে কন্যাভাব নয়, কুমারী ভাব জেগে ওঠে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের দালালগুলি ত্রিপুরার ইতিহাস বিকৃত করেছে। আর তাদেরই দোসর রবি ঠাকুর 'রাজর্ষি' লিখে ষোলকলা পূর্ণ করেছে। বীর নক্ষত্র রায়কে সাজিয়েছে ভিলেন। তাই কুমার সারথি দেববর্মার ভেতরে ভেতরে যে প্রতিশোধ স্পৃহা দাউ দাউ আগুন সারাক্ষণ জ্বলে, তা নির্বাপিত হবার নয়। আমি জানি সেই আগুনেই একদিন পুড়ে মরবে দাদা। তাছাড়া সে যে হাবেলিতে রাত কাটায় না তার আরেকটা কারণ—এ কেমন সংসার আমাদের ! এই বিশাল ধ্বংস স্তূপে দুটি বাড়ি রাখাল সাপ সাপিনী কেবল ব্যাঙ খেয়ে বেঁচে আছি। যুবক যুবতী হয়েছি অথচ সহোদর সহোদরা ! দাদা পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু আমি ? আমার কি হবে ! শাঁখা সিঁদুর নিয়ে শাণিত সেনগুপ্ত কি আসবে ? রাজকুমারী গৃহলক্ষ্মী হব। রাজা রাজরার স্বপ্ন দেখিনি কোনদিন, সাধারণ মানুষের মাঝেই থাকতে আমার ভাললাগে। লালি খিল খিল করে হাসে—শাণিত বলে কিনা আমিই দেবী বুড়িবক।

তার হাসি, অন্ধকারের পায়রা পাখিগুলিও শুনে থাকবে হয়ত ছাতে বসে, কার্নিশে। সে মনে করে এরাই আমাদের লোক লস্কর। আজও রাজকীয় চালচলন বলতে রোজ সকালে, ইদানিং অবশ্য অনিয়মিত, হাবেলিতে থাকলে তো দেবে, থাকলে রোজ সকালে কাবুলি চানা, দানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় দাদা ঘরময়, মাঝে মাঝে লালিমাও দেয়। এবং ধ্বংসপুরী কেমন সরব হয়ে ওঠে তখন ! তুলতুলে অন্ধকারগুলি সাকার হয় ধূষর, ফড় ফড় ডানা ঝাপটে মেঝেতে নেমে আসে। যত দানা তার চেয়েও বেশি পাখি, একা থাকলে তখনই গায়ে কাটা দেয় লালির ! অভুক্তরা কি করবে এখন ! তাকে ছিড়ে খুবলে খাবে নাতো ? রীতিমত ঘামতে তাকে। অন্যসময় অবশ্য অন্য কথাও মনে হয়। একা একা থাকি, বাইরের হিংস্র জীবজন্তু যদি অতর্কিতে অসতর্ক মূহূর্তে আক্রমণ করতে আসে, তাহলে এরাই নিশ্চয় রক্ষা করবে আমাকে। তাদের ঠোঁট সামান্য বেকে যাবে বাজপাখির মত। কারণ ওরাইতো দাদা পরদাদার সময় থেকে আমাদের সঙ্গে আছে পরমাত্মীয়। তাদের ছানা পোনাদেরও বড় হতে দেখি। প্রথম যেদিন দানা খেতে আসে !

আজ কদিন ধরে ঘুম নেই লালির চোখে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে একবার। তারপর যেন প্রতি দীর্ঘশ্বাস- —জীবনে ক'দিনইবা ঘুমোতে পেরেছি আমি ! সেই কবে রজঃস্বলা হবার পর থেকে ঘুম না হবার কার্যকারণ আমাকে ছেড়ে যায় না। কত আর বলব ! তবে এবার যা হল তার পরিণতি অন্তত লালি জানে না। দরকার নেইতো ! সে এসে আমাকে নিয়ে গেলেই তো হয় ! এখানে কাকে বলবে সে স্ত্রীরোগের কথা ! অবশ্য অসুখটা বাধিয়েছে সে নিজেই। শাণিতকে অন্তত দোষ দেয়া যাবে না। সে তো আর বলে যায়নি যে—আমাদের মানস পুত্র কন্যা দুটিকে তুমি পেটে ধরো। তাছাড়া ওর সাথেও দেখা সাক্ষাৎ নেই অনেকদিন। দাদার মুখ থেকেই মাঝে মাঝে শুনি নানা কথা। একদিন তো কুমার সারথি দেববর্মা রেগেমেগে কিরাত—ওর আশা ছেড়ে দে, ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে। একটা সমকামী লোকের পাল্লায় পড়েছে। আমি হাবার মত তাকিয়ে থাকি ! কাম বুঝি কিন্তু সমকাম ? কি করে ওরা? কিভাবে করে ব্যাটায় ব্যাটায় ? বিশ্বাস করতে চায় না লালি—ওকে আমি চিনি, ওর শরীরে তেমন অসুখ নেই। অন্যের কথা বলতে পারব না। আরেকদিন দাদা এসে বলল—শাণিত সেনগুপ্ত টাকার পাগল হয়ে গেছে—কী করে কিনা ! 'খবর ফাঁস করে দেবে' ভয় দেখিয়ে, দুষ্ট লোকের কাছ থেকে নয়, অসহায় দুর্বল বিপাকে পড়া মানুষের কাছ থেকেই তোলা নেয় সে। শুনেছি চোরাকারবারিদের সাথেও নাকি তার যোগসাজস আছে। কিন্তু আমি লালিমা

দেববর্মা, আমি কি করব—কি করে ফিরাব তাকে ! সে ফিরবে আমি জানি। আমিই তাকে ফেরাতে পারব। আদরে আদরে পাগল করে দিতে হবে লোকটাকে। তারপর শুষে নিতে হবে যত বিষ বীর্য ধরে সে। জলে নামতে হবে আমাকেও। ক'দিন আগে দাদা বলল —চাকরিটা ফিরে পেয়েও নাকি জয়েন করতে চাইছে না। করবে। তোমাকে জয়েন করতেই হবে শাণিত সেনগুপ্ত ! এখন একবার হাতের কাছে পেলেই হয় ! সে আসবে। আমি জানি সে আসবেই। হয়ত আজই ! এক্ষুনি সোনার কাঠি রূপার কাঠি বদলে যেভাবে জাগিয়ে তুলেছিল একদিন, ঠিক সেভাবেই অভিশাপ মুক্ত করে নিয়ে যাবে আমাকে। কিন্তু অসুখটা বাধিয়েছি আমি নিজেই—ওর কোন দোষ নেই তাতে। আমি যদি তেমন স্বপ্নচক্রে দিবারাত্র নিজেকে বন্দী করে না রাখতাম, তাহলে পাগল হয়ে যেতাম না কি ? আমি একলা ভূত, দাদা দোকলা ভূত। একা একা এমন হা-ঘর হাবেলিতে ! তবে পূজা পালকের স্বপ্ন দেখিয়েই আমাকে বেশি পাগল করেছে শাণিত। তাই বেশ কিছুদিন, রাতের একলা বিছানা মানেই আমার ক্রীড়াক্ষেত্র, স্বপ্নে লিপ্ত হওয়া। শাণিত নামক মনুষ্য লইয়া জলকেলি। আমিই কি তবে দেবী বুড়িবক ! আরেকদিন বুঝলাম মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে আমার । আর গত দুইমাস ধরে ক্রমশ ভারি হচ্ছে পা অর্থাৎ তলদেশ এবং বুক দুটোও হয়তবা । আরেকদিন ধাইমা বলেছিল—পেটে টিউমার হলেও এমন হতে পারে। এবং এরকম মনে হতে পারে । এসব কথা আমি কাকে বলব ? কুমারকে কি বলা উচিৎ? রোজই ভাবি তুমি আসবে !

আজ জালালি কবুতরগুলির চিৎকার চ্যাঁচামেচিতেই অতিষ্ট হয়ে বিছানা ছেড়েছে লালি। কি হয়েছে—তোদের পালে বাঘ পড়েছে নাকি ? বাঘ নয়, মাঝে মাঝে সাপ পড়লেও এমনই করে ওরা। বাস্তুসাপটা মাঝে মাঝেই পাখির ডিমের লোভে ছাতে উঠে। দাদা বলে—ওরাও এমনি এমনি ছেড়ে দেয় না, ঠুকরে অস্থির করে তুলে, কোন কোন দিন খাদকের ধপাস করে মেঝেতে পড়ে যাওয়ারও শব্দ হয় । আজ কি হয়েছে ? শরীরের সঙ্গে মনটাও এত ভারি ভারি লাগছে কেন তার? কেমন যেন কর্মনাশা ভয় চেপে ধরেছে তাকে। প্রাতকৃত্য পর্যন্ত সারেনি। উদভ্রান্তের মত পায়চারি করছে কেবল ! এবং মুহূর্মুহু আড়ি পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। কেবলি পায়রার বকবক মনে হচ্ছে না, আরো কিছু চিৎকার চ্যাঁচামেচি কানে আসে তার। গতকাল একজন কাছ্যারানীর দাসী আমাদের বাড়িতে এসেছিল । কুমার শুনলে আমাকেই কোতল করবে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের কোন লোক আমাদের হাবেলিতে—দাদা থাকলে নির্ঘাৎ রক্তারক্তি হতো! ধাইমা পাঠিয়েছে শুনলে হয়ত প্রাণে মারত না দাদা, তবে অপমান করে তাড়িয়ে দিত—এরমধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তারপর লালি— দাসীর দাসীর কাছ থেকে, কাছ্যারাণীরা তো দাসী বান্দির কাজ করতে করতেই রাজার নজরে পড়ে, যাহোক লালিমা সেই দাসীর কাছ থেকেই শুনল ভয়ঙ্কর কথা ! রাজধানী আগরতলা নাকি টগবগ করে ফুটছে, জাতি উপজাতির মধ্যে খুনোখুনি বাধবে যেকোন মুহূর্তে। সাবধান থাকতে বলে দিয়েছে ধাইমা। সেই থেকে যত জলই আমি খাচ্ছি, পেট আরো আরো ভারি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু গলায় কোন কাজই করছে না জল, যেন কতযুগের অভাবী নদী, নিরস নিষ্কষ, হতে হতে এখন একেবারে খড়খড়ে। আজ ভোরে যে অস্বাভাবিক সম্মিলিত শব্দ শুনা গিয়েছিল তা পূর্বদিক থেকে। যত বেলা বাড়ছে ততই ছড়িয়ে পড়ছে চর্তুদিকে । সাবধানতা অবলম্বনের সময় আর নেই । তাছাড়া কুমার সারথি দেববর্মাই বা কোথায় ! যা-ও দু'একটা বন্দুক আছে—কার্তুজগুলি পাথর হয়ে গেছে। জংধরা খাপ থেকে ছত্রমাণিক্যের তরবারি বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে লালিমা। এখন শুধু উৎকণ্ঠা, প্রতিক্ষা ছাড়া পথ নেই। তাইতো অস্থির পায়চারি করতে থাকলেও টুকরো টুকরো, মরার আগে স্মৃতি কথার মত সার সার, মাথায় গিজ গিজ করছে এখন—দাদা, শাণিত সেনগুপ্ত, পূজা-পালক, ধাইমা আরো কতকী ! ততক্ষণে সম্মিলিত শব্দ কি আরো জোরালো হয়েছে ? থর থর কাঁপছে লালিমা ! কি মনে করে একটা জানালা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বাতাস এসে এমনভাবে ধাক্কা দিল লালিকে

এবং যত উচ্চকিত শব্দ সমষ্টি, রোদে অস্ত্রে চিকচিক করে ওঠেনি যদিও, জনতার লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে আসা, লালিমার বাস্তুসাপটা একবার গলা দিয়ে একবার গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে কিন্তু কিছুতেই পারছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সেই সাত সকালে, দলা পাকিয়ে খাদ্যনালিও বন্ধ মনে হয়। এবং যতঅসহিষ্ণু স্বপ্নই আমার যোনী পথও বন্ধ করেছে। সরীসৃপের দম এখন শেষ প্রায়। সর্বশক্তি দিয়ে উপরে নিচে ঢুঁ মারছে খালি। পথ নেই বাছা! লালিমা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে—আমার পূজা পালকের কি হবে? এরই নাম কি তবে দাঙ্গা? তারও হিংস্র হাত পা আছে নাকি? পিরানহা মাছের মত দাঁত? নিমেষে অস্তিত্ব লোপাট করে! দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেছে। বারান্দায় খাঁচাবন্দী ময়নাটা কি করছে এখন? তার মুখ দিয়ে লালিমাই যেন চিৎকার করতে লাগল—কুমার কুমার! আর পেটে খিল দিয়ে ধরল হঠাৎ! দরজায় লাথি উষ্টার শব্দ। থপ্ করে মেঝেতে বসে পড়ল লালি। তীব্র ব্যাথা, যোনীপথটা ফেটেই যাবে মনে হয়! এরই নাম কি গর্ভযন্ত্রণা! তবে কি সরিসৃপটা পথ পেয়ে গেছে? মাগো! আর পারি না! লালিমা এবার শুয়ে পড়ল ও গর্ভবতী মায়েরা প্রসবের সময় যেভাবে পা রেখে শোয়—সেভাবেই শুয়ে থাকল। এখনই হয়ত দরজাটিও ভেঙে পড়বে। গুড়া গুড়া চুণসুরকি ঝরতে শুরু করেছে অনেকক্ষণ ধরেই। ঝুর ঝুর অনুভূতি সে যেন নিজের শরীরেও টের পাচ্ছে এখন, তবে ঝুর ঝুর নয়—শান্ত নদীর কুল কুল, আর কোন ব্যাথা বেদনা নয়। একসময় পা দুইটাও থপ্ থপ্ করে শবাসন গ্রহণ করে। ক্ষতবিক্ষত সেগুন কাঠের দরজাটাও ধপাস করে ভেঙে পড়ে যায়। জনতা এবং অতিরিক্ত আলোর সঙ্গে প্রথম যে লোকটা অন্দরমহলে ঢুকে সে শাণিত সেনগুপ্ত। কিন্তু মেঝেতে পা রাখতে পারছিল না। থক্ থক্ করছে রক্ত। লালি! লালি! লালি! জনতার পায়ে পায়ে বাকি মহলটাও রক্তাক্ত হয়ে গেল মুহূর্তে। তার নাকে মুখে এবং বুকে কান পাতলো অনেকেই। ভাগ্যিস, সারথি দেববর্মা এই মুহূর্তে এখানে নেই। নইলে আরো রক্ত ঝরত। শান্তি কমিটির প্রধান তেজেন কর্তাই অবশ্য রায় দিলেন—সে নেই।

ভোরে যে পায়রাগুলি হাবেলি ছেড়ে আকাশে উড়ে গিয়েছিল, এখন ফিরতে শুরু করল আবার। ফলে ফরফর ফরফর। এবং হঠাৎ সেই একটানা ধ্বনিও ফেটে চৌচিড় হয়ে গেল। যেন বিস্ফোরণ ঘটল একটা। একটি পায়রাও আর শব্দ করছে না যখন, শোনা গেল—'এম এল এ পঙ্কজ তলাপাত্রের মুণ্ড চাই'। 'রাজীতির নাগপাশ থেকে মুক্তি'। কিন্তু লালিমা দেববর্মার মৃত্যুর সঙ্গে সমকামী পঙ্কজ তলাপাত্রের কি যোগাযোগ থাকতে পারে, রাজনীতি ছাড়া! পঙ্কজের কন্সটিটিউন্সিতে ওরা ভোটার। তবে কি রাজ্য রাজনীতির সর্বশেষ শিকার লালিমা দেববর্মা! পড়িমড়ি দৌড়ে বেরিয়ে এল সবাই ছত্র মানিক্যের হাবেলি থেকে। আলো বাতাসে ভয়ার্ত দেখাল—প্রত্যেকেরই মুখ মাথা পোষাক আষাক পাখিদের বিষ্ঠায় ভরে রয়েছে।

বাইশ

সেই যে দাঙ্গা দুর্যোগের মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এল ধূমকেতু, বউ আনতে যাচ্ছি বলে চলেও গেল নিমেষে, আর সে এল না। ফাঁক পেলেই রোজদিন নিয়ম করে বুক চাপরান অতসী। কেবলি নিজের বুক এমন নয়, দিব্যেন্দুবাবু জুঁইয়ের বুকেও কিল পড়তে থাকে। একসময় মেয়ের ধমক খাবেন। ডুকরে ডুকরে কাঁদবেন। তারপর যদি ঠাণ্ডা হয় ঘর। এবং আজ এখন পর্যন্ত সে ঘটনাটি ঘটেনি। সকাল থেকেই জুঁই ব্যস্ত। দালালী, টিউশনি কোন কাজেই বাইরে যায়নি আজ। ঝাড়পোছ করল সারাটা বাড়ি তারপর রান্নাবান্না। রান্না করবে শুনে চিন্তিত হয়েছিলেন অতসী—কেন রে, রোজই আমি করি, আজ আবার কি হল? নিঃশব্দে হাসল জুঁই, যার অর্থ হল—এমনি। এমনি এমনি নয়, অতসীও জানেন, দিব্যেন্দুও, কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করছেন না। বলছেন না আজ কত তারিখ! তারপর লোভী মানুষেরও যেমন কোন একসময় অনুশোচনা হয়, তেমনি এখন নাকের পাটা ফোলে ফোলে উঠছে অতসীর—মা হয়েও মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে পারলাম আমি! সবাই বলে ছেলেটাকেও আমিই নষ্ট করেছি! টাকার খাই বেড়ে গেলে যা হয়! হবে নাইবা কেন! এদেশে এসে কী কষ্টটাই না করতে হয়েছে! তার উপর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আছে, কুদৃষ্টি। ননাস মাগী বলে কিনা!

—ক'টা বাজল রে জুঁই?

দিব্যেন্দুবাবু যেন জানেন, তাই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে অতসীর বিভ্রম ভাঙতে চাইলেন তিনি।

—কি ব্যাপার আজ তোমরা কেউই ঘুমচ্ছো না! তোমাদের দুজনেরই তো দিবানিদ্রার বাতিক আছে। নাক ডাকারও।

প্রকৃত উত্তর দেবেন না দিব্যেন্দু। সামলে নিয়ে বলেন—আজ তোর রান্না, বিশেষ করে মুড়িঘণ্টটা স্বাদ হওয়ায়, ভাত বেশি খেয়ে ফেলেছি বুঝলি! পেটটা হাঁসফাঁস করছে।

তারপর জুঁই আর কথা না বাড়ালেই ভাল। আজ অন্তত কথা কাটাকাটি চান না তিনি। সেদিন পুলিশ ইন্টারোগেশনের দু:স্বপ্ন বা বলা ভাল—সেদিনের পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন দিব্যেন্দু। আমি কাকে দুষব! কেউ তো আমার কথা শুনে না! আমি ছেলেটাকে বললাম—আবার যখন ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়েছেন, ফিরিয়ে দিয়েছেন তোর চাকরি, তুই এটাকেই ধ্যান জ্ঞান কর। বাকি সব ছেড়ে দে। কে শুনে কার কথা! লোভ লোভ! লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। দয়াল দীনবন্ধু! এই উচ্চারণটা কিন্তু কখনই মনে মনে করতে পারেন না তিনি। তার মুখ ফোটে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস সহ।

একটি শক্ত মলাটের বই, মনে হয় অর্দ্ধেকও পড়া হয়নি, বুকের ওপর ঠাস করে বন্ধ করে, বালিশের পাশে ঠিকঠাক না রেখেই, বিছানা ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে গেল জুঁই।

—শুনছো?

—কি?

—দেখতো কয়টা বাজে!

—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! দেরি আছে।

—বলছিলাম শানুটার যদি কোন খবর পাওয়া যায়!

নিরুত্তর রইলেন অতসী। তাতেও দমলেন না দিব্যেন্দু, বলতেই লাগলেন—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝলে! দুঃখ করে কি করবে অতু! বহু যুগ পর অতসীকে অতু ডাকলেন দিব্যেন্দু। সবই আমার ভুল! এতদিন নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইনি —সত্যি কথা বলতে কি—শানু নয়, আমিই ফেরারী। আজ বুঝতে পারছি—সারাজীবন পালিয়ে বাঁচা যায় না। একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হবে। ছেলেমেয়ে দুটির কাছেও কোন দৃষ্টান্ত রাখিনি। তবু যে ওরা আমাকে স্বীকার করে, আমি বর্তে যাই।

—চুপ করো। বাথরুম করে এল বলে ! ওঠ ওঠ, চা খাবে তো ?

জুঁই ঢোকার আগেই অতসী বেরিয়ে গেলেন। দরজা খোলে ঢুকলেন পাক ঘরে। ফিলটারের নিচে জলের জগটা বসালেন। সর্ সর্ করে জল পড়ার শব্দ মানে হল যত অল্প সময়ই হউক—সবচে প্রয়োজনীয় কথাগুলি এখনই ভেবে নেবেন তিনি। আজ যদিও সকাল থেকেই ভাবছি, একই ভাবনা চালিয়ে যাচ্ছি এখনও। মেয়েটাকে তৈরী করে দিতে হবে বিকেল চারটের মধ্যে। শানু বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে যাবে । নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছেন না তো অতসী ! জুঁইয়ের সঙ্গে ! সেদিন সাবইন্সপেক্টর নিরঞ্জন বৈদ্য যে আচরণ করল—তারপর বুঝতে কিছু বাকি থাকে কি ! তাছাড়া খবর নিতে দুষ্টটার বাড়ি যাবে কেন সে ! থানাতেই তো ডেকে পাঠাতে পারতো ! বুঝলাম কাবেরীর ভাই, আগে ওদের বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল একসময়। কিন্তু খারাপ লোক ভালো লোক নিশ্চয়ই চিনতে পারেন অতসী, তিনিও তো প্রথমে মেয়ের জাত তারপর মায়ের ! তবে কি ছেলের জন্যে মেয়েকে বলি দিচ্ছেন অতসী ! হঠাৎই বিকটভাবে 'না' চিৎকারে কেঁপে উঠলেন দিব্যেন্দু, জুঁইও । বাবাকে বিছানা ছাড়তে বারণ করে নিজেই ছুটে গেল—কি হল মা, কি হল ?

— কিছু না । তুই যা। আমি চা নিয়ে আসছি।

তবু সে যাচ্ছে না দেখে, হেসে ফেলেন অতসী—কিছু হয়নি বিশ্বাস কর !

কিছু হয়েছে। তবু সেই নিত্য বিলাপ কিনা —একটু সময় বোঝার চেষ্টা করে জুঁই। আবার শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। একটা জিনিস খুব ভালই বুঝতে পারছে সে —ক্রমশ মাকড়সার জালে জড়িয়ে যাচ্ছে পা, তারপর পাখা। দাদা টাকা পাঠায় না, বেঁচে আছে কিনা তাইবা কে জানে? সুপারি বাগানের লালিমা দেববর্মা যে দাঙ্গার শিকার হয়েছে, আমি বাড়িতে বলিনি। মা বাবা দুজনেই অসুস্থ। বাজার হাট, টিউশনি, ইন্সিওরেন্সের দালালী সবই আমাকে করতে হয়। মায়ের বেরাম বাড়লে রান্নাবান্নাও । বেশতো হেসে খেলে দিন চলে যাচ্ছিল,হঠাৎ কে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে গভীর সুড়ঙ্গে নিক্ষেপ করল তাকে, তারপর পাথরচাপা দিয়ে দিল মুখে। সেখানেই শশাঙ্কের সাথে দেখা, এল আই সি'র ডেভেলাপমেন্ট অফিসার, এখনও প্রতি দশটা কেস আমার জন্যে জোগাড় করে এনে, একবার সহবাস চায়। পায়ও। সেখানেই পরিচয় হল সম্পাদক জগদীশের সঙ্গেও । দাদার বস্। পুরো একটা দিন আমরা একসাথে কাটিয়েছি একটা রেষ্ট হাউসে । আমরাই আমরা। আর কেউ নেই। বহু টাকা মূল্যের পলিসি করেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা ভাল না। শূয়োরের বাচ্চা করে কি—তার কাম শেষ হলেই পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে বিছানা থেকে নিচে ফেলে দেয়। জুঁইও কিছুটা সময় মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসে, জুঁই আর জগদীশ দুজনেই হাসতে থাকে, হঠাৎ এমন একটা থাপ্পর বসিয়ে দিল জগদীশের গালে, সেই মুখটা মনে করে, এখনও হেসে কুটু কুটু জুঁই।

দিব্যেন্দুবাবু পর্যন্ত না হেসে পারলেন না —এ্যাই মেয়ে এত হাসিস না, কি হয়েছে আমাকে বল !

—মায়ের কথা ভাবছি। কথা নেই বার্তা নেই—কখন শুনবে 'হাঁ' আরেকটি তেমনি চিৎকার।

এবার বাপ মেয়ে দুজনেই হাসতে থাকলে,জুঁই কেটে পড়ে । পুরনো সূত্র ধরে ভাবতে শুরু করে আবার। নিরঞ্জন বৈদ্যের মত একটা লোকের খুবই দরকার আমার। রাতে নিশায় কোথায় কোথায় থাকি, কোথায় কোথায় যাই ! বিপদ আপদের কথা কিছুই বলা যায় না। ছাতা মাথায় থাকলে বিপদের সম্ভাবনা কিছু হলেও কমবে। জুঁই জানে ঘুষখোর পুলিশেরা দেনা পাওনায় বিশ্বাস করে । কথার খেলাপ করে কম । এখন আয়নার সামনে নিজের শরীরটা দেখে আস্বস্ত হল। সঙ্গে যে দীর্ঘশ্বাসও লুকিয়ে ছিল, আশ্চর্য হল জুঁই ! নিরঞ্জন ছেলেটাও এমন ছিল না !

অতসী ফিরে এসে চা দিলেন দুইজনকে। কিন্তু একটা নারকেলের নাড়ু দিলেন শুধু জুঁইকে। মুখে বললেন সুগারের রোগী বাদ। আর মেয়েকে বললেন—কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি

ব্লাউজগুলি আলাদা করে রেখেছি, পরে নে। জুঁই আগেই, চানের পরে ভাল ব্রা পেটিকোট পরে নিয়েছিল। শেম্পু করা চুল ঘাড় পর্যন্ত আঁচড়ে দুইদিকে দুই দুই ক্লিপ মেরে দিল। পাউডার পাফ করে যে শাড়িটা এখন ছাড়বে তা দিয়েই আবার মুছে নিল। ঠোঁটে রঙ লাগাল না তবে ভেসেলিন দিয়েছে মনে হল। শেষমেষ শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে ম্যাচ করে বিন্দি লাগিয়ে দিল কপালে। একদৌড়ে ঢুকল গিয়ে বাথরুমে। চট করে ড্রেস পরে বেরিয়ে এল, হাতে ছোট্ট একটা রুমাল। আয়নার সামনে দু/এক জায়গায় বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলো শুধু, শাড়িটাড়ি টান টুন, তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টান দিয়ে খুব দ্রুত পারফিউম স্প্রে করল বগলে বগলে। চকির নিচ থেকে সাদা রঙের হিলতোলা জুতা বের করে পরে নিল। পার্স হাতে নিয়ে বলল—চলি মা !

— দুর্গা দুর্গা।

—চলি বাবা !

—একটু দাঁড়া।

দিব্যেন্দুবাবু তার নিমার পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বের করে আনলেন । সেবার ভারত দর্শনের সময় হরিদ্বার থেকেই কিনেছিলেন। কাশ্মিরী নক্সি করা খাপের ভেতর চকচকে ছুরি। খাপটা বন্ধ করেই বললেন—ধর, তোর পার্সে রেখে দে।

তেইশ

জুঁই বেরিয়ে আসতে আসতে শুনল দেবী স্তোত্র আওড়াচ্ছেন বাবা—"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতা............" দাঙ্গা পরবর্তী আগরতলা এখনও শান্ত হয়নি। পুরোপুরি উঠে যায়নি কারফিউ। কিছুটা শিথিল হলে পরই সাবইন্সপেক্টার নিরঞ্জন বৈদ্য ও কনস্টেবল শর্মাই লস্কর ইন্টারোগেট করতে এসেছিল। এতটুকুই শুধু সত্য। বাদ বাকি সব নিরঞ্জনের প্রহসন। যেমন আজ তার বাড়িতে যাচ্ছি এখন, না গেলে হয়ত তোলেই নিয়ে আসতো, দাদা বিষয়ে নাকি গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা আছে। ছাই আছে! দেখ গিয়ে লিঙ্গ ফুলিয়ে পায়চারি করছে কিনা ঘরময়! উগ্র ঘামের গন্ধে ম ম! কেন জানি জুঁইয়ের মনে হয় শুধুমাত্র শরীরের ঘস ঘস নয়, আরো কিছু অভিসন্ধি আছে তার, হয়ত কোথাও পাচার করতে চায়, হয়ত আরো বড় দাও মারতে চায় আমাকে দিয়ে। তবে আমিও যে মূল্য চাইব—ভড়কে যাবে নিরঞ্জন!

অনেকক্ষণ হেঁটে তবে রিক্সা পেল জুঁই, বলল অভয়নগর যেতে হবে—কাঠের পুলের কাছে। মুখে বলছে কাঠের পুল আর ভাবছে সাঁকো। খুব বেশিদিন আগের কথা তো নয়, পুল একটা ছিল ঠিকই খানে খানে ভাঙ্গা, পা পিছলে রসাতলে গিয়েছিল অনেকেই। আর আমরা ব্যবহার করতাম সাঁকো। জল ছুঁই ছুঁই বাঁশের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হত—এভাবেই জীবনের প্রতিটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব।

এখন রিক্সা চড়ছে নাতো যেন দোলায় বসে আছে। কিন্তু আমি কোন পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারিনিরে দিদি! হঠাৎই শিউলির কথা মনে পড়ায়, চোখে জল এসে পড়ল তার। কতদিন পর বল! আমি মানুষ হালে নেই রে! শিউলির নামটাও জুঁইয়েরই দেয়া। সে যত না নিজের সাথে কথা বলত, তার চেয়ে শিউলির সাথে বলত বেশি। সেই দিদির কথা এখন একবারও মনে পড়ে না। বুঝতেই তো পারছিস কেমন আছি!

শিউলি জুঁইয়েরই পাপবোধ এবং অনুশোচনা থেকে জন্ম একটি কল্পনার। মা বলেছিল—তোবা জমজ বোন জন্ম নিয়েছিলি। প্রথমটি মরা, পরে তুই। ডাক্তারের কথা হল সে খাদ্য না পেয়ে পেয়ে মরেছে। আর জুঁই ভাবত—আমি ওর ভাগটাও খেয়ে খেয়ে ওকে মেরে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করিস দিদি। বলতো দেখি কোথায় যাচ্ছি এখন? শিউলিও ওর গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে থাকে — অভিসারে!

জুঁই রীতিমত রেগে গিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বলে—থামো। তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আবার হাঁটতে থাকে। এবার কানাগলির শেষে। দাদাটাই আমাকে এ জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সে এত নরম, এত অবাস্তবিক, এত প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন যে কি বলব! শাণিত সেনগুপ্ত ফেরারী ভাবতেই হঠাৎ বমির মত কান্না ফেটে পড়তে চায় তার চোখে মুখে। ফেরারী শব্দে আর কি কি ইঙ্গিত থাকে? নিখোঁজ? নিখোঁজের কি কি অর্থ হয়! রীতিমত শিউরে ওঠে জুঁই, থমকে দাঁড়ায়। পার্স থেকে রুমাল বের করে ঘাড় গলা মুছে। শিব শিব। সবই শঙ্কা। সবই আমার ভুল। যেন ঘামে বাতাস বইয়ে দিলে যে আরাম পাওয়া যায়! মনে এক দুইটা কৌতুকেরও বুদ বুদ ওঠে...........

বুঝলিবে দিদি, তখন যে 'অভিসার' কথাটা বলেছিলি, তবে শোন—শত্রু মোকাবিলায় যাচ্ছি, তারই মত অভিসন্ধি নিয়ে, তবু বারবারই আনমনা হয়ে যাচ্ছি! কেনরে দিদি?

শিউলি আবারও খিল খিল করে হেসে ওঠে। তখন যে হাতে রুমাল নিয়েছিল জুঁই এখন মুখে চেপে হাসি আটকালো নিজেরও। পুংলিঙ্গটি তবে কি করছে এখন?

পুরনো যত সুড়সুড়ি সবই ভুলে যেতে চাইছে নিরঞ্জন। তখন জুঁইয়ের শরীরে কি যেন গন্ধ, মিষ্টি ফল ফল, পাকা মনগুটা বা গয়াম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। আর দরকারও নেই। স্বপ্ন স্বপ্ন

খেলার দিন শেষ। এখন কঠিন বাস্তব। সঙ্গে নিয়ে বাঁচা নয়, কেবলি বেঁচে থাকা সিঁড়ি বাওয়া আর পেছন ফিরে না তাকানো। এমতাবস্থায় কে জুঁই কে বেলি! নিছক উপকরণ উপঢৌকন ছাড়া আর কিছু নয়। তবু কিছু তুলো মেঘ হঠাৎ হঠাৎ আনমনা করে। আমাদের বাড়িতে এলে জুঁইকে এগিয়ে দেয়া কাজটা আমাকেই করতে হত। মনে হত এর চেয়ে বড় স্বাধীনতা আর কি হতে পারে! যে মারবেল ভেঙে কোনদিন ভেতর দেখার সাহস হয়নি।অথচ আজ আমি কিনা পারি! পুলিশ চাকরির এই এক সুবিধে—তুমি যে স্বভাবেরই হও না কেন— মুখচোরা, সাতচড়ে রা করো না, এসব কিছুই থাকবে না একবার ট্রেইনিং-এর পরে। লজ্জা ঘৃণা ইত্যাদি থাকতে নেই আমাদের। কিন্তু নিরু স্বাভাবিক থাকতে পারছে না এখন। তার টেনসন হচ্ছে। সিগারেট টানছে একটার পর একটা। কেন? নারী শরীরতো এই প্রথম নয় আমার! বহু ভোগ করেছি এবং অনায়াসেই করেছি!

টেবিলের ওপর থেকে জলের জগ নিয়ে ঢক ঢক করে খেল। সাবধান রইল বুক যেন ভিজে না যায়। ফ্রেস পাজামা পাঞ্জাবী পরেছে। বোতাম ঘরগুলির কাছেই লাগিয়েছে পারফিউম। প্রতীক্ষা আর ভাল লাগছে না। এই প্রথম একটা হাই উঠলো। নিজের ঘরটাই আরো একবার চোখ বুলিয়ে নিল নিরঞ্জন। পুরনো দিনের বাড়িঘর, সংস্কার দরকার। শাণিত সেনগুপ্তের মত বেটা, সরকারি চাকরি খুয়া যাওয়ার পরও, পত্রিকা অপিসে টুকটাক করে এতবড় বাড়ি করল কি করে? ইনভেষ্টিগেট না করেই বুঝা যায়—সৎপথে নয়। তাতে কি হয়েছে! কেবল একটা কথা মনে রাখতে হবে—চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি ধরা না পড়। কেউ যেন কাঠের গেইট খোলে ভেতরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শোয়ে পড়ল নিরঞ্জন। এবং এইমাত্র যে সিগারেটটা জ্বালিয়েছে, শুয়ে শুয়েই মেঝেতে চেপে ধরে নিবায়। পায়ের উপর পা রাখে। হাত দুইটা রাখবে কোথায়—বুকের ওপর, চোখ বুজে। পাঁচটা বেজে গেছে নিশ্চয়ই। গরম এতটুকু কমছে না। পাঁচে পাখার বাতাসেও না। মা দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সেই যে সিঁড়িতে বসে রয়েছে—জুঁই আসবে, কাবেরীর বান্ধবী। মা প্রায় কিছুই দেখে না এখন। ফলে সব কিছুই স্পর্শ করে হাতড়ে হাতড়ে বোঝার চেষ্টা করে।

—মাসীমা আপনাদের গেইটে, তারকাঁটায় আটকে গিয়েছিল শাড়ি, ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না।

—আয় আয় মা!

পা ছুঁয়ে প্রণাম করল জুঁই—কেমন আছেন আপনি?

আর খপ করে একটা হাত ধরে ফেলেন তিনি। জুঁই নিচের সিঁড়িতে বসলে তার চোখ মুখ শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছেন। সুন্দর হয়েছিস বলতে গিয়ে দুচোখ জলে ভরে যায়—জানিস তো মা আমার দৃষ্টিশক্তি নাই।

প্রসঙ্গ পাল্টায় জুঁই—কাবেরী কেমন আছে গো মাসী? চিঠিপত্র দেয়তো?

—কর্তব্য করতে না পারলে কেউ কারো নয় গো মা! মাসে ছয়মাসে একটা খবরও নেয় না। অবশ্য আমাকে দিয়েতো আর কোন কাজ হবার নয়। দ্বিতীয় বাচ্চাটার সময় কত লিখলাম ওর শাশুড়িকে, দিল না।

তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিরুদাকে ডাকল মাসীমা—দেখ কে এসেছে!

—থাক মাসীমা, আমিই যাচ্ছি। আমার কিছু কাজও আছে নিরুদার সঙ্গে। আপনাকে কি ভেতরে পৌঁছে দেব?

—না রে মেয়ে, এটুকু এখনও পারি। এভাবে আসিস মাঝে মাঝে। একা থাকতে থাকতে পাথর হয়ে গেছি।

—এবার ছেলের বউ নিয়ে আসুন। আপনার চোখও হবে, সঙ্গীও।

—আয় না মা, তুই আয় না! আমাকে বুঝি পছন্দ হয় না তোর!

আর একটিও কথা না বলে, দৌড়ে নিরঞ্জনের ঘরে ঢুকে গেল—তুমি বড় নিষ্ঠুর নিরুদা, মাসীমা ডাকল তবু সাড়া দিলে না! আমাদের শরীরটাই কি সব?

নিরঞ্জন লাফ মেরে ওঠে—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রেগে যেও না প্লিজ ! বলতে বলতে সবকটা দরজা জানালাই যে খুলে দেবে আগে ভাবেনি। তুমি একটু বসো, আমি আসছি।

যেন পালিয়ে বাঁচল সে । এঘরে আগের মতই ফ্যান ঘুরছে। একই গরম বাতাস । তখন অভিযোগ করার সময় বুকের আঁচল হাতে নিয়ে এসেছিল কেন জুঁই ? আবার ফিরিয়ে দিতে দিতে লজ্জাবনত হল নিজের কাছেই । তবে ভুল সে করেনি। নিরুদাতো তাই চায় ! ঘুঘু ! বলে কিনা ঘুমিয়ে ছিল !

তখন নিরঞ্জনের মত এখন জুঁইও ঘরটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে। ঝুলে ঝুলে রয়েছে ঝুল। কোণায় কোণায় মেঝেতেও গড়াগড়ি যায়। বুঝাই যায় বহুযুগ কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। মাসীমার পক্ষে সম্ভবই না !

দুই হাতে দুই কাপ প্লেইট, চা আর দুটো দুটো নারকেল নাড়ু নিয়ে ঘরে ঢুকল নিরঞ্জন। বলল—কাবেরীর নাড়ু, খাও। ওকে এখন অনেকটাই স্বাভাবিক লাগছে। চা দিয়ে চা নিয়ে বসল। জুঁই বসেছিল টেবিলের কাছে বেতের চেয়ারে। আর নিরুদা এসে বসল বিছানায়। এক চুমুক দিয়েই রেখে দিল। সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠি ছুড়ে দিল মেঝেয়। সেদিকেই তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না ছাই হয়।

—জুঁইলতা, শাণিত সেনগুপ্তকে বোধ হয় আর বাঁচানো যাবেনা !

বুকটা ধক্ করে ওঠে। যেন এক ফুঁয়ে সব আলো নিভিয়ে দিল নিরঞ্জন। এবং ঘুটঘুটে অন্ধকারে একবিন্দু আলো খোঁজার মত বিস্ফারিত তাকিয়ে রইল জুঁই —

— এ পর্যন্ত পুলিশের হাতে যা যা অভিযোগ আছে, যেমন অবৈধ উপায়ে অর্থসংগ্রহ ও অস্ত্র চোরাচালানকারিদের সহায়তা করা ইত্যাদি, কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া, আর বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু গত পরশুদিন কর্ণেল চৌমুহনীতে যে বিভৎস খুন হয়ে গেল, তার রকম সকম দেখে অনুমান করা হচ্ছে আততায়ী শাণিত সেনগুপ্ত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। কী চরম ঘৃণা থেকে এরকম একটি হত্যা সংঘটিত হতে পারে! সান্ধ্য আইন শিথিল হলেও, রাতের আগরতলা এখনও শুনশান। একটা দুইটা ভ্যান শুধু চক্কর মারে। সেদিন আবার রাত দশটা থেকেই লোডশেডিং চলছিল। পত্রিকা অপিসের কামকাজ পর্যন্ত বন্ধ। সঙ্গে পিনির পিনির বৃষ্টি। এমন দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে যদিবা কেউ বের হয়, অন্যকোন দিকে তাকাবার কথা নয় তার। প্রহরারত দুইজন পুলিশ ছিল ট্রাফিক পয়েন্ট সেডের নিচে। তাদের কথামত একটা লোক, পাজামা-পাঞ্জাবী পরা, ওরা কি করে বুঝবে কে যাচ্ছে, যার সিকিউরিটি ভ্যান সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা সে যদি এমন দুর্যোগেও পায়ে হেঁটে ছাতা মাথায়, বরং বলা চলে মুখ লুকিয়ে যায় হারাধন সংঘের দিকে ! মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে কোন চিৎকার চ্যাঁচামেচি শোনা গিয়েছিল কি ? ওরা মাথা নাড়ে। অবশ্য রাত এগারোটা থেকেই বৃষ্টির ঢল নেমেছিল। আর আর সব শব্দই মুষলে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। পেট্রোলিং-এ থাকা একটা জিপগাড়ির হেডলাইটই প্রথম সনাক্ত করল লাশটাকে। পেছন থেকে ভারি কিছু দিয়ে প্রথমে ছাতা সহ মাথায় আঘাত করা হয়েছে, তাতেই হয়ত অক্কা পেয়েছিল লোকটা । শেষে দুইটা অণ্ডকোষ সহ যৌনাঙ্গ এমনভাবে কেটে নিয়ে গেছে যেন ছিলই না। তাতে জমে রয়েছে শরীরের সর্বশেষ রক্তকণাগুলি।আর সবই ধুয়ে মুছে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে শাণিত সেনগুপ্তের নাম জড়িয়ে ফেলার কি কারণ থাকতে পারে ? এক) অনেকেই নাকি শুনেছে, দাঙ্গার দিন সুপারি বাগানে কোন এক লালিমা দেববর্মার মৃতদেহের সামনে জনতার মধ্যে থেকে শাণিত শপথ নিয়েছিল—'পঙ্কজ তলাপাত্রের মুণ্ড চাই'। এই লোকটা সেই লোকই। দুই) শাণিত সেনগুপ্তের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা পুলিশের জানা আছে। লোকটা সমকামি ছিল।

যেন জুঁইয়ের চুলের মুঠি ধরে একটানে উপড়ে নিল মাথার খুলি। এখন মগজটাই টগবগ করে ফুটছে কেবল। বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্ত। জুঁই বিসর্জনের দুর্গার মত কাৎ হয়ে হয়ে চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছে দেখে, শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলে নিরঞ্জন। গা-ছাড়া তার শরীরটাকে কোনরকমে

পাঁজাকোলা করে বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রকৃতপক্ষে এও স্পর্শ নয়। পরীক্ষা। মায়া-মায়া চেহারা। নিরঞ্জন অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সংজ্ঞাহীনা। নিরাপত্তা নিয়ে এখন কোন সমস্যা নেই তার। নিশ্চিন্ত নির্ভার। বহুদিন পর নিজেকে আবার ভালবাসতে চায় নিরঞ্জন। জগ থেকে এককোশ জল নিয়ে জুঁইয়ের চোখে মুখে ছিটিয়ে দেয়। ধড়ফড়িয়ে উঠে সে। নিরুকে দেখে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নিত্যদিনের বিছানা থেকে যেভাবে নামে মানুষ সেভাবেই নামল। জানলা দিয়ে দেখল সন্ধ্যা। নিরুদা বাড়ি যাব। আঁচল ঠিক করল। চুলে হাত বুলালো। আঁচল দিয়েই আবার চোখ মুখের জল মুছল। জুতো পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাসীমা ঠাকুরের সামনে বসে গান করছেন—ভব সাগর..........। কাঠের গেইট খুলে বেরিয়ে এল ওরা। আগের মতই জুঁই আগে আগে। নিরঞ্জন ভাবছে এখন তো ওদের ঘর বনমালীপুরে নয়—যেদিকে সাঁকো ছিল বর্ষায় ডুবুডুবু। উল্টো পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে তবে নিরঞ্জন দাঁড়াল। খারাপ জায়গাটা পার হয়ে এসেছি—এবার যেতে পারবে তো ?